আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.

মূল

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ

শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

ওরা কাফের কেন?

মূল

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

প্রকাশক

হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩৬৭৫৫৫৫

প্রকাশনা

১৭ (সতের)

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদ

শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস

২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

বাঁধাই

খিদমাতুল মুসলিমীন বাঁধাই ঘর

মূল্য

৩২০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

কিছু অভিমত

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী

যামন ও সালাতের পর কথা হচ্ছে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসদের আলোচনায় আহলে কিবলাকে কাফের সাব্যস্ত করার বিষয়টি খুব জটিল হয়ে পড়েছিল। বোধগম্য হওয়াও মুশকিল ছিল। তবে কোন খোশনসীবকে যদি আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে সুস্থ বিবেক এবং সত্য গ্রহণের তৌফীক দান করেন, তা হলে ভিন্ন কথা। এমন কি জ্ঞানের অভাবে কিছু লোক ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের ভাষ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, হযরত মাওলানা শায়খ আলহাজ মৌলভী মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ সাহেব যিনি দারুল উলূম দেওবন্দে সাদরুল মুদাররিসীনের পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি এই জট ছাড়ানোর জন্য কোমর বেঁধেছেন এবং আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করার মাসআলা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দিনরাত মেহনত করে দুধের জায়গায় দুধ, আর পানির জায়গায় পানি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

সুতরাং এই মাসআলায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের যেসব যুক্তিপ্রমাণ ও এবারত তিনি একত্র করেছেন, সেগুলো উপলব্ধি করে এবং জাহেল ও কমহিম্মত লোকদের সংশয় নিরসনের প্রক্রিয়া দেখে আল্লাহ তাআলার ফযল ও মেহেরবানীতে হক ও সহীহ মাযহাব পেয়ে আমিও দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয়ন করছি।

আল্লাহ তাআলা হযরত শাহ সাহেবকে এমন উত্তম বদলা দান করুন, যা তাঁর কোশিশ ও হিম্মতের যথার্থ ও যথেষ্ট। দোআ করছি, এই সংকলন যেন আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুলিয়ত লাভ করে নন্দিত হয়।

খলীল আহমাদ
নাযেম, মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম
সাহারানপুর

মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী

হামদ ও সালাতের পর বান্দা আরজ করছে যে, সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের জপনায় পরিণত হয়েছিল যে, কোন আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করা নিঃশর্তভাবে নিষিদ্ধ। চাই সে দীনের কোন জরুরী বিষয় অস্বীকার করুক, অথবা কোন জরুরী বিষয়ের ফাসেদ ব্যাখ্যা করুক, কিংবা তার কথাবার্তা থেকে কুফর আবশ্যক হয়ে পড়ুক, যদিও সে স্বেচ্ছায় কুফরে প্রবেশ করেনি। এত কিছুর পরও তাকে কাফের সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ। এমন কি কিছু কিছু লোক নাম ধরেই মির্যায়ীদের কাফের না হওয়ার ফলাফল বের করে। বিশেষত এরা সেইসব মির্যায়ীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে না, যারা বাহ্যিকভাবে মির্যা কাদিয়ানীর নবী হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে এবং মির্যার নবুয়ত দাবির ব্যাপারটিকে তাবীল করে।

আমার জীবনের কসম! যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, যেমনটা এরা বুঝে নিয়েছেন, তা হলে সেইসব লোককে কাফের সাব্যস্ত করার কী অর্থ থাকতে পারে, যারা মুসায়লামা কায্‌যাব ইয়ামামীর উপর ঈমান এনেছিল। অথচ তারাও তো নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাতও দিত এবং মুসায়লামার নবুয়তের বিষয়টি তাবীল করত। তা ছাড়া মুসায়লামা কায্‌যাবও আমাদের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল। আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে দেখেনি, যে মুসায়লামা বা তার অনুসারীদেরকে কাফের বলার পক্ষপাতী নয়। আর যখন 'মুসায়লামা ও তার অনুসারীরা কাফের নয়' এমন বক্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল, তখন 'মির্যা ও তার তাবীলকারীরা কাফের নয়' এমন দাবি বাতিল হবে না কেন?

আল্লাহ তাআলা 'ইক্‌ফারুল মুলহিদীন' গ্রন্থের রচয়িতাকে পরিপূর্ণ জাযা দান করুন, যিনি এই বিষয়টি এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যার উপর আর কোন বিশ্লেষণ হতে পারে না এবং প্রয়োজনও নেই। কেননা, তাঁর এই রচনা কামেল ও মুকাম্মাল। লেখক দলিল-প্রমাণও ইনসাফের আঁচল না ছেড়ে সমানতালে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে যে পুস্তিকা আমার সামনে রয়েছে, সেটা মাকসুদ উপস্থাপনে যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। তা ছাড়া বাহাস ও বিতর্কের সময় যেসব দলিলের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর জন্য এই পুস্তক যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা এই কোশিশ কবুল করে একে মুফীদ ও উপকারী করে দিন এবং একে বর্তমান যামানার শকসন্দেহের জাল ছিন্নকারী বানিয়ে দিন।

মুহতাজে রহমত
মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
শনিবার, ৪ মহররম, ১৩৪৩ হি.

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়েতুল্লাহ

হামদ ও সালাতের পর!

কিছু লোক ছিল এমন, যাদের অন্তরে মির্যা কাদিয়ানীর নবুয়তের প্রবক্তা কাদিয়ানী গ্রুপকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ফতোয়া সন্দেহে ফেলত। তা ছাড়া সেই ফেরকাকেও আহমাদিয়া বলতে মানুষ বিচলিত ছিল, যারা মির্যা কাদিয়ানী সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, সে ছিল মাসীহ মাওউদ, প্রতিশ্রুত মাহদী এবং অনেক বড় মুজাদ্দিদ ও অনেক বড় ওলী। তারা বলে থাকে যে, যদিও মির্যা কাদিয়ানী নিজকে নবুয়ত ও রেসালতের নামে বিশিষ্ট করেছিল, ওহী ও এলহামের দাবি তুলেছিল এবং সে নিজের ওহীকে অন্য নবীদের ওহীর বরাবর মনে করত; কিন্তু এত কিছুর পরও সে প্রকৃত নবুয়তের দাবি করেনি।

এমনসব ব্যাখ্যা শুনে কোন কোন বুযুর্গ তাদেরকে তাবীলকারী মনে করে কাফের সাব্যস্ত করা থেকে বিরত রয়েছেন, বা এ বিষয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন। এসব বিষয়ের গবেষণায় সমকালীন যামানার লোকজনের মধ্যে সর্বোত্তম, উলামা ও এই যুগের ফুযালাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং আলেমসমাজের গৌরব, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন মাওলানা মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ (সাদরুল মুদাররিসীন, দারুল উলূম দেওবন্দ) প্রাণান্তকর মেহনত করেছেন এবং বিশ্লেষণের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন মকসূদের উপর থেকে পর্দা তুলে ফেলেছেন এবং অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন। একটি পুস্তিকায়, যেটাকে তিনি 'ইকফারুল মুলহিদীন' নাম দিয়েছেন। চমকদার মুক্তা দিয়ে পুস্তিকাটিকে তিনি সাজিয়েছেন। বিষয়টি তিনি এমন পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন যে, জটিলতা ও সন্দেহের কোন সুযোগ বাকি রাখেননি। যখন এর উপর পাঠকের দৃষ্টি পড়বে, তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে, এই পুস্তিকাটি স্বস্তিদায়ক একটি রাস্তা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে লেখককে উত্তম বদলা দান করুন। আল্লাহ তাআলা মুলহিদ [নাস্তিক]-দের শিকড় উপড়ে ফেলে দিন এবং দীনে মুবীনের রং উজ্জ্বল করে দিন। আল্লাহ তাআলা জালেম ও খায়েন লোকদের প্রচেষ্টা মিটিয়ে দিন।

কেফায়েতুল্লাহ উফিয়া আন্হু

৪ রবিউল আওয়াল, ১৩৪৩ হি.

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী
(শাইখুত তাফসীর, জামিয়া ইসলামিয়া, ঢাবেল)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি যাহেরী বাতেনী নেয়ামতসমূহ দিয়ে থাকেন। রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর রসুল এবং যিনি নবী-রসুলের ধারা সমাপ্তকারী। আরও বর্ষিত হোক তাঁর বংশ ও সাথি-সঙ্গীর উপর, যারা ছিলেন নেককার ও নির্বাচিত।

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

'ইকফারুল মুলহিদীন' নামের পুস্তিকার ব্যাপারে অবগত হলাম। সেটা অধ্যয়ন করে উপকৃত হলাম। আল-হামদু লিল্লাহ! পুস্তিকাটি হযরতুল আল্লাম মাওলানা আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মীরীর একটি অনুপম রচনা। লেখক বুলন্দ মর্তবার অধিকারী, সমকালীন যামানার বেমেসাল, বেনযীর ব্যক্তিত্ব। পূর্ববর্তীদের নমুনা এবং পরবর্তীদের জন্য হুজ্জত। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অথৈ সাগরের মত এবং খুব চমকদার মশালের মত। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার উদাহরণ বর্তমান যামানায় কোন চোখ প্রত্যক্ষ করেনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলম, নাহি আনিল-মুনকার, পবিত্রতা ও তাকওয়া থেকে ভরপুর হিস্‌সা দিয়েছেন। তিনি আমাদের সরদার ও আমাদের শায়খ। আল্লাহ তাআলা তাঁর স্নেহ-ছায়া শিক্ষানবীস ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী করুন।

এমন একটি পুস্তিকা ছিল বর্তমান যামানার দাবি। কেননা, মাসআলা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর [পূর্ববর্তীদের] বক্তব্য ছিল বহুবিবিধ এবং খেই ছাড়া; আবার পরিমাণেও অনেক বেশি। এজন্য অনেক আলেম ও সদিচ্ছু ব্যক্তিও ভুল বুঝাবুঝি, সন্দেহ ও দ্বিধায় পড়ে গেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে এবং পাঠকসমাজের পক্ষ থেকে হযরতুশ শায়খ আল্লামাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, যিনি এই পুস্তিকার রচয়িতা। কেননা, তিনি হক ও সত্যের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন এবং শকসন্দেহের শাহ রগ কেটে দিয়েছেন। আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না মর্মে যে মূলনীতি রয়েছে, তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আরও পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন তাবীলকারীদেরকে কাফের সাব্যস্ত না করার মূলনীতিটিও। এতটাই স্পষ্ট করেছেন যে, তার পর

আর কিছু বলার সুযোগ নেই। এমন কি চোখওয়ালাদের জন্য প্রভাত স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং যথেষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন। এখন সন্দেহ আর অস্বীকৃতির কোন সুযোগ বাকি নেই। তবে সন্দেহ ও অস্বীকৃতির সুযোগ নেই সেই ব্যক্তির জন্য, যার সুস্থ হৃদয় আছে এবং আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য যার অন্তর খুলে দিয়েছেন। অথবা শোনার জন্য যার কান আছে এবং দিল ও দেমাগও প্রস্তুত আছে। যা হোক, আওয়াল-আখের ও যাহের-বাতেনের সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কেননা, তিনি তারীফ ও বন্দনার উপযুক্ত।

বান্দা শাব্বীর আহমাদ উসমানী

২১ জুমাদাল উলা, ১৩৪৩ হিজরী

***

হযরতুল আল্লাম
মাওলানা আযীযুর রহমান দেওবন্দী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হামদ ও সালাতের পর!

কাদিয়ানের এক ধর্মদ্রোহী ও দাম্ভিক দল ইসলামের সাথে ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ ও না-ফরমানী করেছে। দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তারা। নিজেদের নেতার ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ নবুয়ত অথবা গায়বী প্রতিনিধি বা মাহদী ও দীনে মাতীনের মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি তুলেছে। তাদের প্রোপাগান্ডা বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য, তাদের মিথ্যা কথাবার্তা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কোমরে কাপড় বেঁধে আল্লামা ও ফাহ্হামা, দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস ও সদর মুদাররিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী পরিপূর্ণ উপকার করেছেন; সর্বোত্তম, মজবুত ও সুদৃঢ় কাজ করে দেখিয়েছেন। কাদিয়ানীর অনুসারী উভয় দলকে মুলহিদ, দাম্ভিক, বিদ্রোহী প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাদের দাবি-দাওয়া এমনসব দলিল-প্রমাণের আলোকে রদ করেছেন যে, এর চেয়ে অধিক কিছু বলার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিদান নসীব করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, দেওবন্দ]

আল্লামা মুফতী মাওলানা
আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সাধারণ মানুষ, এমন কি সমঝদার হিসেবে বিবেচিত আলেমসমাজেরও ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, যেসব লোকের যবান থেকে কালিমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হয় এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আছে বলে প্রকাশ করে, তারা পাক্কা মুমিন, যদিও তারা আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নত থেকে হাজার কথা অস্বীকার করুক, অথচ সেগুলো সংখ্যাগুরু মুসলিম আলেমের দৃষ্টিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কিন্তু তারা এমনসব তাবীল করে, যা বর্ণিত ও প্রসিদ্ধ আকীদা বাতিল করে দেয়। কাজেই তাদের কাছে আংশিক ঈমান এমন হয়েছে যে, আংশিক কুফর তাদের জন্য কোন ক্ষতিকর নয়।

মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে একথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আমরা আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করব না। সম্ভবত অনেকেই মুজতাহিদ ইমামদের কথা বুঝে উঠতে পারেননি। যা হোক, বিশেষ-নির্বিশেষ সকলেরই জরুরতের দাবি ছিল যে, এমন একটি পুস্তক থাকা দরকার, যা ঈমান বরবাদ হওয়ার সুরতগুলো খুলে বয়ান করে দিবে; দলিল-প্রমাণসহ পূর্ববর্তীদের অভিমত স্পষ্ট করবে। যা দূর করে দিবে সন্দেহকারীর সন্দেহ এবং সেইসব কাফের ও যিন্দীককে কাফের সাব্যস্ত করবে, যারা বাতিল ব্যাখ্যার আলোকে এবং পথভ্রষ্টকারী বিকৃতির মাধ্যমে নিজেদের খাহেশাত অনুসরণ করে। সেই পুস্তক এমনভাবে হক মাসলাক স্পষ্ট করে সন্দেহকারীদের সন্দেহ দূর করবে যে, একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে, আর কোন প্রকার সন্দেহ প্রবেশ করতে পারবে না এবং সুস্থ বিবেকের অধিকারী কোন ব্যক্তির কোন অস্পষ্টতা বাকি থাকবে না।

আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা এই যামানার অনেক বড় আলেমকে তৌফীক দান করেছেন, যিনি অনেক বড় আকলমান্দ, যামানার ফকীহ ও মুহাদ্দিস। বর্ণনার ক্ষেত্রে যিনি বিশ্বস্ত এবং বিবেক ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে হুজ্জত। তিনি হলেন আলেমসমাজের শায়খ মাওলানা মৌলভী আন্‌ওয়ার শাহ সাহেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও সমস্ত মুসলমানের উপর তাঁর ছায়াকে

দীর্ঘস্থায়ী করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে তাঁকে কামিয়াব করুন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি এই আবেদনের উপর লাব্বাইক বলে এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উমদা রচনা পেশ করেছেন এবং পুস্তকের নাম দিয়েছেন 'ইকফারুল মুলহিদীন ফী শাইয়িম মিন জরুরিয়াতিদ দীন'। এই পুস্তকে তিনি অনেক পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন এবং এমনসব মূলনীতি একত্র করেছেন, যেগুলোর আলোকে কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। তফাত সহজ হয়ে যায় হকপন্থী ও দাম্ভিক লোকদের মধ্যেও। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের বক্তব্যকে আল্লাহর কিতাব ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা পোখতা করেছেন। বড় বড় ইমামদের রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। যা হোক, কাশ্মীরী এমক একটি সুন্দর পুস্তক রচনা করেছেন, যার জন্য দিল এখনও নাড়া দিয়ে ওঠে এবং দিল এই পুস্তক পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى النبي الكريم وَآلِهِ وَأَصْحَابِهْ.

আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ সাজ্জাদ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুর্তাজা হাসান
(নাযেম, দারুল উলূম দেওবন্দ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

পাঞ্জাবের মুসায়লামা কায্‌যাব নিঃসন্দেহে খতমে নবুয়ত ও রেসালতকে অস্বীকার করেছে, এর অর্থ বিকৃত করেছে এবং কুফরের আনুগত্য করেছে। হাকীকী ও শরয়ী বরং নতুন শরীয়ত ও ওহী এবং নতুন কিতাবের দাবি করেছে সে। নবীদের মানহানী করেছে; বিশেষত আমাদের সরদার হযরত ঈসা আ.-এর। সে ফাসেদ তাবীলের মাধ্যমে দীনের জরুরী বিষয়াদি অস্বীকার করেছে। এই অস্বীকৃতির উপর তার স্বীকারোক্তি আছে। এক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যা ও লুকোচুরি নেই তার।

সুতরাং কোন প্রকার শকসন্দেহ ছাড়া মির্যা কাদিয়ানী এবং যারা তার অনুসরণ করবে, সবাই মুলহিদ [নাস্তিক], যিন্দীক, কাফের ও মুরতাদ। ফতোয়া এই বক্তব্যের উপরই এবং একথাই সত্য ও সঠিক। এমনইভাবে সেই ব্যক্তিও কাফের, যে মির্যা কাদিয়ানীর কুফরী বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও তার কুফর ও আযাবের ব্যাপারে সন্দেহ করবে। বিপদ ও যাতনা তার উপর বর্তাবে। দুনিয়াতে তার জন্য থাকবে লানত, আখেরাতে অপমান, লাঞ্ছনা, আযাব ও শাস্তি।

যদি মির্যা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ মনে না করা হয়, তা হলে মুসায়লামা কায্‌যাব ও তার অনুসারীদের ইসলাম থেকে খারিজ ও মুরতাদ হওয়ার কী অর্থ হতে পারে? এমনইভাবে মুসায়লামার মত যত লোক আছে, তারা শেষ পর্যন্ত [ইসলাম থেকে] খারিজ ও মুরতাদ হবে কেন?

যা হোক, আল্লাহ তাআলা আমার ও সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে একজনকে উত্তম জাযা দান করুন এবং তার ঠিকানা সুন্দর করে দিন, তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের শায়খ, ইহ-পরকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুদ্র মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার শাহ কাশ্মীরী। যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদাররিস পদে সমাসীন রয়েছেন। তিনি 'ইকফারুল মুতাআওবিলীন ওয়াল-

মুলহিদীন ফী শাইয়িম মিন যারূরিয়্যাতিদ দীন' নামক তাঁর একটি পুস্তকে কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা, আসহাবে উসূল ও মুফাসসিরদের বাণী ও বক্তব্য আলোচ্য প্রসঙ্গে চূড়ান্ত হিসেবে তুলে বয়ান করেছেন যে, নিঃসন্দেহে দীনের জরুরী বিষয়াদি থেকে কোনটা অস্বীকার করা জায়েয নয়।

এই পুস্তিকাটি পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট। এই পুস্তক মূলনীতি ও বিস্তারিত বিবরণ এবং মূল্যবান মুক্তা ও উজ্জ্বল বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। আজায়েব ও গারায়েব দ্বারা পরিপূর্ণ। তারপর মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই পুস্তক দ্বারা উপকার ও ফায়দা হাসিল করা কোন কঠিন বিষয় নয়। কাজেই মুসলমানদের জন্য এই পুস্তক অধ্যয়ন করা খুব জরুরী। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রচার করাও জরুরী। তা ছাড়া মুসায়লামা কায্যাবের অনুসারীদেরকে সমূলে খতম করে দেওয়াও মুসলমানদের জন্য জরুরী। এই পুস্তকের কিছু এবারত মুখস্থ করা জরুরী, যাতে সিন্ধুর বিন্দু দ্বারা তাদের কুফর, ইলহাদ ও নাস্তিকতার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা তৌফীক দিয়ে থাকেন। আল্লাহর জন্যই শুরু ও শেষের সমস্ত প্রশংসা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নবী ও হাবীবের উপর এবং বংশধর ও সাহাবীদের উপর, যতদিন ঐক্য ও বিবেধ বাকি থাকবে। হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে কবুলিয়ত দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হে আল্লাহ! ইসলাম, কুরআন, দীন ও দীনওয়ালাদেরকে হেফাযত করুন।

***

হযরত মাওলানা রহীমুল্লাহ বিজনূরী

হাম্দ ও সালাতের পর!

দুর্বল গুনাহগার বান্দা রহীমুল্লাহ বিজনূরী, যে আশা রাখে তার শক্তিধর রবের রহমতের, সে বলছে, নিঃসন্দেহে আমার দৃষ্টিতে এই পুস্তক সবচেয়ে উপকারী; পরিপূর্ণ ফায়দা দানকারী একটি পুস্তক। এই পুস্তক রচিত হওয়া ছিল জরুরী। বিশেষত যথার্থতা যাচাইকারীদের বেলায় সেইসব ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের পরিপূর্ণ ধারণা নেই এবং দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

হযরত আকদাস মাওলানা
শায়খ হাবীবুর রহমান
(নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত সেই আল্লাহ, যিনি দীনে মাতীন হেফাযতের যিম্মাদার হয়েছেন, যিনি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক যামানায় এমন জামাত নিযুক্ত করেছেন, যারা ধর্মীয় বিষয়ে সুস্থ জ্ঞান রাখেন, যাতে তারা দীনী বিষয়গুলো সঠিক কাঠামোতে অবশিষ্ট রাখেন এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন, যারা অন্যদেরকে স্পষ্ট গুমরাহীর কূলে নিয়ে যেতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ ছাড়া তারা যাতে দীনের চৌহদ্দিকে কুফরের অসূচিতা আর ইলহাদ ও নাস্তিকতার কদর্যতা থেকে পবিত্র রাখতে পারেন এবং সোনালী উষার মত হক রৌশন ও আলোকিত হয়ে যায়।

পরিপূর্ণ রহমত ও সালামত নাযিল হোক আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি আমাদেরকে এমন এক আলোকোজ্জ্বল দীনের উপর অধিষ্ঠিত করে গেছেন, যার দিন ও রাত সমান আলোকিত। সুতরাং এখন গুমরাহীর গহ্বরে শুধু তারাই পতিত হবে, যাদেরকে তৌফীক ও একীন থেকে মাহরূম করে দেওয়া হয়েছে। পরিপূর্ণ রহমত ও সালামত বর্ষিত হোক হযরতের বংশধর ও সাহাবীদের উপর, যাঁরা শরীয়তের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন এবং শরীয়তের মিনার মজবুত করেছেন। কাজেই (তাদের মেহনতের পর) এখন দীন দুনিয়ার সমস্ত দিগন্তে খুব চমকাচ্ছে, যেমন দুনিয়ার আফ্তাব আসমান ও জমীনের উপর চমকায়। তাঁরা দীনের সাহায্যে নিজেদের জান ও মাল উজাড় করেছেন এবং প্রত্যেক ইতর, মিথ্যুক ও দাম্ভিককে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এমন কি যাঁরা দীনের জরুরী কোন বিষয়কে অস্বীকার করেছে, সাহাবায়ে কেরাম তাকে কতল করে দিয়েছেন। কিংবা যেকোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নবুয়তের দাবি তুলেছে, চাই সে সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত স্বীকারই করুক না কেন, তাঁরা তাকে হত্যা করে দিয়েছেন। যেমন, আসওয়াদ আনাসী, মুসায়লামা কায্যাব। সুতরাং দীন ইসলামের ব্যাপারে কোন নম্রতা তাদের জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করতে

পারেনি; কোন দয়াদ্রতা তাদেরকে সত্য দীন থেকে বহিস্কৃত অভিশপ্তদের উপর কঠোরতা করতে বাধা সৃষ্টি করেনি।

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

কোন সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এক যামানাও এমন অতিবাহিত হয়নি, যা ফেতনা থেকে মুক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকটি যামানায় এমন ফেতনা বিদ্যমান রয়েছে, যা যামানার মানুষকে বে-কারার ও বে-চাইন করে রেখেছে। ফেতনার ভয়াবহতা ও তীব্রতা, ফেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অঙ্গারের ইশারা যামানার মানুষকে লাঞ্ছিত করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেফাযত করার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং ফেতনার ভয়াল আক্রমণের সময় সমকালীন সুলতান ও সুদৃঢ় একীনের অধিকারী আলেমসমাজকে তৌফীক দিয়ে ধন্য করেছেন যে, তাঁরা আল্লাহ সাহায্যে বিভিন্ন ফেতনার শিকড় উপড়ে ফেলেছেন; ফেতনার বুনিয়াদ ধসিয়ে দিয়েছেন। শক-সন্দেহের অন্ধকার দীনের আলোকোজ্জ্বল চেহারা থেকে হটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এমন কি প্রত্যেকটি ফেতনা আত্মপ্রকাশের পর তাদের মেহনতের বদৌলতে কর্পূরে পরিণত হয়েছে এবং তীব্র হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়ার পর বিলীন ও দুর্বল হয়ে গেছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত হয়ত বা সেই ফেতনার শুধু নাম বাকি থেকেছে, অথবা বাকি থেকেছে ক্ষুদ্র একটি দল হিসেবে কোন রকমে। এমন লোক পাওয়া যায়নি, যারা এই খড়কুটোর উপর ভরসা করে সেই ফেতনা গ্রহণ করবে।

যা হোক, এদের একটা সংখ্যা ছিল; তবে এদের লশকর ছিল না। তুমি কি নাম শোননি বাতেনিয়া ও কারামিতা ফেরকার। (এ দুটি ছিল এমন গুমরাহ ফেরকা) যাদের সময়কাল দীর্ঘ হয়েছিল এবং শক্তি মজবুত হয়েছিল। এমন কি এরা [বাইতুল্লাহ শরীফের] মাতাফ ও আরাফাতে হাজীদের অনর্থক রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তারা হাজরে আস্‌ওয়াদ উপড়ে ফেলেছিল এবং সেটা নিয়ে গিয়ে জার পাহাড়ে স্থাপন করেছিল। এখন তারা কোথায় চলে গেছে? আর এখন সেই বরগুওয়াতা ফেরকার লোকজন কোথায়, যারা বিভিন্ন শহর দখল করেছিল এবং আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের উপর বর্বরতা চালিয়েছিল। ঘরে ঘরে সৃষ্টি করেছিল বিশৃঙ্খলা। পাঠক! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও? না কি তাদের কোন আওয়াজ শুনতে পাও? কোথায় আজ মাহদিভিয়া ফেরকা আর জৌনপুরের অনুসারীরা? সব হারানো জেলখানার কয়েদী আর কবরে সমাহিত মুর্দারের মত দু'চার জন ছাড়া আছে কি তাদের কেউ?

নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের বিচারে সবচেয়ে বড় এবং ফেতনা ও মসীবত হিসেবেও সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে সেটা, যাকে কাদিয়ানের ফেতনা বা ফেতনায়ে মির্যাইয়্যা বলা হয়। এর সরদার মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী খতমে নবুয়ত অস্বীকার করেছে। সে ধারণা করে বসেছে যে, সে একজন নবী– চাই পরোক্ষ হোক, অথবা প্রত্যক্ষ, কিংবা শরীয়তপ্রাপ্ত। এসবকিছু তার সেই বইপুস্তকের পাতায় রয়ে গেছে, যেগুলো সে তার সন্তানাদির জন্য কালো করে গেছে। সে বিষাক্ত কথাবার্তা অনুসারীদের কাছে বলতেই ছিল, এক পর্যায়ে তাদের অন্তরে মির্যার মিথ্যা নবুয়ত জায়গা পেয়েছে এবং তারা তার মিথ্যা ওহী, মিথ্যা কালাম ও মিথ্যা মুজিযা বিশ্বাস করে নিয়েছে। সুতরাং তার উম্মত উম্মতে মুহাম্মাদী থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি মির্যার মিথ্যা নবুয়ত অস্বীকার করে, কাদিয়ানী জাত তার মুসলমান হওয়াকে অস্বীকার করে। পুরো দুনিয়ার কোন মুসলমানের পিছনে কোন কাদিয়ানী নামাযও পড়ে না; জানাযাও পড়ে না এবং মুসলমানের কাছে কাদিয়ানীর নারীর বিবাহও তারা জায়েয মনে করে না।

এই নবুয়তের দাবিদার শুধু এতটুকুর উপর ক্ষান্ত হয়নি; সে বরং নিজের জন্য সমস্ত নবীরসুলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছে। এমন কি সরদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে বসেছে সে। আমাদের সরদার হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, যিনি রূহুল্লাহ এবং আল্লাহর সাচ্চা রসুল, মির্যা তাঁর মানহানী করেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সে এমনসব খারাপ কথা বলেছে, কোন মুসলমান যেগুলো শোনার শক্তি রাখে না।

পরে তার অনুসারীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক ভাগ তার প্রকৃত নবুয়তকে আবশ্যক জ্ঞান করে প্রকাশ্যে তার নবুয়তের ঘোষণা করে যাচ্ছে। এই গলদ কাজ থেকে তাদেরকে ধর্ম ফিরিয়ে রাখে না; ফিরিয়ে রাখে না শরম-লজ্জাও। বেশির ভাগ মির্যায়ী এই ফেরকারই অন্তর্ভুক্ত। অপর ভাগ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে এবং ভিতরে ভিতরে সেই আকীদা পোষণ করে, যেটা মির্যা কাদিয়ানী দাবি করেছিল। এই ভাগ মুনাফিকী কায়দায় ধোঁকা দিয়ে বলে থাকে, মির্যা তাঁর নবুয়তের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমরাও তাঁকে নবী বলে মান্য করি না; বরং আমরা তাঁকে সমাজসংস্কারক, মুজাদ্দিদ ও প্রতিশ্রুত মাসীহ বলে ধারণা করি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি,

মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং মির্যার গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র প্রচার করার জন্য। এই ভাগ প্রথম ভাগের চেয়ে বেশি ভয়াবহ। কেননা, অনেক মুসলমান, যারা মির্যার গোপন চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত নন এবং এই হিলাবায় মুনাফিকদের কলাকৌশল সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা যখন তাদের এসব কথা শোনেন, তখন তারা মির্যা কাদিয়ানী সম্পর্কে এসব বক্তব্য ভালো ও সঠিক মনে করেন। তারপর মির্যা কাদিয়ানীর ফাযায়েল মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, যেগুলো কাদিয়ানীদের মনগড়া। এসব বৈশিষ্ট্য শুনে, যেগুলো নিয়ে তারা নিজেরাই বিরোধ করেছে, সরলমনা মুসলমান বিশ্বাস করে বসেন যে, মির্যা নেককার লোক ছিল। এটা একটা জাল, যা দিয়ে গাফেল ও ইলমহীন মুসলমানদেরকে শিকার করা হয়।

হে জাগ্রত মস্তিষ্কের পাঠক! তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো মুসলমানদের সাথে এই জালেম শ্রেণির মুনাফিকী কত দূর গিয়ে পৌঁছেছে। তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করতে সেই লোক ইতস্তত করে, যে তাদের লক্ষ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। সৃষ্টির সূচনা থেকে আল্লাহর নিয়ম সচল। ফেতনা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাকি থাকে; তার আগুন জ্বলতে থাকে এবং উড়তে থাকে স্ফুলিঙ্গ। তারপর নিভে যায়। আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েই থাকে যে, আল্লাহ তাআলা হককে বাকি ও সাবেত রাখেন এবং বাতিলকে মিটিয়ে দেন। সুতরাং ইসলাম তেমনই খালেস ও তাজা থেকে যাবে, যেমন ছিল শুরুতে এবং মুসলমানদেরকে মদদ সবসময়ই করে যাওয়া হবে। তারা হকের উপর অটল থাকবে এবং এসব ফেতনা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং হ্রাস করতেও পারবে না মুসলমাদের সংখ্যা। তবে এতদসঙ্গে দীনদার শাসক ও কামেল একীনের অধিকারী হক্কানী আলেমদের জন্য আবশ্যক ছিল এসব ফেতনার মূলৎপাটনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো, ফেতনার মোকাবেলায় চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রাখা এবং ইসলামের সাহায্যে নিজের যিম্মাদারী আদায় করা। অন্যথায় মুসলমান লাঞ্ছিত হত; দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তাদের নাম পর্যন্ত মিটে যাওয়ার উপক্রম হত। আল্লাহ তাআলা তাদের পরিবর্তে অন্য কওম সৃষ্টি করতেন। সুতরাং আলেমদের একটি জামাত এই দায়িত্ব আদায়ের জন্য এবং হককে সাহায্য করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, যাতে এই ফেতনার মূলৎপাটন করে দেওয়া যায় এবং এর সুপ্ত ধোঁকা প্রকাশ করে দেওয়া যায়। সুতরাং তাঁরা বইপুস্তক ব্যাপক করে দিয়েছেন। এক পর্যায়ে হক স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং বাতিল হয়ে

গেছে লাঞ্ছিত। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কুফর ও ইরতিদাদের যেসব গোপন চক্রান্ত করেছিল, সেগুলোর বিশেষ-নির্বিশেষ সবাই অবগত হয়ে গেছেন। কাজেই এখন তার অনুসারীদের মধ্যে সেই দল অবশিষ্ট রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তরে মোহর অংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর ভরে দিয়েছেন বক্রতা দিয়ে। সুতরাং এসব লোক কখনই ঈমান আনবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভয়াবহ আযাবের মুখোমুখি না হবে।

মুসলমানদের মধ্যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি এই ফেতনার মূলোৎপাটনের জন্য সোচ্চার হয়েছেন, যে ফেতনায় লিপ্ত ব্যক্তিরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার বাতিল দাবিগুলো উপড়ে ফেলার জন্য এবং মুলহিদ ও তাবীলকারী আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি আদেল শায়খ, পরহেযগার ও মুত্তাকী, হাফেয ও হুজ্জত, মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আকলী-নকলী বিষয়াদিতে সাগরসম ইলমের অধিকারী এবং মুশকিল মাসআলা-মাসায়েলে গবেষণার ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী, তাঁর সম্মানিত নাম হযরত মাওলানা আন্ওয়ার শাহ সাহেব কাশ্মীরী। দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদাররিসের পদে সমাসীন আছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন নিরাপত্তায় রাখুন এবং তাঁকে খুব সাহায্য করুন।

তিনি একটি পুস্তক লিখেছেন, তার মধ্যে তিনি এই মাসআলার প্রত্যেক সেই কথা জমা করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন আলেমসমাজ যেগুলোর মুখাপেক্ষী হন। তিনি এতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ পেশ করেছেন এবং দিবালোকের স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মির্যায়ীরা মুসলমান নয়; তারা মুসলমানদের সমস্ত ফেরকা থেকে খারিজ।

এটা এমন এক পুস্তক যে, ন্যায়পরায়ন ও সচেতন ব্যক্তি যখন এটা দেখবে, তখন আর কোন শকসন্দেহ থাকবে না এবং মির্যায়ীদের ইসলামী ফেরকাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা করবে না।

আল্লাহ তাআলা কয়েক গুণে বাড়িয়ে তাঁকে বদলা দান করুন। তাঁর হায়াতে বরকত দিন। এই পুস্তককে মুসলমানদের জন্য উপকারী করুন। আল্লাহ তাআলা সেইসব লোককে হেদায়েত নসীব করুন, যারা মির্যায়ীদের ব্যাপারে সন্দেহ করে।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

বান্দা হাবীবুর রহমান দেওবন্দী উসমানী

পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

বাইতুল হারাম ভূখণ্ডের হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নবুয়তের মহাসূর্য উদিত হল এবং জমীনী মাখলুকের আসমানী হেদায়েত প্রাপ্তির ধারা সূচিত হল। হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। শুরু হল কুরআনের অবতরণ। মক্কার কাফের ও জাযীরাতুল আরবের ইহুদী-নাসারা পুরোপুরি বিরোধ বরং বিদ্রোহ ও গোঁয়ার্তুমি শুরু করল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ভস্ম হয়ে গেল। তারপর শুধু নববী যুগে নয়; বরং সিদ্দীকী ও ফারূকী যুগেও ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতি ও অগ্রগতির একই ধারা অব্যাহত থাকে এবং ইসলাম প্রাচ্য-পাশ্চাত্যসহ সারা দুনিয়ায় আগুনের লেলিহান শিখার মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু একই সাথে ইসলামের শত্রুসমাজের মধ্যে রাগগোস্বাও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় উসমানী যুগে ফারূকী যুগের মত সতর্কতা ও সচেতনতা বহাল থাকতে পারেনি। কাজেই অসুস্থ হৃদয়ের লোকজন বিশেষত মুসলমানের মুখোশধারী ইহুদীরা গোপনভাবে চক্রান্ত শুরু করে। এমন কি হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর চার দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফেতনা প্রকাশ্যে মাথা তুলতে থাকে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র যামানায় এসব ফেতনা যুদ্ধের রূপ লাভ করে তীব্র আকার ধারণ করে। যদি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মত মহান ব্যক্তি না হতেন, তা হলে হয়তো ইসলাম খতম হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বরকতে ইসলামের হেফাযত করেন। যেমনইভাবে সিদ্দীকী যুগে মুরতাদ হওয়া এবং যাকাত অস্বীকারের ফেতনা পূর্ণ শক্তির আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং আল্লাহ তাআলা সিদ্দীকী প্রতিরোধ ও দৃঢ়তার বরকতে ইসলামের হেফাযত করেছিলেন, ঠিক তেমনইভাবে খারেজী ও শিয়াদের বাড়াবাড়ির কারণে আলী মুরতাজার খেলাফতকালে ইসলামের পতনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। পরে ইসলাম বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু জামাল ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের মত বেদনায়ক ও

রক্তবাহী ঘটনা অবশ্যই দেখা দেয় এবং ইসলামের পুণ্যভূমি সাহাবা ও তাবেয়ীনের রক্তে রঞ্জিত হয়। ফলে শিয়া, রাফেযী, খারেজী, মু'তাযেলীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ফেতনার শিকড় দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রথম বারের মত 'ঈমান' ও 'কুফরে'র মাসআলা সামনে উপস্থিত হয় এবং এই বিষয়ে কার্যকর গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয়।

মজার বিষয় ছিল এই যে, খারেজী ও মু'তাযেলী সম্প্রদায়ও তাওহীদের দাবিদার ছিল এবং শিয়া আর রাফেযী সম্প্রদায়ও ইসলাম ও আহলে বাইতের মহব্বতের দাবিদার ছিল। তবে উভয় ফেরকা সাহাবায়ে কেরামের কুফরের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল, আর এতদসঙ্গে তারা নিজেদের ঈমানের দাবি করত। তারপর এই দুই ফেরকা থেকেই 'জাহমিয়া', 'মুরজিয়া', 'কাররামিয়া' ইত্যাদি ইসলামের দাবিদার নতুন শাখার আবির্ভাব হতে থাকে। এই ফেরকাগুলোর প্রত্যেকটি নিজেদের ছাড়া বাকীদেরকে কাফের বলত।

কাজেই ইসলাম হেফাযতের জন্য মাপকাঠি ও নাজাতের মানদণ্ড কী, এবং ইসলামের হাকীকত কী, আর কুফরের মূল বুনিয়াদ কী, তা গবেষণা করে সমাধান করে দেওয়ার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়।

সুতরাং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, আবু উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লাম, মুহাম্মাদ ইবনে নাস্‌র মারওয়াযী, মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম তূসী, আবুল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে রুস্তা, ইবনে হিব্বান, আবু বকর বায়হাকীসহ হাদীসের বিভিন্ন ইমাম ঈমান প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসী তরীকায় পুস্তকাদি সংকলন করেছেন। যথাসম্ভব হাফেয ইবনে তাইমিয়ার 'কিতাবুল ঈমান' মুহাদ্দিসী তরীকায় রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ। তবে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মুহাদ্দিসী তরীকার পুস্তকাদি যথেষ্ট ছিল না। কাজেই কালাম-শাস্ত্রবিদগণ এই ময়দানে পদার্পণ করেন এবং পূর্বতন কালাম-শাস্ত্রীদের রচনাবলিতেও এসব মাসআলা আলোচিত হয়। ইমাম আবুল হাসান আশআরী থেকে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী পর্যন্ত বড় বড় কালাম-শাস্ত্রীগণ এ বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এবং তুলে ধরেন যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি ও বিবৃতি নির্ভর আলোচনা। সম্ভবত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ গাযালী তূসী (মৃ. ৫০৫ হি.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী স্বতন্ত্র পুস্তক লেখেন, যার নাম 'ফায়সালুত

আফরিকা বায়নাল ইসলামি ওয়ায্‌-যান্দাকাহ'। মিসর ও হিন্দুস্তান– উভয় স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আস্তে আস্তে এই মাসআলা ফুকাহায়ে কেরামের সীমানায় প্রবেশ করে। ফুকাহায়ে কেরামও তাদের নিজস্ব ফিকহী ধাঁচে এই প্রসঙ্গে অনেক লেখালেখি করেন। কিন্তু এক দিকে উম্মতের সামনে ছিল ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য– 'আমরা কোন আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করব না', অন্য দিকে এও তাদের সামনে ছিল যে, দীনের জরুরী বিষয়াদীর কোন একটি অস্বীকার করা কুফর; বরং দীনের জরুরী বিষয়ে 'তাবীল' করাও কুফরের কারণ।

মোট কথা, গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতার বিচারে এই বিষয়টি অধিক থেকে অধিক জটিল হয়ে গেছে। এমন কি ঈমান ও কুফরের স্বতঃস্ফূর্ত মাসআলাও তাত্ত্বিক বনে গেছে। অন্য দিকে দীনের শত্রুরা এসব শাস্ত্রীয় জটিলতা ও ফাঁকফোকর থেকে না-জায়েয স্বার্থ হাসিলের সুযোগ নিয়ে চলেছে।

এরই ফাঁকে পাঞ্জাব ভূখণ্ডে এক 'নবুয়তের দাবিদার' পয়দা হয়। সে তার স্বতন্ত্র শরীয়তনির্ভর নবুয়ত প্রমাণের জন্য দীনের অকাট্য বিষয়াদি অস্বীকার করা শুরু করে। খতমে নবুয়তের মত সর্বসম্মত ও বুনিয়াদীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে নতুন করে আলোচনার অধীনে নিয়ে আসে। এই যামানায় জেহাদ ও হজ রহিত বলে ঘোষণা করে। একই সঙ্গে গোলকধাঁধা সৃষ্টির জন্য উচ্চস্বরে 'তাবলীগে ইসলামে'র শ্লোগান দিতে থাকে।

সারকথা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে দীন হেফাজতের জন্য তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে এসব বিষয়ে উম্মাহর দিকনির্দেশনার উদ্দেশ্যে একটি বস্তুনিষ্ঠ রচনা সামনে আসে। তা হলে এসব সূক্ষ্ম ও জটিল ক্ষেত্রে কুফর ও ইসলামের ব্যবধান বুঝতে আগামী প্রজন্মকে বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু এসব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যে কোন আলেম ও ফকীহের কাজ নয়; আবার যে কোন রচনাকার লেখকেরও কাজ নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিত্বের, যিনি যথাক্রমে মুহাদ্দিস, ফকীহ, কালামশাস্ত্রবিদ, উসূলবিদ, ইতিহাসবিদ, আন্তঃধর্ম বিশ্লেষক, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও নিরপেক্ষ। যার জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশ্লেষণে অতিবাহিত হয়েয়েছে। যিনি

মুজতাহিদসুলভ রুচির অধিকারী এবং ফেতনা-ফাসাদ ও দল-উপদল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

আল্লাহ তাআলা এই মহান ইলমী ও দীনী খেদমতের জন্য ইমামুল আস্র হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী দেওবন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহকে নির্বাচন করেছেন। সমকালীন আলেমসমাজে তিনি 'ইমামতে কুব্রা'র মর্যাদা রাখতেন। তিনি এমনই অদ্বিতীয় ছিলেন যে, বিগত শতাব্দীতে তাঁর সমকক্ষ পাওয়া মুশকিল। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গদের মধ্যে যে পরিপূর্ণতার অধিকারী কতিপয় পবিত্রাত্মা অতিবাহিত হয়েছেন, হযরত শাহ্ সাহেবও তাঁদের মত বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাস্সিরীনের রচনাবলিতে যেখানেই সোনালী উদ্ধৃতি ছিল– চাই সেগুলো দূর থেকে দূরের ক্ষেত্রেই থাক না কেন– বিস্ময়কর অবগাহনের কারিশমা দেখিয়ে সেগুলোর মধ্য থেকে হীরা-জহরত চয়ন করে উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। তাঁর এই অনুসন্ধান শুধু মুদ্রিত গ্রন্থাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এই মাকসাদে তিনি স্বাভাবিক সামর্থ্যের বাইরে দুর্লভ পাণ্ডুলিপি (কলমী নোসখা)-সমূহের মহাসমুদ্রে পর্যন্ত সন্তরণ করেছেন। তারপর শুধু পরিচিত অধ্যায়াবলি ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতেই অনুসন্ধান করেননি; বরং কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি শুরু অবধি শেষ অধ্যয়ন করে পুরো কিতাবের যেখানে যেখানে অমূল্য রতন (মূল্যবান উদ্ধৃতি) নাগালে পেয়েছেন, সব গেঁথে ফেলেছেন। মুহাক্কিক ইবনে ওযীর ইয়ামানীর অমুদ্রিত বিশাল বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ 'আল-কাওয়াসি ওয়াল-আওয়াসিম' পুরোটা অধ্যয়ন করে সব বিচ্ছিন্ন অংশ (উদ্ধৃতি) একত্র করেছেন। একইভাবে 'ফাতহুল বারী'র মত ১৩ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে যেসব মুফীদ তথ্য পেয়েছেন, সেগুলো একত্র করেছেন। যে কোন আলেম বা বিশ্লেষক কি ভাবতে পারেন যে, আদীব কলকশন্দী'র নিরেট সাহিত্যগ্রন্থ 'সুবহুল আ'শা ফী ফান্নিল ইনশা'র মধ্যেও এমন দীনী প্রসঙ্গেও কোন তথ্য থাকতে পারে? কিন্তু ইমামুল আস্র হযরত শাহ্ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টি থেকে তা-ও অগোচর থাকতে পারেনি। সেই গ্রন্থ থেকেও তিনি সহায়তা নিয়েছেন। ইমাম বুখারীর 'খাল্কু আফ্আলিল ইবাদ', ইমাম যাহবীর 'কিতাবুল উলূ', বাইহাকীর 'কিতাবুল আসমা ওয়াস-সিফাত', ইবনে হযমের 'কিতাবুল ফাসলে ফিল-মিলাল ওয়াল-আহ্ওয়ায়ি ওয়ান-নাহ্ল',

আবদুল কাদের তামীমী বাগদাদীর 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' আবুল বাকা'র 'আল-কুল্লিইয়াত', শায়েখে আকবারের 'আল-ফুতূহাতুল মাক্কিইয়া', শা'রানীর 'আল-এওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির', সুয়ূতীর 'আল-খাসায়েস' ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি সেভাবেই আসতে থাকে, যেভাবে কালাম, ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ, হাদীস, উসূলে হাদীস ও তাফসীরের উদ্ধৃতি ও হাওয়ালা আসতে থাকে। হাফেজ ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলি– কিতাবুল ফাতাওয়া ৬ খণ্ড, আল-মিনহাজ, আস-সারেমুল মাসলূল, বুগ্ইয়াতুল মুরতাদ, কিতাবুল ঈমান ও আল-জাওয়াবুস সহীহ-এ যেখানে যেখানে মুফীদ তথ্য পাওয়া গেছে, উল্লেখ করে দিয়েছেন। হাফেয ইবনে কাইয়িমের রচনাবলি– 'শিফাউল আলীল', যাদুল মাআদ ইত্যাদিতে যেখানে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, যথাস্থানে উদ্ধৃত করেছেন। এভাবে প্রায় দুইশ' গ্রন্থ-পুস্তক থেকে শত শত উদ্ধৃতি ও হাওয়ালা প্রতিটি মাসআলা ও প্রতিটি শিরোনামের অধীনে এমনভাবে জমা করেছেন যে, পাঠকের মনে হতে পারে যে, হয়তো সারা জীবন এই এক গ্রন্থের পিছনেই অতিবাহিত হয়েছে। অথচ আপনি শুনে অবাক হবেন যে, এমন একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহে। এটা সেই মহান ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব ছিল, যিনি ইলমের পুরো কুতুবখানা রপ্ত করেছিলেন এবং অধ্যয়নকৃত প্রতিটি কিতাব তাঁর এতটাই মুখস্থ থাকত যে, কেমন যেন তিনি সেটা এইমাত্র দেখেছেন।

তারপর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শুধু হানাফী কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করা হয়নি; যাতে একথা বলার অবকাশ ছিল যে, এটা তো বিশেষ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি। বরং মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও ইমাম চতুষ্টয়ের গ্রন্থাবলি থেকে বিরল উদ্ধৃতিরাজি পরিপূর্ণরূপে জমা করেছেন। ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা পুরো মুসলিম উম্মাহ ও সমস্ত মাযহাবের ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত এবং কোন পক্ষ থেকে আপত্তি বা শক-সন্দেহ করার সুযোগ নেই। একইভাবে কালাম বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে মাতুরীদী, আশায়েরা ও হাম্বলীদের আকায়েদ ও কালামের গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। কোন দিক থেকে ছিদ্র থাকতে দেওয়া হয়নি।

তারপর যেসব আলেম দেওবন্দের আকাবির, তাঁদের সবার অভিমত নেওয়া হয়েছে, যেন স্পষ্ট হয় যে, এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিমত নয়; বরং বর্তমান যামানার মুসলিম উম্মাহর গণ্যমান্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং এ

বিষয়ে কোন আলেমের দ্বিমত নেই। অভিমত প্রদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

০১. হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান দেওবন্দী, মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ

০২. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী

০৩. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, আল-মাদানী

০৪. হযরত মাওলানা হাকীম রহীমুল্লাহ বিজনূরী, শাগরেদ– হযরত নানূতাভী

০৫. হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী

০৬. বিহারের আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাজ্জাদ বিহারী

০৭. হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ

মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কুদরত এই শেষ যামানায় ইমামুল আসর হযরত শায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে এমন ইলমী জটিলতাগুলো হল্ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী– চাই তা মৌলিক হোক, অথবা সংকলিত। সবগুলোর মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। হযরাতুল-উস্তাদ মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী বলতেন–

> হযরত শাহ সাহেবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ ও তার সমস্যাবলির ব্যাপারে সম্যক অবগত। যে কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং জটিল থেকে জটিলতর মাসআলার সমাধান জানার জন্য প্রশ্ন করলে সে তার স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ পেয়ে যায়। তার দৃশ্য এমনই, যেন তিনি মাসআলাটি বহু যুগ আগে মুখস্থ করে রেখেছেন।

উপরন্তু শুধু এই নয় যে, তিনি উম্মতের আকাবির ও বড় বড় মুহাক্কিকের বক্তব্য তুলে ধরে ক্ষান্ত হয়েছেন– যদিও এভাবে এক বিষয়ের সমস্ত বক্তব্য একত্র করে দেওয়াও উম্মতের বিশেষ ব্যক্তিদের কাজ– বরং ওইসব উদ্ধৃতি আর হাওয়ালা থেকে যেসব ইলমী তত্ত্ব-তথ্য বের হতে পারে, সেগুলো আলোচ্য প্রসঙ্গের তায়িদে (সমর্থনে) যেভাবে বের করেছেন, তা শুধু শাহ সাহেবেরই কাজ।

সারকথা হচ্ছে এই নিত্যনতুন বিবিধ ফেতনার যুগে– যেখানে কোথাও মির্যায়ী ফেতনা, কোথাও খাকসারী ফেতনা, কোথাও পারভেজী ফেতনা, কোথাও ফজলুর রহমানের ইংরেজী ব্যাখ্যা– যদি এমন বিশ্লেষণধর্মী পরিপূর্ণ গ্রন্থ না থাকত, তা হলে আজ কুফর ও ঈমানের মাসআলা মারাত্মক ধূম্রজাল ও অস্পষ্টতায় পড়ে যেত। আবার বর্তমান যুগের কোন আলেমের পক্ষে দলীল ভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন আর সারগর্ভ এমন কোন পুস্তক রচনা করে দেওয়াও সম্ভব ছিল না, যা যে কোন ফেতনার প্রতিরোধ ও খণ্ডানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে। সুতরাং এই ফরযে কেফায়া এভাবে অপূর্ণই থেকে যেত। কিন্তু আল্লাহর শোকর, এখন এই মাসআলা এতটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কারও জন্য কোন শক-সন্দেহ ও ওজর থাকবে না।

তবে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল আরবীতে। হাওলা-উদ্ধৃতি সবই ছিল আরবীতে। সেগুলো থেকে আহরিত হযরত শায়েখের গবেষণাও ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম আরবীতে। সুতরাং একে একটি উদ্ধৃতির সংকলন মনে করে আরবীজানা লোকজন এবং আলেমসমাজও খরগোশের গতিতে নজর বুলিয়ে একপাশে রেখে দিত। উপরন্তু অনেক জায়গায় উদ্ধৃতি কতটুকু এবং শায়েখের এবারত কতটুকু, তা নির্ণয় করাও ছিল মুশকিল। মোট কথা, সূক্ষ্মতা ও সংক্ষিপ্তির কারণে আলেমসমাজও যথাযথ উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা ফিকিরের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

মজলিসে ইলমী করাচী'র বিশেষ অনুগ্রহ– প্রতিষ্ঠানটি সময়ের ধর্মীয় প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং একজন বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলেম– যিনি হযরত শায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য, শায়েখের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁর ইলম-কালামের সাথেও বেশ পরিচিত, তা ছাড়া সারা জীবন যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসমুদ্রে অবগাহন করে কাটিয়েছেন, তাকে পুস্তকটি উর্দু অনুবাদ করার জন্য মনোনীত করেছে।

এমন পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম একটি কিতাব, তারপর ইমামুল আসর হযরত শাহ সাহেবের সংকলন– যাঁর সূক্ষ্ম রচনাশৈলী আলেমসমাজে পরিচিত এবং তাঁর অন্যান্য রচনা একথার সাক্ষী, উপরন্তু এমন নাযুক ও শতভাগ সতর্কতার বিষয়– এর অনুবাদও কোন সহজ কাজ ছিল না। সুযোগ্য অনুবাদক (وَفَّقَهُ اللهُ لِكُلِّ خَيْرٍ) আমাদের অজস্র শুকরিয়ার উপযুক্ত, যিনি এই মুশকিল

আসান করেছেন; এই গুপ্তধনকে শুধু আলেমসমাজের জন্য নয়, বরং উর্দুজান্তা শ্রেণির জন্য ওয়াক্ফ করেছেন এবং উলামা, ফুকাহা ও মুফতীদের উপরও অনুগ্রহ করেছেন। কেননা, ইমামুল আসর হযরত শাহ সাহেবের রচনা, বরং বক্তৃতা থেকেও পুরোপুরি উপকৃত হওয়া যে কোন আলেমের সাধ্যের কাজ নয়।

যা হোক, সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনী ও ইলমী জরুরত ছিল, যা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করি, ভুক্তভোগীরা (এই প্রসঙ্গে যাদের লিপ্ত হতে হয়) বিশেষত মুফতীগণ এর কদর করবেন এবং ইমামুল আসর হযরত গ্রন্থকার ও অনুবাদক– উভয়কে দোআ খায়েরের সময় স্মরণ রাখবেন।

গ্রন্থের শেষে হযরত শায়েখ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তা হল এসব মাসআলা তাহকীকের জন্য কুরআন-হাদীসে আলেমদের উৎস কী কী এবং উলামা-ফুকাহার মাঝে মতবিরোধ কেন দেখা যায়? চমৎকার মুজতাহিদসুলভ ভঙ্গিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিজ্ঞতার সাথে মতবিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন–

> আমরা এই মাসআলায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছি। কখনও এমন হয়নি যে, একটি দিক সামনে রাখতে গিয়ে অপর দিকটির ব্যাপারে উদাসীনতা হয়েছে এবং এভাবেই অজান্তে আমরা অসাবধানতায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। এই মাসআলায় আমরা সেই সত্যই প্রকাশ করেছি, যার উপর আমাদের ঈমান ও আকীদা অধিষ্ঠিত। আমাদের চাওয়া-পাওয়া শুধু আল্লাহর কাছে এবং তিনিই আমাদের সাক্ষী ও দায়িত্বশীল।

নববী দীপাধার থেকে বিচ্ছুরিত কথ্য হাদীসকে চলার পথের লণ্ঠন হিসেবে গ্রহণ করেছেন–

> এই ইলমে দীনকে আগামী প্রজন্মের কাছে তারাই পৌঁছে দিবে, যারা উঁচু পর্যায়ের ন্যায়পরায়ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী। তারাই সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের ফেরেববাযী থেকে এবং জাহেলদের অপব্যাখ্যা থেকে দীনকে হেফাজত করবে।

কিতাবের একেবারে শেষে তিনি বলেছেন–

> কোন মুসলমানকে কাফের বলা দীন নয়; আবার কোন কাফেরকে কাফের না বলা এবং তার কুফরকে নমনীয়ভাবে দেখাও দীন নয়।

আজকাল সমাজের মানুষ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার। কেউ যথার্থ বলেছেন, 'জাহেল হয়তো বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে, নতুবা ছাড়াছাড়িতে।' وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

অনেক কিছুই লিখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ব্যস্ততার এই ধূম্রজালের মধ্যে এই কয়েক ছতরই যথেষ্ট। ইনশা আল্লাহ, এই কয়েক ছতরই এই বিরল কিতাব ও তার তরজমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সহীহ ইলম, সহীহ বুঝ, ইনসাফ, দিয়ানত ও নেক আমল করার তৌফীক নসীব করুন।

জরুরী জ্ঞাতব্য

দীন ও ইসলামের বিপক্ষে বেদীন লোক এবং হকপন্থীদের বিপক্ষে বাতিলপন্থী লোকজন ও দল-উপদল সবসময় যুদ্ধাংদেহী অবস্থানে রয়েছে। উষ্ণ ও শীতল যুদ্ধ অর্থাৎ তোপ-তলোয়ার আর কালি-কাগজের লড়াই সবসময় চলমান। যখনই আহলে হক ও আহলে ঈমান মধ্যদুপুরের সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো ও স্পষ্ট যুক্তিরাজির আলোকে বাতিলপূজারীদের শক-সন্দেহ, অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও সংশয়ের মূলোৎপাটন করে তাদের উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করেছেন, তখন সেই বাতিলপূজারীরা উলামায়ে হকের তাকফীর থেকে বাঁচার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। যেমন–

০১. কখনও তারা জনসমাজে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে যে, ফুকাহা ও মুফতীদের তাকফীর ও ইরতিদাদের এসব ফতোয়া শুধু ভয় দেখানো আর ধমকানোর জন্য। তাদের তাকফীরের ফতোয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন মুসলমান কাফের বা মুরতাদ হয় না।

যেমন, এই কিতাবেরই ২৩৪ পৃষ্ঠায়[১] আপনি ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার বরাতে এমন মূর্খতামূলক শ্লোগানের খণ্ডন লক্ষ্য করবেন।

০২. কখনও তারা বলে, আমরা তো 'আহলে কিবলা'। আর ইমাম আবু হানীফা নিজেই অত্যন্ত কঠোরভাবে 'আহলে কিবলা'কে কাফের সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন।

---

১ উর্দু সংস্করণ, মাকতাবা এমদাদিয়া মুলতান, পাকিস্তান।

০৩. কখনও বলে, আমরা তো 'মুআওয়াল' [ব্যাখ্যাকারী]। ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে মুআওয়ালকে কাফের বলা জায়েয নয়। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে যদি কারও আকীদা, কথা ও কাজে নিরানব্বইটি দিক থাকে কুফরের, আর একটি দিক তাকে কুফর থেকে বাঁচায়, তা হলে তাকেও কাফের সাব্যস্ত করা উচিত নয়।

তাবীল ও মুআওয়াল সম্পর্কে পরিপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ আপনি এই পুস্তকে অধ্যয়ন করতে পারবেন।

০৪. আমাদের যামানায় যেহেতু দুর্ভাগ্যবশত ওই মুলহিদ ও যিন্দীকেরা লেখা ও বক্তৃতায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, এজন্য তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াগুলোকে অপবাদ বলে এবং কাফের, মুরতাদ, মুলহিদ, যিন্দীক, জাহেল, বেদীন ইত্যাদি শরয়ী হুকুমগুলো গালি-গালাজ বলে উপস্থাপন করে। তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, আলেমরা গালি-গালাজ ছাড়া আর পারেই বা কী?

হাকীকত হচ্ছে এই যে, যেমনইভাবে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ ইসলামের মৌলিক আহকাম ও এবাদত এবং দীন ইসলামে এগুলোর সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র আছে, ঠিক তেমনইভাবে কুফর, নিফাক, ইলহাদ, ইরতিদাদ ও ফিস্‌কও ইসলামের মৌলিক আহকাম। দীন ইসলামে এগুলোরও সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র আছে। কুরআন করীম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকাট্যভাবে সেগুলো নির্দিষ্ট ও নির্ণয় করে দিয়েছেন।

ঈমানের সম্পর্ক কলবের একীনের সাথে। আল্লাহর একাত্ববাদ, রসূলের রেসালত এবং রসূলের আনীত দীন ও শরীয়তকে দিল থেকে মান্য করা এবং যবান দিয়ে স্বীকার করা ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জরুরী। যে ব্যক্তি একথা মানবে না, কুরআন করীমের পরিভাষায় এবং ইসলামের যবানে সে 'কাফের'। এ বিষয়টি মানাকে 'কুফ্‌র' বলে। যেমনইভাবে নামায ছেড়ে দেওয়া, যাকাত ছেড়ে দেওয়া, রোযা ছেড়ে দেওয়া এবং হজ ছেড়ে দেওয়ার নাম 'ফিস্‌ক' এবং যে ছেড়ে দেয়, তাকে 'ফাসেক' বলে– তবে শর্ত হচ্ছে যে, সে এগুলো ফরয হওয়ার কথা মানে; শুধু আমল করে না; তেমনইভাবে এই সালাত, যাকাত, সাওম ও হজকে স্বীকার ও মান্য করার পর এগুলোর প্রসিদ্ধ ও সনদসুদৃঢ় অর্থ বর্জন করে শরীয়ত অসমর্থিত ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করলে

এবং এসমন সব ব্যাখ্যা পেশ করলে, যেগুলো শুধু কুরআন-হাদীস বিরুদ্ধ নয়; বরং চৌদ্দশত বছরের এই দীর্ঘ সময়ে কোনও আলেমে দীন করেননি, তা হলে এর নাম কুরআনের পরিভাষায়, ইসলামের যবানে 'ইলহাদ'। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম 'মুলহিদ'। কুরআন করীম এসব লফয– কুফর, নিফাক, ইলহাদ, ইরতিদাদ ইত্যাদিকে মানুষের বিশেষ বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস, কথা, কাজ ও স্বভাবের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও দল-উপদলের জন্য ব্যবহার করেছে। যতদিন ভূপৃষ্ঠে কুরআন করীম আছে, ততদিন এসব লফযের অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্রও অবশিষ্ট থাকবে।

এখন উম্মতের উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হচ্ছে তারা উম্মতকে বাতলে দিবেন, এগুলোর ব্যবহার কোথায় কোথায়, অর্থাৎ কোন কোন লোকের ব্যাপারে সঠিক এবং কোথায় কোথায় ভুল। তার মানে বাতলে দিতে হবে যে, যেমনইভাবে কোন ব্যক্তি বা দল ঈমানের নির্দিষ্ট তাকাযা পুরা করার পর মানুষ মুমিন হয় এবং তাকে মুসলমান বলা হয়; তেমনইভাবে উক্ত তাকাযা যে ব্যক্তি বা দল পুরো না করবে, সে কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ। উম্মতের উলামায়ে কেরামের জন্য এটাও ফরয যে, তারা ঈমানের দাবিসমূহ এবং কুফরের কারণসমূহ, কুফরী আকীদা-বিশ্বাস, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সীমারেখা নির্ণয় ও নির্দিষ্ট করে দিবেন, যাতে কোন মুমিনকে কাফের তথা ইসলাম থেকে খারিজ বলা না হয় এবং কোন কাফেরকে মুমিন ও মুসলমান বলাও না হয়। কেননা, যদি ঈমান ও কুফরের সীমানা নির্ণয় ও নির্দিষ্ট না হয়, ঈমান আর কুফরের ব্যবধান মিটে যাবে এবং দীন ইসলাম শিশুর হাতের খেলনায় পরিণত হবে; আর জান্নাত ও জাহান্নাম হবে উপাখ্যান।

আলেমদের যত সমস্যাই আসুক, যত অপবাদই দেওয়া হোক, দুনিয়া যত দিন আছে, তত দিন তাদের এই দায়িত্ব আছে এবং থাকবে যে, ডর-ভয়, আর ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে লোক কাফের, তার উপর কুফরের হুকুম ও ফতোয়া দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা, ইলম ও গবেষণা কাজে লাগাতে হবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে যে মুলহিদ ও ফাসেক, তার উপরই 'ইলহাদ' ও 'ফিস্‌কে'র হুকুম ও ফতোয়া দিতে হবে। যে কোন লোক বা দল কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের আলোকে ইসলাম থেকে খারিজ হলে, তার উপর ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার এবং দীন থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়ার হুকুম ও ফতোয়া লাগাতে হবে এবং সূর্য

পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া তথা কিয়ামত পর্যন্ত কোন মূল্যেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে না।

যা হোক, 'কাফের', 'ফাসেক', 'মুলহিদ', 'মুরতাদ' ইত্যাদি শরীয়তের হুকুম ও বিশেষণ এবং এগুলো ব্যক্তি বা দলের আকীদা-বিশ্বাস এবং কথা ও কাজের উপর নির্ভরশীল; তাদের ব্যক্তিসত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে 'গালিগালাজ' যাদেরকে দেওয়া হয়, তা দেওয়া হয় ব্যক্তিসত্তার উপর। সুতরাং যদি এই শব্দগুলো সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এগুলো শরীয়তের হুকুম-আহকাম। এগুলোকে 'সাব্ব ও শাতম' [গালি-গালাজ] এবং এগুলোর প্রয়োগকে অপবাদ আরোপ বলে মন্তব্য করা মূর্খতা বা ধর্মহীনতা।

উলামায়ে হক যখন কোন ব্যক্তি বা দলকে কাফের সাব্যস্ত করেন, তখন আলেমরা তাকে কাফের বানান, এমন নয়; বরং সেই লোক বা দল নিজেই স্বেচ্ছায় কুফরী আকীদা-বিশ্বাস অথবা মন্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে কাফের হয়ে যায়। আলেমরা শুধু তার কুফরকে প্রকাশ করে দেন। খাঁটি সোনাকে তাঁরা খাদযুক্ত করেন না; তাঁরা শুধু খাদযুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করে দেন। খাদযুক্ত তারা নিজেরাই হয়ে থাকে। এই বাস্তবতার পরও এমন মন্তব্য করা যে, কাফের বানানো ছাড়া মৌলভীদের আর কাজ আছে কী? এমন কথা বলা লজ্জাকর মূর্খতা।

আশা করি, এই জরুরী তাম্বীহের পর পাঠক-পাঠিকা মুলহিদ ও বেদীনদের ধোঁকাবাযী সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত ও হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন এবং যখনই কোন ব্যক্তি বা দলকে এমন প্রপাগান্ডায় লিপ্ত পাবেন, তখনই বুঝে নিবেন যে, এ শুধু শরীয়তের হুকুম এবং তার উপর আরোপিত করুণ পরিণতি ও ইলহাদ-যান্দাকার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উলামা ও মুফতীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রচার করে দ্বিগুণ অপরাধের শিকার হচ্ছে। নাউযু বিল্লাহ।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ وَالتَّوفِيقِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ صَفْوَةِ الْبَرِيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (আফাল্লাহু আন্হু)

মাসনূন খুতবা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْحَقَّ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ مَكَانَةِ الْقَبُول مَكَانًا فَوقَ السَّمَاء يَتَبَسَّمُ عَنْ بَلَجِ جَبِيْنٍ وَعَنْ ثَلْجِ يَقِيْنٍ وَيَبْهَرُ نُورُهُ وَضِيَاءُهُ وَيَصْدَعُ صِيْتُهُ وَمَضَاءُهُ وَيَفْتُ عَنْ سَنَا وَسَنَاء، وَجَعَلَهُ يَدْمَغُ البَاطِلَ، فَكَيفَمَا تَقَلَّبَ وَصَارَ أُمُّهُ إِلَى الْهَاوِيَةِ يَتَقَهْقَرُ حَتَّى يَذْهَبَ جَفَاءً وَيَصِيْرَ هَبَاءً. وَحَيْثُ سَطَعَ الْحَقُّ وَاسْتَقَامَ كَعَمُودِ الصُّبْحِ لَوَّى البَاطِلُ ذَنَبَهُ كَذَنَبِ السِّرحَانِ وَتَلَوَّنَ تَلَوُّنَ الْحَرْبَاءِ وَمَنْ تَوَلاَّهُ تَبَوَّأَ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ وَحَقَّتْ عَلَيهِ كَلِمَةُ العَذَابِ وَأَدْرَكَهُ دَرَكُ الشَّقَاءِ وَسُوءُ الْقَضَاءِ وَكَمْ مِن شَقِيٍّ أَحَطَتْ خَطِيْئَتُهُ (أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذٰلِكَ) وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى الْعَافِيَةِ وَالْمُعَافَاتِ الدَّائِمَةِ مِنَ البَلاَءِ.

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِيْ انْقَطَعَتْ بَعْدَهُ الرِّسَالَةُ وَالنُّبُوَّةُ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ وَقَدْ كَانَ بَقِيَ مِنْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ مَوضِعُ لَبِنَةٍ فَكَانَهَا وَقَدْ كَمُلَ البِنَاءُ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ إِلَى يَومِ الْجَزَاء.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি হক এমন বুলন্দ ও উঁচু করেছেন যে, তা সবসময় বিজয়ী থাকে; কখনও বিজিত হয় না। এমন কি তা কবুলিয়ত ও পছন্দের এত উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত হয়, যা আসমানসমূহেরও ঊর্ধ্বে। তা সবসময় উজ্জ্বল ললাট আর একীন ও স্বস্তির (সঞ্জীবনী) শীতলতার সাথে মিটমিটিয়ে হাসতে থাকে এবং তার রোশনী ও নূরের শিখা (কুল-কায়েনাতের উপর) ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রভা ও কিরণ (শক-সন্দেহের) পর্দাসমূহ ছিন্ন করে এবং তা বিকাশ ও প্রকাশের বুলন্দ মাকামে হাসতে থাকে। বাতিলকে

বিনাশ ও চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা হককে এমনই শক্তি দিয়েছেন যে, বাতিল যে কোন পাশ পরিবর্তন করুক, যে কোন রূপ ধরে উপস্থিত হোক, হক তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে বাতিল (প্রবহমান পানির) বিলিয়মান ফেনা আর (তীব্র ঝটিকার) ধুলো-বালির মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেখানেই হক আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সুবহে সাদিকের স্তম্ভের মত সুদৃঢ় হয়েছে, সেখানেই বাতিল গিরগিটির মত রং পরিবর্তন করে এবং শিয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর যে ব্যক্তিই সেই বাতিলের সহায়তা করেছে, সে-ই তার ঠিকানা বানিয়েছে জাহান্নাম এবং স্থায়ী আযাবের চিরন্তন সিদ্ধান্ত তার ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য, অশুভ পরিণতি আর খারাপ ফলাফলের গর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। কে জানে দুনিয়াতে এমন হতভাগা লোক কত আছে, অপরাধ যাদের আঁচল এমনভাবে আকড়ে ধরেছে যে, তারা একেবারে জাহান্নামের তলায় গিয়ে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। এই মুক্তি ও সুরক্ষা এবং (ইহ-পারলৌকিক বালা-মুসিবত থেকে) হেফাযতের কারণে আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শুকর।

আল্লাহ তাআলা নবী ও রসূল, নবীয়ে রহমত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সকাল-সন্ধ্যা (বে-শুমার) সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি আখেরী নবী ও আখেরী রসূল। নবুয়ত ও রেসালত তাঁর উপর খতম হয়ে গেছে। তাঁর তিরোধানের পর সুসংবাদ দানকারী (সত্য) স্বপ্ন বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। নবুয়ত প্রাসাদের নির্মাণ ও পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আখেরী ইটের জায়গা বাকি ছিল, সেই ইটটি ছিল শেষ নবী খাতিমুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্তা। সুতরাং (তাঁর আগমনের পর) নবুয়তের প্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। (এখন আর কেউ নবী হতে পারবে না; রসূলও হতে পারবে না।)

তাঁর বংশ, সন্তান-সন্ততি, সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এখলাসের সাথে তাঁর অনুসরণকারীদের উপরও সালাত ও সালাম।

মুকাদ্দিমা

গ্রন্থ রচনার কারণ

এই পুস্তকটি একটি ফতোয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শুধু জাগ্রত হৃদয় ও শ্রবণশীল কানের জন্য নসীহত, তাম্বীহ ও উপদেশের উপকরণ সরবরাহ করা।

নামকরণ

আমি এই পুস্তকের নাম রাখলাম– إِكْفَارُ الْمُلْحِدِيْنَ وَالْمُتَأَوِّلِيْنَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ الدِّيْنِ. (দীনের জরুরী বিষয়ে অপব্যাখ্যাকারী ও মুলহিদদেরকে কাফের সাব্যস্তকরণ)

উৎস

এই পুস্তকের নাম ও আহকাম– উভয়ই কুরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গৃহীত–

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

> নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহের মধ্যে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সেই ব্যক্তি কি উত্তম, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, না কি সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে? করতে থাকো তোমাদের মন যা চায়। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন।[২]

অর্থাৎ[৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, যদিও এই মুলহিদরা (মাখলুকের কাছ থেকে) তাদের কুফর লুকানো এবং গোপন করার উদ্দেশ্যে তার উপর অপব্যাখ্যার পর্দা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি তাদের ধোঁকাবাযী সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। তারা আমার কাছ থেকে লুকাতে পারে না।

---

[২]. হা-মীম সাজদা : ৪০

[৩]. মূল গ্রন্থের টীকায় উল্লেখকৃত অনেক কথা টেক্সটের অনুবাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।–অনুবাদক

সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু يُلْحِدُونَ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

يَضَعُونَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

তারা আল্লাহর কালামকে অস্থানে ব্যবহার করে। (অর্থাৎ কুরআন করীমের আয়াত বিকৃত করে এবং তার অপব্যাখ্যা করে।)

কাযী আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ নিজ গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এ মুলহিদ ও যিন্দীকের বিধান বয়ান করেছেন–

وَكَذَلِكَ الزَّنَادِقَةُ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ وَقَدْ كَانُوا يَظْهَرُوْنَ الإِسْلَامَ.

> এমনই (মতবিরোধ) সেইসব যিন্দীকদের ব্যাপারেও, যারা মুলহিদ হয়ে যায়; অথচ আগে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। (তাদেরকেও তওবা করাতে হবে। তওবা না করলে তাদেরকে হত্যা করে দিতে হবে। অথবা তওবা করতেও বলা হবে না; বরং ইলহাদের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে হত্যা করে দিতে হবে।[৪])

দীনের জরুরী বিষয়াদি

আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে যেমন প্রসিদ্ধ আছে যে, 'দীনের জরুরী বিষয়াদি' বলতে দীনের সেইসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদিকে বোঝানো হয়, যেগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তাওয়াতুর ও ব্যাপক শুহরতের স্তরে উন্নীত। এমন কি সাধারণ মানুষও সেগুলোকে রসূলের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে জানে এবং মানে।[৫] যেমন, তাওহীদ, নবুয়ত, খাতিমুল

---

[৪]. আল-খারাজ (কাযী আবু ইউসুফ): ১৭৯ মূল কিতাবের টিকায় স্থিত এবারতের তরজমা উপরে (বন্ধনীর ভিতরে) যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

[৫]. গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, 'ব্যাপক শুহরতের মাপকাঠি হচ্ছে জনসাধারণের প্রত্যেক শ্রেণির কাছে ইলম পৌছে যাওয়া; প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছানো জরুরী নয়। এমনইভাবে জনসাধারণের সেই শ্রেণিরও জানা জরুরী নয়, যারা দীন ও দীনী বিষয়াদির সাথে কোন যোগসূত্রই রাখে না; বরং সেই শ্রেণির কাছে এই জরুরী বিষয়ের ইলম পৌছে যাওয়া আবশ্যক, যেই শ্রেণি দীনের সাথে সম্পর্ক রাখে। চাই তারা

আম্বিয়ার উপর নবুয়তের সমাপ্তি, নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আমলের শাস্তি ও পুরস্কার, নামায ও যাকাতের ফরয হওয়া; শরাব ও সুদ ইত্যাদি হারাম হওয়ার প্রসঙ্গ।

মৃতের মুখে খতমে নবুয়তের সাক্ষ্য

বিশেষত 'খতমে নবুয়ত' তো এমন একটি নিশ্চিত বিষয়, যার ব্যাপারে শুধু কিতাবুল্লাহ নয়; বরং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব সাক্ষী। আমাদের নবী আলাইহিস সালামের সনদসুদৃঢ় [মুতাওয়াতির] হাদীসসমূহও এ ব্যাপারে সাক্ষী। এ বিষয়ে সাক্ষ্য শুধু জীবিত লোকজন দিয়েছে, এমন নয়; বরং মৃত লোকজনও এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন, যায়েদ ইবনে হারেসার ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি মৃত্যুর পর অলৌকিকভাবে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল; উম্মী নবী এবং খাতিমুল আম্বিয়া; তাঁর পরে আর কেউ নবী হতে পারবে না। পূর্বের গ্রন্থাবলিতে এমনই আছে।' এরপর তিনি বলেছিলেন, একথা সত্য, সত্য।[৬]

এই ঘটনা 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যাহ'-সহ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে এভাবেই বর্ণিত আছে।

'জরুরিয়াতে দীনে'র নামকরণ

এমনসব আকীদা ও আমলকে জরুরী বলা হয়ে থাকে, সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে যেগুলোকে নিশ্চিত ও একীনীভাবে দীন বলে জানে ও বোঝে যে, উদাহরণত অমুক বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন। (অর্থাৎ পরিভাষায় নিশ্চিত ও অনস্বীকার্য কোন বিষয় বোঝানোর জন্য 'জরুরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ এই অর্থটি প্রায় স্বাভাবিক অর্থের কাছাকাছি।)

সুতরাং এমন বিষয়গুলো দীন হওয়া নিশ্চিত ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। এর মানে একথা নয় যে, এগুলোর উপর আমল করা জরুরী ও ফরয। বাহ্যত যেমনটা সন্দেহ হয়। কেননা, দীনের

আলেমসমাজ হোন, বা না হোন।' গ্রন্থকারের এই পরিমার্জন নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ।—অনুবাদক

৬. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ (যারকানীর ব্যাখ্যাসহ): ৫/১৮৪

জরুরী বিষয়াদির মধ্যে অনেক কিছু শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব মুবাহও রয়েছে। (স্পষ্ট কথা যে, সেগুলোর উপর আমল করা ফরয হতে পারে না; কিন্তু) সেগুলো মুস্তাহাব বা মুবাহ হওয়ার উপর ঈমান আনয়ন করা নিঃসন্দেহে ফরয ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। গোঁয়ার্তুমি করে সেগুলো অস্বীকার করা কুফর অবধারক।[৭] (যেমন, মেসওয়াক করা তো মুস্তাহাব; কিন্তু বিষয়টি মুস্তাহাব হওয়ার কথা বিশ্বাস করা ফরয। যে ব্যক্তি মেসওয়াক মুস্তাহাব হওয়ার কথা অস্বীকার করে, সে কাফের।)

'জরুরিয়াতে দীন' বলতে যা বোঝায়

কাজেই 'জরুরিয়াতে দীন' হচ্ছে আকায়েদ ও আমলের সেই সমষ্টির নাম, যেগুলো দীন হওয়া নিশ্চিত এবং রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলো অনুমোদিত হওয়া স্বীকৃত।

বিতর্কিত বিষয়ের বিশেষ পদ্ধতি অস্বীকার

তবে আমলের বিচারে, অথবা হুকুমের ধরণ বা পন্থার বিচারে কাতয়ী ও একীনী হওয়ার উপর ভিত্তি নয়। কেননা, হতে পারে যে, একটি হাদীস তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছে থাকবে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত থাকবে; কিন্তু সেই হাদীসে যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে, সেটা যুক্তির নিরিখে চিন্তা-ফিকিরের বিষয় এবং তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন, কবরের আযাবের হাদীস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হওয়ার বিচারে এই হাদীসটি তাওয়াতুর ও ব্যাপক শুহরতের স্তরে পৌছেছে। (এজন্য এর উপর ঈমান আনা ফরয এবং এর অস্বীকারকারী কাফের।) কিন্তু কবরের আযাবের ধরন নির্ণয় করা মুশকিল। (অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে এর কোন সুরত নির্দিষ্ট করা, যা অস্বীকারকারীকে কাফের বলে দেওয়া হবে– তা অসম্ভব। একথা বলা যেতে পারে যে, কবরের আযাব একীনী এবং এর উপর ঈমান আনা ফরয; কিন্তু তার প্রকৃতি ও পদ্ধতির ব্যাপারটি আল্লাহই ভালো জানেন।)

---

[৭]. জাওহারুত তাওহীদ

ঈমান

ঈমান একটি অন্তরসম্পর্কিত কাজ। ইমাম বুখারী যেমন (সহীহ বুখারীর ১/৭ পৃষ্ঠায় وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ বাক্যে) ইশারা করেছেন। আর দীনের প্রতিটি হুকুম কবুল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা, শক্ত প্রতিজ্ঞা করা ঈমানের জন্য আবশ্যক। (অন্য কথায়, কোন বিষয়ের একীনী ইলম আর মারেফতই ঈমান নয়; বরং অন্তর দিয়ে সেটা বরণ করে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করার মজবুত এরাদা করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।)

মুমিন হওয়ার জন্য শরীয়তের সমস্ত হুকুম পালনের প্রতিজ্ঞা জরুরী

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারী নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করে বয়ান করেছেন যে, শরীয়তকে আবশ্যকরূপে গ্রহণ করা ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী। তিনি বলেন–

> নাজরানবাসীর ঘটনা থেকে শরীয়তের যেসব হুকুম নির্গত হয়, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি এ-ও যে, কোন কাফের কর্তৃক শুধু নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়া, তার মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক সাব্যস্ত না করবে, (ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান সাব্যস্ত হবে না।)[৮]

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'যাদুল মাআদ' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখে নেওয়ার অনুরোধ থাকল।

ঈমানের হাকীকত

সুতরাং ঈমানের হাকীকত হচ্ছে নিম্নের এই বিষয়গুলো–

১. সেইসব আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম, অন্তর থেকে সত্য মনে করা এবং মান্য করা, যেগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

---

[৮]. ফাতহুল বারী (দারু নাশরিকুতুব, লাহোর): ৮/৯৫

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের সমস্ত হুকুম-আহকাম নিজের যিম্মায় গ্রহণ করা।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম বাদে অন্যসব দীন-ধর্ম থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা।

যান্নী বিষয়েও ঈমান আনা আবশ্যক

মুতাকাল্লিম আলেমসমাজ যে আহ্‌কামকে আবশ্যককরণ ও সত্যায়নকে 'জরুরিয়াত' তথা কাতয়ী ও একীনী বিষয়াদি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, মুতাকাল্লিম আলেমদের শাস্ত্র (ইলমে কালাম)-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে একীনী বিষয়াদি। (তাঁরা গাইরে একীনী তথা যান্নী [ظنی] বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেন না।) কিন্তু তাই বলে একথার মতলব এই নয় যে, মুতাকাল্লিম আলেমসমাজের দৃষ্টিতে 'গাইরে একীনী' তথা যান্নী বিষয়াদি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় (এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনায়ন জরুরী নয়)। হাঁ, তাঁরা কাউকে কাফের শুধু 'জরুরিয়াত' (একীনী বিষয়াদি) অস্বীকার করার উপরই সাব্যস্ত থাকেন।

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিরোধের রহস্য

এখন উলামায়ে কেরাম যে বলে থাকেন, 'ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের সমষ্টি এবং নেক কাজ করলে বৃদ্ধি, আর বদ কাজ করলে হ্রাস পায়।' একথা বলে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন পরিপূর্ণ মুমিন ও একজন গুনাহগার মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা একান্তই জরুরী। (আর এই পার্থক্য শুধু এভাবেই করা যেতে পারে যে, আমলকেও ঈমানের মধ্যে গণ্য করতে হবে। এজন্য ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজের সমষ্টি।) আর যেসব আলেম বলে থাকেন যে, ঈমান কমবেশি হয় না; তাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের কাজ এবং বাসীত। এতে কোন প্রকারের বিভাজন হতে পারে না এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন নিয়ে আগমন করেছেন, তার পুরোটার উপর ঈমান আনা জরুরী। এজন্যই তাঁরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারটি গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছেন। (প্রথম দল ঈমান অন্তরের বিষয় হওয়ার কথা অস্বীকার করেন না; আবার দ্বিতীয় দলও কামেল মুমিন আর গুনাহগার মুসলমানের মাঝে ঈমানের বিচারে পার্থক্যের কথা অস্বীকার করেন না। এভাবেই পুরো দীনের উপর ঈমান আনাও সবার দৃষ্টিতে জরুরী।

পার্থক্য শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। যা হোক, এ-ই ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া না-হওয়া নিয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের বিরোধের মূল কথা।) এরপর যখন পরবর্তী সেইসব আলেমদের যুগ এল, যারা উক্ত মতবিরোধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেক দলের বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, একদিকে নিরেট বিশ্বাসের মধ্যেও হ্রাস-বৃদ্ধি সৃষ্টি করে দেন; অন্যদিকে আমলকে ঈমান থেকে এমনভাবে বের করে দেন যে, মুর্জিয়া ফেরকার আকীদা-বিশ্বাসের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং এই বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির ফলে প্রকৃত ঈমানই মতবিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

বিস্তারিত জানতে মীযানুল এ'তেদাল: (৬/১৩৬ পৃ.) আবদুল আযীয ইবনে আবু রাওয়াদের জীবনবৃত্তান্ত, তাহযীবুত তাহযীব: (৮/৪১০ পৃ.) আউন ইবনে আবদুল্লাহর জীবনবৃত্তান্ত এবং ঈসার হক (৪১০ পৃ.) দেখা যেতে পারে।

যা-ই হোক না কেন, ঈমান হচ্ছে কলবের আমল এবং দীনের প্রতিটি হুকুমের উপর আমল করার জন্য পণ-প্রতিজ্ঞা করা ঈমানের জন্য আবশ্যক। এই পণ-প্রতিজ্ঞাও দীনের সমস্ত আহকাম পরিবেষ্টক এক অবিভাজ্য সত্য; এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি বা বিভাজনের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করে, সে কাফের এবং সে ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহর কিতাবের কোন কোন হুকুম অস্বীকার করে। স্পষ্ট কথা যে, এমন লোকজন উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে নিশ্চিত কাফের। যদিও এরা[৯] ঈমান, দীনদারী আর ইসলামী খেদমতের ঢোল পিটতে পিটতে পূর্ব-পশ্চিম একাকার করুক এবং এশিয়া-ইউরোপ কাঁপিয়ে তুলুক। কবির ভাষায়–

كُلٌّ يَدَّعِيْ حُبَّ لَيْلَى   وَلَيْلَى لاَ تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَا

প্রত্যেক ব্যক্তিই লাইলীকে ভালোবাসার কথা দাবি করে; কিন্তু লাইলী যেকারও ভালোবাসার কথা স্বীকার করে না।

---

[৯]. এখানে উদ্দেশ্য কাদিয়ানী সম্প্রদায়। এমনইভাবে ইসলামের দাবিদার ধর্মদ্রোহীরাও এদের অন্তর্ভুক্ত। –অনুবাদক

এটাই হচ্ছে সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব, যা নিয়ে খেলাফতযুগের সূচনাতে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। পরে আবু বকর সিদ্দীক প্রত্যেক ওই ব্যক্তির সাথে লড়াই করার ঘোষণা দেন, যারা নামায আর যাকাতের মাঝে পার্থক্য করতে চায়। (অর্থাৎ নামাযের হুকুম মানে; কিন্তু যাকাতের হুকুম মানে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যে ব্যক্তি পুরো দীন মানতে প্রস্তুত নয়, সে মুমিন নয় (বরং কাফের ও মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত; অর্থাৎ ওয়াজিবুল কতল।)

দুই খলীফা ও সাহাবীদের ঐকমত্য

সর্বশেষে আল্লাহ তাআলা হযরত উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উপলব্ধি দান করেন এবং এই হাকীকত তাঁর বোধগম্য হয়ে যায়। তিনি আবু বকর সিদ্দীকের সাথে একমত হয়ে যান।

পুরো দীনের উপর ঈমান আনা জরুরী হওয়ার প্রমাণ

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস উল্লেখ করেছেন–

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ -এর সাক্ষ্য না দিবে এবং আমি যেই দীন নিয়ে এসেছি, তার উপর ঈমান না আনবে। যখন তারা এটা গ্রহণ করবে, তখন তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে; তবে ইসলামী হকসমূহের কথা ভিন্ন। অবশ্য তাদের অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাওয়ালায় (অর্থাৎ তারা দিল থেকে ঈমান এনেছে, না কি কোন ভয় অথবা লোভে, সেটা আল্লাহ দেখবেন)।[১০]

২. সহীহ মুসলিমের আবু হুরায়রা বর্ণিত আরেক হাদীসের ভাষ্য এরকম–

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মতের যে কোন ব্যক্তি– চাই সে ইহুদী হোক, অথবা নাসারা– আমার প্রেরিত হওয়ার খবর পেয়ে আমার নবুয়ত ও আমি যে

---

[১০]. সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ১৩৩

দীন নিয়ে এসেছি, তার উপর ঈমান না এনে যদি মারা যায়, তা হলে সে জাহান্নামী।[১১]

৩. মুস্তাদ্‌রাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য এই–

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের যে কোন ব্যক্তি– চাই সে ইহুদী হোক, অথবা নাসারা– আমার আগমনের খবর শুনেও যদি আমার উপর ঈমান না আনে, তা হলে সে জাহান্নামে যাবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি রসূলুল্লাহর এই বক্তব্য শুনে মনে মনে বলতে লাগলাম, কুরআন করীমের কোন্ আয়াত এই বক্তব্য সমর্থন করে? অবশেষে নিচের এই আয়াতটি মাথায় এল–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

বিভিন্ন জাতি-ধর্মের যে কোন ব্যক্তি এই (দীন) অস্বীকার করবে, তার ওয়াদাকৃত স্থান (ঠিকানা) হচ্ছে জাহান্নাম।[১২]

(এই আয়াতে উল্লিখিত 'আহযাব' শব্দের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম, মাযহাব, জাতি, গোষ্ঠী এসে পড়েছে এবং রসূলুল্লাহর বক্তব্য যথার্থ সাব্যস্ত হয়েছে।)[১৩]

আরও জানার জন্য 'দায়েরাতুল মাআরিফ'-এর 'মুর্জিয়া' সংশ্লিষ্ট আলোচনা অধ্যয়ন করুন।

তাওয়াতুর ও তার প্রকারভেদ[১৪]

১. তাওয়াতুরে সনদ

কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) প্রত্যেক যুগে এই পরিমাণ লোক বিদ্যমান থাকা, যাদের কোন সময়ও কোন ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে পরস্পর একমত হওয়া অসম্ভব। যেমন, হাদীস–

---

[১১]. প্রাগুক্ত: হাদীস নং- ৪০৩

[১২]. সুরা হুদ: ১৭

[১৩]. মুস্তাদরাক হাকেম: হাদীস নং- ৩৩০৯

[১৪]. জরুরিয়াতে দীনের আলোচনা করতে গিয়ে 'তাওয়াতুরে'র প্রসঙ্গ এসেছে। এজন্য লেখক সেই আলোচনা শুরু করেছেন।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী (১/২০৩ পৃষ্ঠা)-তে বয়ান করেছেন যে, এই হাদীস ত্রিশ জনের অধিক[১৫] সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সনদে অসংখ্য রাবী রেওয়ায়েত করেছেন।

খতমে নবুয়তের হাদীস মুতাওয়াতির

আমাদের সাথিসঙ্গীর মধ্য থেকে মৌলভী (মুফতী) মুহাম্মাদ শফী সাহেব দেওবন্দী (একটি পুস্তিকায়) খতমে নবুয়তের হাদীসগুলো একত্র করেছেন। সেগুলোর সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গেছে। সেগুলোর মধ্য থেকে প্রায় তেইশটি রেওয়ায়েত সিহাহ সিত্তা [হাদীসের বিশুদ্ধ ছয় কিতাব]-এ বর্ণিত হয়েছে; আর বাকিগুলো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে।

২. তাওয়াতুরে তব্‌কা

কোন যুগের লোকজন পূর্ববর্তী যুগের লোকজন থেকে কোন রেওয়ায়েত, আকীদা বা আমল অব্যাহতভাবে শুনতে এবং বর্ণনা করে আসতে থাকলে তাকে 'তাওয়াতুরে তব্‌কা' বলে। যেমন, কুরআন করীমের তাওয়াতুর। মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় প্রত্যেক যুগ ও যামানার মুসলমান লোকজন পূর্ববর্তী যুগ ও যামানার লোকজন থেকে হুবহু কুরআনকে বর্ণনা করে, পড়ে ও পড়িয়ে এবং হিফ্‌জ ও তেলাওয়াত করে আসছে। তুমি যুগের উপর যুগ ধরে এগিয়ে যাও, এক সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কোন সনদেরও জরুরত নেই; কোন রাবীর নাম উচ্চারণ করারও প্রয়োজন হবে না।

তা ছাড়া প্রত্যেক যুগের লোকজন কর্তৃক পূর্ববর্তী যুগের লোকজন থেকে বর্ণনা করা এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত কুরআনই যে এটি, সে কথা নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে সব মুসলমানই শরীক– চাই তারা কুরআন পড়তে পারুক, অথবা না পারুক। (কেননা, এই একীন ছাড়া কোন ব্যক্তি তো মুসলমানই গণ্য হতে পারে না।)

---

১৫ হাফেয ইবনে হাজার এখানে একশ' অধিক সাহাবী থেকে এবং ইমাম নববীর বরাত দিয়ে দুইশ' সাহাবী থেকে এই হাদীস বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

তাওয়াতুরে আমল বা তাওয়ারুস

প্রত্যেক যুগের লোকজন দীনের যেসব বিষয়ে আমল করে আসছে এবং সেগুলো সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, এসব বিষয় আর হুকুম-আহকাম মুতাওয়াতির। (যেমন, উযু, মেসওয়াক, কুলি, নাকে পানি দেওয়া, জামাআতের সাথে নামায আদায় করা, ইত্যাদি।)

ফায়দা–১ কিছু কিছু হুকুম-আহকামের মধ্যে তিন প্রকারের তাওয়াতুর সমবেত হয়। যেমন, উযুর মধ্যে মেসওয়াক করা, কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া– এগুলো এমন আহকাম, যেগুলোর মধ্যে তিন প্রকারের তাওয়াতুরই একত্র হয়েছে।

ফায়দা–২ কিছু কিছু মানুষ (তাওয়াতুরের তিন প্রকারকে সম্মুখে না রাখার কারণে) মনে করেন যে, 'মুতাওয়াতির' হাদীস ও হুকুমের সংখ্যা খুবই কম। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমাদের শরীয়তে মুতাওয়াতিরের পরিমাণ এত বেশি যে, মানুষ এগুলো গণনা করে তালিকা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ।

ফায়দা–৩ অনেক হুকুম ও মাসআলা এমন রয়েছে যে, আমরা সেগুলোর তাওয়াতুর সম্পর্কে গাফেল ও বেখবর; কিন্তু যখন যাচাই করি, তখন সেগুলো কোন না কোন উপায়ে মুতাওয়াতির প্রমাণিত হয়। বিষয়টি ঠিক এমনই যে, অনেক সময় মানুষ যৌক্তিক (نظری) মাসাইল উপলব্ধি ও সংরক্ষণ করার জন্য এমন মনোযোগ দেয় যে, স্বতঃস্ফূর্ত (بدیہی) বিষয়াদি তার দৃষ্টি থেকে একেবারে আড়ালে চলে যায়। (তারপর খেয়াল করলে বুঝতে পারে যে, ওহ! এটা তো একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়।)

মুতাওয়াতির সুন্নত অস্বীকার করলে কাফের

জরুরিয়াতে দীন ও মুতাওয়াতির বিষয়াদির এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর আমরা বলতে পারি– যেমন,

১. নামায পড়া ফরয এবং একে ফরয বলে বিশ্বাস করাও ফরয। নামায শিক্ষা করা ফরয এবং নামায অস্বীকার করা, অর্থাৎ নামায অমান্য করা বা নামায সম্পর্কে মুর্খ থাকা কুফর।

২. মেসওয়াক করা সুন্নত; কিন্তু একে সুন্নত বলে বিশ্বাস করা ফরয এবং এর সুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করা কুফর। তবে মেসওয়াকের আমল

করা এবং মেসওয়াকের ইলম হাসিল করা সুন্নত। এর ইলম থেকে অনবগত থাকা সওয়াব থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ এবং এর উপর আমল না করা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) ভর্ৎসনা অথবা (সুন্নত তরকের) আযাব ভোগের কারণ। (দেখা গেল, একটি সুন্নতের সুন্নত হওয়ার কথা অস্বীকার করলেও মানুষ কাফের হয়ে যায়।)

জরুরী বিষয়ের তাবীল করাও কুফর

সামনের পরিচ্ছেদগুলোতে বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করব যে, নির্ভরযোগ্য আলেমগণ একথার উপর ঐক্যবদ্ধ যে, জরুরিয়াতে দীন থেকে কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করাও কুফর, যদ্বারা উক্ত বিষয়ের তাওয়াতুর দিয়ে প্রমাণিত রূপরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ সেই রূপরেখা প্রত্যেক যামানার বিশেষ-নির্বিশেষ সমস্ত মুসলমান বুঝে আসছে এবং সে অনুযায়ী উম্মত আমল করে চলছে।[১৬]

হানাফীদের মতে যে কোন কাতয়ী বিষয় অস্বীকার করা কুফর

হানাফী আলেমগণ এর সাথে আরও যোগ করে বলেন যে, যেকোন কাতয়ী ও একীনী শরয়ী হুকুম বা আকীদা অস্বীকার করা কুফর। এমন কি তা যদি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না-ও হয়। কাজেই শায়েখ ইবনে হুমাম 'মুসায়ারাহ' (নতুন.সংস্কর, মিশর)-এর ২০৮ পৃষ্ঠায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। দলীল-প্রমাণে হানাফী আলেমদের এই অভিমত অত্যন্ত সুদৃঢ়।

সারকথা হচ্ছে, প্রত্যেক কাতয়ী ও একীনী শরয়ী বিষয়, যা এতটা স্পষ্ট যে, তার ব্যক্তকারী শব্দমালা ও সেগুলোর অর্থ উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন– সব শ্রেণির মানুষ খুব সহজে জানতে ও বুঝতে পারে এবং তার উদ্দেশ্য এতটাই স্পষ্ট যে, তা নির্ণয় করার জন্য দলীল-প্রমাণ টানাটানি করতে হয় না, এমন শরয়ী বিষয় যখন শরীয়ত আনায়নকারীর পক্ষ থেকে তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রমাণিত

---

১৬. এই যামানায় কিছু নাস্তিক যেমন বলে থাকে, 'সালাত' শব্দটি দৌড়ের পাল্লায় দ্বিতীয় নম্বরে আগত ঘোড়ার অর্থে 'মুসল্লী' শব্দ থেকে গঠিত। এজন্য তারা 'সালাত'কে এক প্রকার দৈহিক ব্যয়াম বলে আখ্যায়িত করে এবং 'একামতে সালাতে'র তারা অর্থ করে শরীরচর্চা করা। একইভাবে তারা রিবা (সুদ)-কে বাণিজ্যিক মুনাফা বলে জায়েয বলে থাকে। এগুলো সব নিছক কুফর।

হয়, তখন কোন তাবীল-তসরুফ না করে সেটার বাহ্য সুরতের উপর হুবহু ঈমান আনায়ন করা ফরয এবং অস্বীকার করা বা কোন তাবীল করা কুফর।

খতমে নবুয়ত অস্বীকার বা এর কোন তাবীল কুফর

যেমন, খতমে নবুয়তের আকীদা। এই আকীদা জানতে বুঝতে কারও কোন কষ্ট বা অসুবিধা নেই। এজন্য প্রত্যেক যামানায় ভূপৃষ্ঠের সমস্ত মুসলমান নীচের হাদীসের ভাষ্য থেকে এই আকীদা-বিশ্বাসটি খুব ভালো করে বুঝে এসেছেন।

إنَّ الرِّسالَةَ والنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فلا رَسُولَ بَعْدِي ولا نَبِيَّ.

> নিশ্চয়ই রেসালত ও নবুয়তের সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং আমার পরে কেউ রসূলও হবে না, নবীও হবে না।[১৭]

অথবা নীচে বর্ণিত হাদীসের বাক্যটি সাধারণ ও অসাধারণ সবাইকে বিষয়টি বোঝানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে–

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ.

> নবুয়ত তো খতম হয়ে গেছে; তবে এখনও সুসংবাদ বহনকারী স্বপ্নমালা রয়ে গেছে।[১৮]

এই দুই হাদীসের ভাষ্য ও অর্থের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি খতমে নবুয়ত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। (আর প্রত্যেক আলেম ও সাধারণ মানুষ কোন প্রকার দ্বিধা, সংকোচ ও খটকা ছাড়াই এই হাদীসগুলোর ভাষ্য থেকে জানতে বুঝতে পারে যে, নবুয়ত ও রেসালতের যেই ধারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়েছিল, সেটা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এসে খতম হয়ে গেছে। এখন কেউ না নবী হতে পারবে, না রসূল।

মিম্বারের উপর খতমে নবুয়তের ঘোষণা

এই আকীদা শুহরত ও তাওয়াতুরের এমন স্তরে পৌছেছে যে, স্বয়ং সাহেবে নবুয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে আরোহন করে একশ' পঞ্চাশ;

---

[১৭]. তিরমিযী: হাদীস নং-২২৭২
[১৮]. তিরমিযী: হাদীস নং-

বরং তার চেয়েও অধিক বার অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিভিন্ন স্থান ও মজমায় বিষয়টির এলান ও তাবলীগ করেন। এ ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে, এমন সামান্য ইঙ্গিতও কখনও করেননি। নবুয়তের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেক উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তি যুগপরম্পরায় এই আকীদা শুনে বুঝে ও মেনে আসছে। এমন কি প্রত্যেক যামানায় সমস্ত মুসলমানের এই আকীদা বিদ্যমান রয়েছে যে, খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কেউ নবী হবে না। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের আগে এই উম্মতেরই একজন 'ন্যায়পরায়ণ শাসক' হিসেবে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তখন মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। সে সময় হযরত মাহদী আলাইহির রিয্ওয়ান মুসলমানদের সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবেন এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম খ্রিস্টানদের সংশোধন করবেন। ইহুদীদেরকে তলোয়ার দিয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। এই দুই বুযুর্গের বরকত ও প্রচেষ্টার ফলে আরও একবার সমস্ত বনী আদম শুধু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পূজারী ও অনুগত হয়ে যাবে।

কিয়ামতের আগে ঈসার আগমন মুতাওয়াতির বিষয়

সুতরাং হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীর ৬/৪৯৩, ৪৯৪ পৃষ্ঠায়, আত-তালখীসুল হাবীরে'র তালাক অধ্যায়ে এবং হাফেয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ১/৫৮২ (সুরা নিসা), ৪/১৩২ (সুরা যুখরুফ)-এ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের ব্যাপারে ইজমা ও তাওয়াতুরের কথা উল্লেখ করেছেন।

পাঞ্জাবের এক ধর্মদ্রোহীর নবুয়ত ও যিশুত্বের দাবি

কিন্তু তেরোশ' বছর পরে পাঞ্জাব থেকে এক ধর্মদ্রোহীর আবির্ভাব হয়। অতীতের অন্যান্য যিন্দীকদের মত সে এসব বিশুদ্ধ বাণীর নতুন নতুন বিকৃতি ও তাবীল করে। সে বলে, আল্লাহ তাআলা 'ইবনে মারইয়াম' আমারই নাম রেখেছেন এবং আমিই সেই 'ঈসা ইবনে মারইয়াম' কিয়ামতের আগে আসমান যার অবতরণ করার কথা বিভিন্ন হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর যেসব ইহুদীকে ইবনে মারইয়াম মেরে ফেলবেন, তাদের কথা বলে বোঝানো হয়েছে বর্তমান যুগের ওইসব ইসলামী আলেমকে যারা আমার

নবুয়তের উপর ঈমান আনবে না। কেননা, তারা ইহুদীদের মত যাহের পূজারী এবং রূহানিয়াত থেকে মাহরূম।

ধর্মদ্রোহীর হাকীকত

অথচ ধর্মদ্রোহী এতটুকুও জানে না যে, আগের যুগের সেইসব যিন্দীক ও মুলহিদ– যাদের নাম-নিশানাও অস্তিত্বের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেছে– তারা এই রূহানিয়াতের ক্ষেত্রে (যদি এই ধর্মহীনতাই রূহানিয়াত হয়ে থাকে।) এই মুলহিদ থেকে অনেক উর্ধ্বের এবং অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিল।

সুতরাং এই বে-দীনের রূহানী বাপ ও পীর-মুরশিদ 'বাব', তারপর 'বাহা' ও কুর্রাতুল আইন (অর্থাৎ বাব ও বাহায়ী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লিডার), যাদের হালাক হওয়ার পর বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, এগুলো (ইতিহাসের পাতায়) আমাদের সামনে রয়েছে। এসব লোকেরাও এমনই দাবি করেছিল, এই যিন্দীক যাদের বুলি আওড়াচ্ছে। তাদের হতভাগা অনুসারী ও অনুগতদের সংখ্যা এই বে-দীনের অনুসারীদের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। এই বে-দীন তো সেইসব মানমর্যাদাও লাভ করতে পারেনি, যেগুলো তারা লাভ করেছিল। রক্তক্ষয়ী ও প্রাণঘাতী যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের অবিচলতা, সাফল্য, রাইফেলের গুলির সাথে বুক ফুলিয়ে তাদের এগিয়ে আসা এবং বুকে গুলি লাগার পরও হালাক না হওয়া, আবার এই সম্পর্কে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা (যে, আমরা ধ্বংস হব না), তারপর সেই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হওয়া (এবং তাদের জীবিত বেঁচে যাওয়া)– এসব এমন বিস্ময়কর ও আজব কর্মকাণ্ড, যেগুলো হয়তো এই কাপুরুষের চিন্তায়ও কখনও উদিত হয়নি।

এই যিন্দীক সেই যাদুমাখা মিষ্টি ভাষা আর বিস্ময়কর কাব্যপ্রতিভা কবে লাভ করেছিল, প্রখ্যাত নারী 'কুর্রাতুল আইন' যার অধিকারী ছিল? এক আরব কবি বিষয়টি নীচের পঙ্ক্তিতে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন–

لَهَا بِشْرٌ مِثْلُ الْحَرِيْرِ وَمَنْطِقٌ   رَخِيمُ الْحَوَاشِي لَا هِرَاءٌ وَلَا نَزَرٌ

তার দেহ রেশমের কোমল, তার ভাষা ও বয়ান অত্যন্ত মিষ্টি ও মর্মস্পর্শী এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

এই যিন্দীকের মোট পুঁজিই হচ্ছে সুফীদের কাছ থেকে শোনা 'তাজাল্লী' আর 'বারওয়ায'-এর মত কয়েকটি শব্দ ও পরিভাষা এবং এ পর্যন্তই। সেগুলোর প্রকৃত রূপও এই জালেমের বিকৃতি হেরফের করে দিয়েছে। এভাবে বুঝুন

যে, শেরওয়ানী চুরি করে কেটে ছেঁটে জামা বানিয়েছে। তারপর পাশ্চাত্যের গবেষণা যোগ করে সেগুলোর নাম দিয়েছে আপন শয়তানের পক্ষ থেকে পাঠানো ওহী।

মির্যার ধর্মদ্রোহিতার মূল বাণী ও স্থপতি

তারপর এগুলোও তার কৃতিত্ব নয়; বরং হাকীম মুহাম্মাদ হাসান আমরূহী ('গায়াতুল বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন'র রচয়িতা)-এর মত ধর্মদ্রোহী, বে-দীন ও যিন্দীকেরা এই বোকার জন্য নবুয়তের ভূমি সমতল করেছে। কিন্তু তারা এর চেয়ে অধিক বুঝমান ছিল। কেননা, তারা নিজেরা নবুয়তের দাবি করেনি।

এ হল এই যিন্দীকের প্রকৃত অবস্থা, যার উপর ভিত্তি করে আমরা (এই গ্রন্থ লিখেছি এবং) তাকে কাফের সাব্যস্ত করেছি এবং চেলাপেলাসহ তাকে আমরা জাহান্নামে পাঠিয়েছি।

আরবের প্রখ্যাত কবি মুতানাব্বীর নীচের পঙক্তিটি মুতানাব্বী (নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার)-এর নিজের বেলায়ই খুব খাপ খেয়েছে–

وَلَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ بِأَصْنَامِهِم   وَأَمَّا بِزُقِّ رِيَــاحٍ فَلَا

সোনা-রূপার দেবদেবীর কারণে অনেকের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা শুনেছি; তবে বায়ুপূর্ণ ভিস্তি [মশক]-র কারণে কেউ পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

আরেক কবি আরও সুন্দর বলেছেন এবং প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

وَكَانَ امْرَأً مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى   بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِهِ

প্রথম দিকে সে শয়তানের সেনাবাহিনীর একজন সাধারণ সিপাহী ছিল; কিন্তু উন্নতি করতে করতে সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এখন শয়তান তার বাহিনীর একজন সাধারণ সিপাহী।

ইমাম মালেকের উপর অভিযোগ

এসব কথা তো একদিকে! আমার কাছে মির্যার এক তরফাদার ও মুরীদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যও এসে পৌঁছেছে যে, ইমাম মালেকও ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর প্রবক্তা। আমি অবহিত করতে চাই যে, ইমাম মালেকের

দিকে এই বক্তব্যের সম্পৃক্তি সম্পূর্ণ মূর্খতা ও অপবাদ। সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা উবাই তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইমাম মালেকও 'আতাবিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে [কিয়ামতের আগে] ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা স্পষ্ট করেছেন, উম্মাহর সমস্ত মানুষ যে ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।

সারকথা

মোটকথা, ওইসব জরুরিয়াতে দীন ও মুতাওয়াতির শরয়ী বিষয়াদি, যেগুলোর উদ্দেশ্য ও অর্থ এতটা স্পষ্ট যে, কোন চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন নেই– যেমন, খতমে নবুয়ত বা ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ প্রসঙ্গ– এসব বিষয় অস্বীকার করা বা এসব ক্ষেত্রে কোন তাবীল করা নিশ্চিত কুফর।

যে বিষয় অস্বীকার করলে মানুষ কাফের হয় না, তার বিবরণ

হাঁ, এমন কিছু জরুরী বিষয় আর আকীদাও আছে, যেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে নিজে বোঝা বা অন্যকে বোঝানো সাধারণ মস্তিষ্কের কাজ নয়– যেমন, তাকদীর প্রসঙ্গ, কবর-আযাবের প্রকৃতি ও পন্থা, আল্লাহ্ তাআলা আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়, শেষ রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণের হাকীকত ও রূপরেখা এবং এ জাতীয় সাদৃশ্যপূর্ণ [মুতাশাবিহ] বিষয়াদি, এমন কি রব্বে করীমের জাত ও সিফাত ইত্যাদিও– এসব জরুরী বিষয় যদি তাওয়াতুর ও শুহরতের পর্যায়ে পৌঁছে, তা হলে যে ব্যক্তি এগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর একেবারে অস্বীকার করে বসবে (যে, এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই) তা হলে নির্দ্বিধায় আমরা তাকে কাফের বলব। আর যদি একেবারে অস্বীকার না করে; বরং এগুলোর প্রকৃতি ও রূপরেখা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারও পা ফসকে যায় এবং নিজের মতের উপর ভিত্তি করে কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দাবি করে যে, এটাই হক; অথচ হকপন্থীদের মতে সেটা বাতিল, (যেমন, কবর আযাবের ক্ষেত্রে কেউ কেউ দাবি করে যে, আযাব শুধু আত্মিকভাবে হয়, অথবা ইস্তেওয়ায়ে আরশের ব্যাপারে বলে থাকে যে, আল্লাহ্ আরশের উপর বসে আছেন।) তা হলে এমন গুমরাহ মুসলমানকে আমরা অপরাগ মনে করব এবং তার গুমরাহীকে মূর্খতার ফলাফল সাব্যস্ত করব। তবে এ কারণে আমরা তাকে কাফের সাব্যস্ত করব না।

উপরের বিস্তারিত বিশ্লেষণ যাচাইয়ের জন্য ইবনে রুশদ আল-হাফীদের পুস্তিকা 'ফাস্‌লুল মাকাল ওয়াল কাশ্‌ফ আন মানাহিজিল আদিল্লাহ' দেখা

যেতে পারে। লেখক মান্তেকী পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন যে, এমন মুসলমানরা অবশ্যই গুমরাহ ও জাহেল; তবে কাফের নয়।

মির্যার মত নবুয়তের ক্ষুদে দাবিদারের পরিণাম

মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা নীচের আয়াতটিতে মির্যা গোলাম আহমাদের মত বে-দীন ও নবুয়তের দাবিদারদের ভয়ানক ও লজ্জাস্কর হাশরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, (১) যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে (বলে, তিনি আমাকে নবী বানিয়েছেন)। (২) অথবা দাবি করে যে, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে (এবং আমি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী)। অথচ তার কাছে কোন কিছুই প্রেরণ করা হয়নি। (৩) আর যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ যেমন কালাম নাযিল করেছেন, আমিও তা করতে পারি। তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখ, যখন এসব জালেম মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে এবং (মৃত্যুর) ফেরেশতারা তাদের দিকে হাত প্রসারিত করে বলতে থাকবে, বের করে দাও তোমাদের প্রাণ, আজ তোমাদেরকে আল্লাহর উপর ভিত্তিহীন অপবাদারোপ এবং তাঁর নিদর্শনাবলির উপর ঈমান আনায়ন থেকে অহঙ্কার (অস্বীকার) করার অপরাধে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।[১৯]

উল্লেখ্য যে, মির্যা গোলাম আহমাদ তার রচনাবলির বিভিন্ন জায়গায় এ সমস্ত দাবি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় পেশ করেছেন বিধায় তারও এই পরিণতিই হবে।

---

[১৯]. সুরা আনআম: ৯৩

মির্যা গোলাম আহমাদের পর মির্যাদের মধ্যে ফাঁটল ও লাহোরী কাদিয়ানীতে বিভক্তি

ওই বে-দীনের জাহান্নামে চলে যাওয়ার পর তার অনুসারীদের মধ্যে ফাঁটল দেখা দেয়। প্রত্যেক গ্রুপ নিজ বাঁশী ও রাগ বাজাতে শুরু করে। সুতরাং এক গ্রুপ (লাহোরী মির্যায়ী) তো একেবারে তার উম্মত থেকে আলাদা হয়ে যায়। গ্রুপটি দাবি করে যে, মির্যা গোলাম আহমাদ নবী ছিলেন না; কখনও তিনি নবুয়তের দাবি করেননি এবং রসূলুল্লাহর পর কোন নবী হতেও পারে না। তিনি বরং আখেরী যামানার মাহদী ছিলেন এবং (আল্লাহ মাফ করুন) মুহাম্মাদী মাসীহ ছিলেন। (অর্থাৎ তিনি ছিলেন সেই ঈসা, উম্মতে মুহাম্মাদীতে যার আগমন করার কথা ছিল।)

ধোঁকা

এটা শুধুই একটি ধোঁকা ও ফেরেব। এর উদ্দেশ্য শুধু মুসলমানদের শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মুসলমানদেরকে মির্যা গোলাম আহমাদ ও লাহোরী দলের ঘনিষ্ঠ করে নিজেদেরকে ও মির্যাকে মুসলমান প্রমাণ করা এবং সুপ্ত বড়শী দিয়ে সাদাসিধা মুসলমানদেরকে শিকার করা। কিন্তু মুসলমান (এই ধোঁকায় পড়তে পারে না। তাদের) সর্বসম্মত ফয়সালা ও ফতোয়া হল, যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমাদকে নির্দ্বিধায় কাফের না মানবে, সেও কাফের। এর কারণগুলো নিম্নরূপ–

মির্যা গোলাম আহমাদ কাফের সাব্যস্ত হওয়ার কারণসমূহ

প্রথম কারণ : নবুয়তের দাবি

এই মুলহিদ তার রচনা ও গ্রন্থাবলির বিভিন্ন জায়গায় শুধু নবী নয়; বরং রসূল এবং শরীয়তপ্রবর্তক রসূল হওয়ার দাবি এমন জোরগলায় পেশ করেছেন যে, আজ মহাশূন্যে তার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এজন্য নবুয়তের দাবি অস্বীকার করা শুধু জবরদস্তিমূলক ও লজ্জাস্কর সিনাচুরি, যার কোন মূল্য নেই। সুতরাং যে তাকে কাফের বলবে না, সে নিজেই কাফের।

আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যে ব্যক্তি মোসায়লামা কায্যাবকে কাফের বলবে না এবং তার স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নবুয়তের দাবি এবং কুরআনের মোকাবেলায় পেশকৃত তার ছন্দমালাকে ব্যাখ্যা করবে, তাকে আপনি কী বলবেন?

একইভাবে আপনি যদি কোন মূর্তিপূজারীকে মূর্তিপূজা করতে দেখে বলেন যে, এ তো মূর্তিকে সেজদা করে না; বরং মূর্তি দেখেই সম্মুখপানে পড়ে যায়। এজন্য সে কাফের নয়। তা হলে এ কি হেঁয়ালী আর সিনাচুরি নয়? যখন আমরা নিজের চোখে বার বার তাকে মূর্তির সামনে নতশিরে সেজদা করতে দেখি, তা হলে তাকে কাফের না বলি কীভাবে? কীভাবে শুনতে পারি তার মূর্তিপূজার স্বপক্ষে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ? এমনটা কখনই হতে পারে না। এমন ভিত্তিহীন অপব্যাখ্যা কখনই ভ্রূক্ষেপ করার মত নয়।

মুলহিদদের কথা ও কর্মের ব্যাখ্যায় সহায়কদের মিথ্যাচার

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় যিন্দীকদের কথা ও কাজের ব্যাখ্যাতাদেরকে যিন্দীকদের চাটুকার মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। তা ছাড়া এমন ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা আর নির্লজ্জ তৎপরতার কারণে তাকফীরের হুকুম পরিবর্তন হয় না। ইমাম নববী বলেন–

> তৃতীয় কথা হল যিন্দীক যদি প্রথম বার (তার বেদীনী থেকে) তওবা করে, তা হলে তার তওবা গ্রহণযোগ্য। আর যদি বার বার তওবা করে ভেঙে ফেলে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।[২০]

মূল কথা হচ্ছে এমন বেদীনের কথা ও কাজের ব্যাখ্যা প্রদান, আসলে ব্যাখ্যা নয়; বরং তার পক্ষে মিথ্যা বলে যাওয়া। ফলে তাকফীরের হুকুমের ক্ষেত্রে কোন তফাত হবে না।

দ্বিতীয় কারণ : ঈসা আ.-এর পুনরাগমন অস্বীকার

ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের বিষয়টি তাওয়াতুরের স্তরে উন্নীত। এমন কি এই উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা বা বিকৃতিসাধন স্পষ্ট কুফর। উলামায়ে মুতাআখ্খিরীনের অন্যতম, আল্লামা আলূসী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর তাফসীরগ্রন্থ 'রূহুল মাআনী'তে লিখেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামের পুনঃঅবতরণকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করা। আর অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমসমাজ ঐক্যবদ্ধ।

---

[২০]. নববীর শরাহ সম্বলিত সহীহ মুসলিম: ১/৩৯

গ্রন্থকার কুরআনের আয়াত– وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ -এর অধীনে নবুয়তের এই মিথ্যা দাবিদার বে-দীন ও তার অনুসারীদের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমি সে আলোচনা দেখেছি ও অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ ওকে জাহান্নামে দিন। কেমন কট্টর কাফের সে। এই আয়াতের তাবীল নয়; বরং বিকৃতিসাধনের জন্য কেমন অপতৎপরতা যে সে চালিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারপরও তার স্বার্থসিদ্ধি ঘটেনি। এজন্য এসব লোককে কাফের সাব্যস্ত করা ফরযে আইন।

তৃতীয় কারণ : ঈসা আলাইহিস সালামের অপমান

মির্যার অনুসারীরা, বিশেষত লাহোরীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত বিশিষ্ট রসূলের মর্যাদা মির্যার মত ফাসেক, ফাজের, বদকার ও কুলাঙ্গারকে দিয়েছে। কাজটি ঈসা আলাইহিস সালামের মারাত্মক অপমান। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীর مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذْ سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ শিরোনামের অধীনে খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন–

> যদি আমরা বলি যে, খাযির নবী নন; বরং ওলী, আর বর্ণনা ও যুক্তির আলোকে নিশ্চিতরূপে একথা স্বীকৃত যে, নবী ওলীর চেয়ে সর্বাবস্থায় উত্তম এবং যে এর বিপরীত বলবে (কোন ওলীকে নবীর চেয়ে উত্তম জানবে), সে নিশ্চিত কাফের। কেননা, তার এই বক্তব্য শরীয়তের একটি একীনী বিষয়ের অস্বীকৃতির নামান্তর।[২১]

(কাজেই মির্যা গোলাম আহমাদের মত ব্যক্তিকে ঈসা সাব্যস্তকারীরা নিশ্চিত কাফের।)

মির্যায়ীদের হুকুম

যারা এসব মির্যায়ীদের ব্যাপারে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে চায়, তারা শুধু এতটুকু করতে পারেন যে, তারা মির্যায়ীদেরকে তওবা করাবেন। যদি তারা মির্যায়ী ধর্ম থেকে তওবা করে, তা হলে ভালোই; অন্যথায় তারা নিশ্চিত

---

[২১]. ফাতহুল বারী (দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, লাহোর): ১/৩০১

কাফের। ইসলামী শরীয়তে তাদের জন্য এর চেয়ে বেশি বিবেচনার প্রকৃতপক্ষেই আর কোন সুযোগ নেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আগামী আলোচনাগুলোতে আমরা বিষয়টি ইজমার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছি।

তারপর এই তওবা করানোও যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়; বরং শুধু ইসলামী হুকুমতের হাকিমই তাদের ইসলাম ও কুফরের নিশ্চিত ফয়সালা করার সময় তাদেরকে তওবা করাতে পারেন। তার কারণ, শুধু তিনিই তাদের কুফর অথবা ইসলাম সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারেন। কিন্তু যদি ইসলামী হুকুমত অথবা মুসলমান হাকিম না থাকে, তা হলে তাদের জাহান্নামে গিয়ে পতিত হওয়া পর্যন্ত কুফর ছাড়া আর কিছু নেই– চাই তারা কুফরকে চাদর বানিয়ে গায়ে দিক, অথবা বিছানা হিসেবে ব্যবহার করুক।

শরীয়তের দৃষ্টিতে গলদ ব্যাখ্যা

শরীয়ত প্রবক্তা [নবী] আলাইহিস সালাম বাতিল ব্যাখ্যা করার কারণে কখনও কাউকে মাযূর সাব্যস্ত করেননি। এজন্য নবী আলাইহিস সালাম–

০১. সিপাহসালার আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা কর্তৃক তাঁর ফৌজকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যদি তারা (সেনাপতির কথামত) আগুনে ঝাঁপ দিত, তা হলে কিয়ামত পর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে পারত না। তার কারণ, আমীরের আনুগত্য শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী শুধু জায়েয বিষয়ে করতে হয়। (অথচ জেনে বুঝে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া আত্মহত্যা এবং হারাম। যদিও তা আমীরের নির্দেশেই হোক না কেন। বোঝা গেল, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া জায়েয করার জন্য আমীরের আনুগত্যের তাবীল পেশ করা বাতিল।)

০২. এক ব্যক্তির মাথা ফেটে গিয়েছিল। এরপরও লোকজন তাকে নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসল করার ফতোয়া দিয়েছিল। গোসল করার পর লোকটি মারা যায়। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– 'আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। এরা গরীব বেচারাকে মেরে ফেলেছে।'

(লক্ষণীয় বিষয় হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গলদ ফতোয়া প্রদানকারী লোকজনের ফতোয়া ও ব্যাখ্যার কোন প্রকার মূল্যায়ন করেননি। বরং লোকটির মৃত্যুর দায় তাদের কাঁধের উপর চাপিয়েছেন।)

০৩. একইভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআযের উপর অনেক রাগ হয়েছিলেন। শুধু এজন্য যে, তিনি তাঁর কওম নিয়ে নামাযের ইমামতি করার সময় লম্বা লম্বা সুরা পড়তেন। নবীজী মুআযকে বলেছিলেন– أَفَتَّانٌ أَنْتَ، يَا مُعَاذُ؟ 'মুআয! তুমি কি একজন ফেতনাবায?'

(অথচ মুআয তো নবীজীরই অনুসরণ করতেন। সেই সুরাগুলোই তিনি পড়তেন, যেগুলো নবীজী পড়তেন। কিন্তু নবীজী তার তাবীলের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং তাকে ফেতনাবায বলেছেন।)

একইভাবে নামাযে কেরাআত দীর্ঘ করার কারণে একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'বের উপরও নারাজ হয়েছিলেন। (এবং তারও ওযর শোনেননি।)

০৪. একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালেদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি এমন কিছু লোককে হত্যা করেছিলেন, যারা أَسْلَمْنَا أَسْلَمْنَا [মুসলমান হয়েছি।] বলতে না পেরে صَبَأْنَا صَبَأْنَا [পুরনো ধর্ম ত্যাগ করেছি।] বলে নিজেদের ইসলাম প্রকাশের চেষ্টা করেছিল; কিন্তু বিষয়টি খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু না বুঝে তাদেরকে হত্যা করে দিয়েছিলেন। (নবীজী ভুল বোঝাবুঝির কারণে হযরত খালেদকে মাযূর সাব্যস্ত করেননি।)

একবার হযরত উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু জেহাদের সফরে এক রাখালের কালেমা পাঠকে কৌশল মনে করে তাকে হত্যা করে দেন। তিনি মনে করেন যে, রাখাল জান-মাল বাঁচানোর জন্য কালেমা পাঠ করছে। কিন্তু নবী সা. বিবরণ শুনে উসামার উপর খুব নারাজ হন এবং বলেন, هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ 'তুমি তার বুক ফেড়ে দেখলে না কেন?'

(মোটকথা, নবীজী খালেদ আর উসামার বাহ্যিক ওযরের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি।)

০৫. এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় তার সবগুলো গোলাম আযাদ করে দেন। এই গোলামগুলোই ছিল তার মোট সম্পদ। এতে নবীজী তার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে ওয়ারিসদের অধিকার হরণকারী সাব্যস্ত করেন। (তার কোন ওযর কানে তোলেননি।)

এমন অসংখ্য ঘটনা আছে, যেগুলোতে নবীজী অসঙ্গত ব্যাখ্যা এবং অনর্থক ওযরকে কোনক্রমে স্বীকৃতি দেননি।

ব্যাখ্যা কোথায় গ্রহণযোগ্য?

ফকীহদের পরিভাষায় যেহেতু এসব তাবীল এজতেহাদের ক্ষেত্র ছিল না, এজন্য নবীজী এগুলো বিবেচনা করেননি। পক্ষান্তরে এমনসব ক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যাকে ওযর সাব্যস্ত করেছেন এবং সেই অনুমোদন করেছেন, যেগুলো এজতেহাদের ক্ষেত্র। যেমন–

০১. কিছু সাহাবীকে নবীজী হুকুম দেন যে, আসরের নামায বনী কোরায়যায় গিয়ে আদায় করবে। এই হুকুমের উপর নির্ভর করে তারা রাস্তায় নামায না পড়ে কাযা করে দেন। (নবীজী তাদের এই নামায কাযা করার কারণে কিছুই বলেননি।)

০২. একবার দু'জন সাহাবী সফরে ছিলেন। রাস্তায় পানি ছিল না। এজন্য তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেন তারা। এরপর ওয়াক্ত থাকতে থাকতেই তারা পানি পেয়ে ফেলেন। তখন একজন উযু করে নেন এবং নামায পুনরায় পড়েন। অপর জন উযুও করলেন না; নামাযও পুনরায় পড়লেন না। পরবর্তীতে যখন এই ঘটনা নবীজীর খেদমতে পেশ করা হয়, তখন তিনি কাউকেই তিরস্কার করেননি। এর কারণ, এসব বিষয়ে এজতেহাদ করার সুযোগ ছিল।

সারকথা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ এই প্রসঙ্গে মুসলমানদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা ও উত্তম আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শুধু সেইসব বিষয়েই তাবীল ও ওযর বিবেচ্য হওয়া উচিত, যেগুলোর ক্ষেত্রে তাবীলের অবকাশ আছে।

হেদায়েত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। যাকে চান, তিনিই তাকে হেদায়েত দেন। আর খোদা যাকে গোমরাহ করেন, তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই।

যিন্দীক, মুলহিদ ও বাতেনীদের সংজ্ঞা তাদের কুফরের প্রমাণ

কাফেরদের প্রকারভেদ ও নাম

আল্লামা তাফ্‌তাযানী মাকাসিদ নামক গ্রন্থের ২/২৬৮ পৃষ্ঠার ৪ নাম্বার পরিশিষ্টে গুমরাহ ফেরকাহসমূহের প্রকারভেদ, সংজ্ঞা ও নাম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন−

যদি কোন কাফের যবানে ইসলাম প্রকাশ করে, অথচ ভিতরগতভাবে কাফের থাকে, তা হলে সে মুনাফিক। যদি কুফর অবলম্বন করে, তা হলে সে মুরতাদ। আর যদি একাধিক উপাস্যের প্রবক্তা হয়, তা হলে তার নাম মুশরিক। যদি অন্য কোন আসমানী গ্রন্থের অনুসারী হয়, তা হলে তার নাম কিতাবী। কেউ যদি দুনিয়ার বিবর্তণকে যুগের দিকে সম্বন্ধ করে এবং একে অবিনশ্বর মনে করে (অর্থাৎ যামানাকেই দুনিয়ার খালেক ও চিরন্তন মনে করে), তা হলে তার নাম 'দাহরিয়া'। যদি কেউ দুনিয়ার স্রষ্টা থাকার কথা একেবারেই অস্বীকার করে, তা হলে এমন লোককে 'মুআত্তিল' (নাস্তিক) বলা হয়। আর যদি মুসলমান দাবি করার পরও কেউ এমন আকীদা পোষণ করে, যা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর, তা হলে এমন লোককে বলা হয় যিন্দীক। (অন্য কথায়, কাফের সাত প্রকার− মুনাফিক, মুরতাদ, কিতাবী, মুশরিক, দাহরিয়া, মুআত্তিল, যিন্দীক। শেষ কিসিমকে বাতেনী এবং মুলহিদও বলা হয়।)

শরহে মাকাসিদে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে−

একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কাফের হচ্ছে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির নাম যে মুমিন নয়। এখন সে যদি মুখে ইসলামের দাবি করে, তা হলে তার বিশেষ নাম হচ্ছে 'মুনাফিক'। যদি এমন হয় যে, আগে মুসলমান ছিল, পরে কাফের হয়েছে, তা হলে তার বিশেষ নাম হল 'মুরতাদ'। কেননা, সে ইসলাম থেকে ফিরে গেছে। ('ইরতিদাদ' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া।) যদি কেউ একাধিক উপাস্য মানে, তা হলে তার বিশেষ নাম 'মুশরিক'। কেননা, সে খোদার শরীক আছে বলে মানে (অর্থাৎ গাইরুল্লাহকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে)। যদি কোন রহিত আসমানী ধর্ম ও কিতাবের অনুসরণ করে, তা হলে তার বিশেষ নাম 'কিতাবী'। যেমন, ইহুদী ও নাসারা। যদি যামানাকে অবিনশ্বর (চিরন্তন) বলে মানে এবং দুনিয়ার সমস্ত বিবর্তণ আর সৃষ্টিকে সে

দিকেই সম্বন্ধ করে, (কেমন যেন যামানাকেই কায়েনাতের স্রষ্টা বলে মান্য করে) তা হলে এর নাম 'দাহরিয়া'। ('দাহ্র' অর্থ অনন্ত কাল।) কেউ যদি দুনিয়ার স্রষ্টা বলতে কাউকে না মানে, (এবং দুনিয়াকে প্রাকৃতিক বলে আপনা-আপনি সৃষ্ট বলে মনে করে, তা হলে এমন লোকের বিশেষ নাম 'মুআত্তিল'। যদি নবী আলাইহিস সালাম ও ইসলামী নিদর্শনাবলি প্রকাশ করা সত্ত্বেও এমন আকীদা-বিশ্বাস লালন করে, যা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর, তা হলে এমন ব্যক্তির বিশেষ নাম 'যিন্দীক'।

'যিন্দ' মূলত সেই গ্রন্থের নাম, যেটা ইরানের সম্রাট কোব্বাদের যুগে মিয্দাক উপস্থাপন করেছিলেন। তার দাবি ছিল যে, এটি অগ্নিপূজকদের সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা, যা যরাথুস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। অগ্নিপূজকদের বিশ্বাস, যরাথুস্ত্র নবী ছিলেন। উক্ত 'যিন্দ' শব্দের দিকেই 'যিন্দীক' শব্দ সম্বন্ধযুক্ত। (অর্থাৎ زِنْدِيْق শব্দটি زنديك এর আরবী রূপ। অর্থ, মান্যকারী। মুসলমানরা প্রত্যেক ওই বেদীনের জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করে, যে কুফরী আকীদা লালন করে, আবার ইসলামের দাবিও করে। এমন লোককেই আরবীতে 'মুলহিদ' ও 'বাতেনী' বলা হয়। এসব যিন্দীক ও মুলহিদদের একটি বিশেষ ফেরকাকেও 'বাতেনিয়া' বলা হয়।)

'যিন্দীকে'র সংজ্ঞা ও 'বাতেনী'র বিশ্লেষণ

রাদ্দুল মুহ্তার গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'বাতেনী'র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফতোয়ায়ে শামী'র ৩/৪০৯, ৪১০ পৃষ্ঠায় 'আল-মারূফ' শব্দের অধীনে লিখছেন–

যিন্দীক নিজের কুফরের উপর ইসলামের মোড়ক লাগায় এবং ফাসেদ আকীদাসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপন করে প্রচলন দেয় যে, অগভীর দৃষ্টিতে তা বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। 'ইবতানে কুফর' (কুফর গোপন করা)-এর মতলব এটাই। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে গুমরাহী অবলম্বন করে অন্যদেরকে সে দিকে দাওয়াত দেওয়া 'বাতেনী' হওয়ার পরিপন্থী। (অর্থাৎ কারও বাতেনী হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, তাকে কুফরী আকায়েদ ও গুমরাহী অন্যদের থেকে লুকাতে হবে; বরং ইসলামের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে কুফর প্রবেশ করানো এবং

তা গোপন করাই হচ্ছে বাতেনী হওয়ার অর্থ। এজন্য এমন গুমরাহ লোকদেরকে বাতেনী বলা হয়।)

গ্রন্থকার আন্তঃছত্রে বলেন, হাফেয ইবনে হাজার আস্‌কালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্'র ফাতহুল বারী ১২/২৪০ পৃষ্ঠায় 'ইবতানে কুফরে'র ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করা যেতে পারে। ওখানে বোঝা যায় যে, কুফর গোপন করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে কুফর মিলিয়ে দেওয়া।

যিন্দীক ও বাতেনীদের হুকুম

ইমাম নববী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মিনহাজে'র ১২১ পৃষ্ঠায় যিন্দীক ও বাতেনীদের মুরতাদের সমহুকুমে হওয়া এবং তাদের তওবা কবুল না হওয়া প্রসঙ্গে বলেন–

কিছু কিছু আলেমের বক্তব্য হচ্ছে যদি কোন মুসলমান যিন্দীক ও বাতেনীদের মত সুপ্ত কুফরের দিকে ফিরে যায়, তা হলে (সে মুরতাদ এবং) তার তওবা কবুল করা হবে না।

আলেমদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় যে, কোন ব্যক্তির কুফর লুকানোর (এবং তার বাতেনী হওয়ার) অর্থ এই নয় যে, সে নিজের কুফরী আকীদা-বিশ্বাস সমাজের মানুষ থেকে গোপন রাখে; বরং প্রত্যেক ওই ব্যক্তিই বাতেনী, যে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের খেলাফ আকীদা লালন করে এবং নিজে মুসলমান হওয়ার দাবি করে। সব মিলিয়ে এমন ব্যক্তি কাফের এবং তার আকীদা-বিশ্বাস নিরেট কুফর।

মুসনাদে আহমাদ ২/১০৮ ও ফাতহুল বারী ১/১৪১ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, (ভবিষ্যতে) এই উম্মতের মধ্যেও বিকৃতির ঘটনা ঘটবে (অর্থাৎ চেহারা বিগড়ে গিয়ে মানুষ জানোয়ার হয়ে যাবে)। সাবধান! এই বিকৃতি ঘটবে তাকদীর অস্বীকারকারী ও যিন্দীকদের মধ্যে। (অর্থাৎ যিন্দীক ও তাকদীর অস্বীকারকারীদের চেহারা বিগড়ে যাবে। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিন্দীকও তাকদীর অস্বীকারকারীদের মত কাফের। কেননা, কাফেরদের চেহারা বিকৃত হয়।) 'খাসায়েস' রচয়িতা বলেন, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। মুন্তাখাব কান্‌যুল উম্মাল ৬/৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি

মারফূ রেওয়াত এই হাদীসের ভাষ্য আরও স্পষ্ট করে দেয়। রেওয়ায়েতটি এই–

নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি কওম এমনও হবে যে, তারা খোদা ও কুরআন অস্বীকার করবে এবং কাফের হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি তাদের গোচরেও থাকবে না (যে, তারা কাফের হয়ে গেছে)। ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় যেমন কাফের হয়ে গেছে (অথচ তারা বুঝতেও পারেনি)। এরা ওইসব লোক, যারা তাকদীরের একাংশ স্বীকার করবে; আরেকাংশ অস্বীকার করবে। তারা বলবে, (অর্থাৎ বিশ্বাস করবে যে,) কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়; আর অকল্যাণ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। (অর্থাৎ কল্যাণের স্রষ্টা আল্লাহ, আর অকল্যাণের স্রষ্টা হচ্ছে শয়তান। অন্য কথায়, খোদা হচ্ছে দু'জন। একজন কল্যাণের খোদা, আরেক জনের অকল্যাণের খোদা। যেমন, অগ্নিপূজকরা ইয়াযদাঁ ও আহরমান দুই খোদা মেনে থাকে।) তারা তাদের আকীদা প্রমাণ করার জন্য কুরআনের আয়াত পাঠ করবে। (অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাদের আকীদা প্রমাণ করবে।) সুতরাং এরা কুরআনের উপর ঈমান গ্রহণ এবং ইলম ও মারেফত হাসিলের পর শুধু এই আকীদা পোষণের কারণে কাফের হয়ে যাবে। আমার উম্মতকে এদের সাথে কী পরিমাণ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শত্রুতা ও দুশমনীর মুখোমুখি হতে হবে (তা খোদাই ভালো জানেন)। এরাই এই উম্মতের যিন্দীক (অগ্নিপূজক)। এদের যুগে শাসকশ্রেণির জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাবে। এমন জুলুম-অত্যাচার আর অধিকার হরণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর আল্লাহ তাআলা এক মহামারী প্রেরণ করবেন, যা তাদের বেশিরভাগ লোককে ধ্বংস করে দিবে। তারপর ভূমিধ্বস ঘটবে (এবং এরা জমীনের মধ্যে ধ্বসে যাবে)। সম্ভবত তাদের মধ্য থেকে কেউ বেঁচে যাবে (অন্যথায় সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে)।) সে দিন ঈমানদারদের আনন্দ-খুশি বিলুপ্ত এবং দুঃখবেদনা সীমা ছাড়িয়ে যাবে। এরপর বিকৃতি ঘটবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অবশিষ্ট লোকগুলোকে বানর এবং শূকর বানিয়ে দিবেন। এর পরপরই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

তাবারী ও বায়হাকী এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছে। ইমাম বগভীও (সাহাবী) রাফে ইবনে খাদীজ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

যেসব আহ্‌লে কেবলা কাফের নয় তাদের বিবরণ[২২]

আহ্‌লে সুন্নাত আলেমদের বক্তব্য

(যেসব আহ্‌লে কেবলাকে কাফের বলা যায় না, তাদের ব্যাপারে আল্লামা তাফ্‌তাযানী মাকাসিদ নামক কিতাবের ১/২৬৯ পৃষ্ঠায় আহ্‌লে সুন্নাত আলেমদের নিম্নরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছেন–)

সপ্তম অধ্যায় সেইসব আহ্‌লে কেবলার হুকুম প্রসঙ্গে, যারা আহ্‌লে হকের বিরোধী–

১. যেসব আহলে কেবলা (মুসলমানিত্বের দাবিদার) হকের বিরোধী (এবং গুমরাহ), তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জরুরিয়াতে দীন (অর্থাৎ ওইসব কাতয়ী ও একীনী আকায়েদ ও আহকাম) অস্বীকার না করবে (যেগুলো শরীয়তপ্রবর্তক [নবী] আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ)। যেমন, পৃথিবীর নশ্বর (অর্থাৎ শূন্য থেকে অস্তিত্ববান) হওয়ার আকীদা, হাশরে জেসমানী (অর্থাৎ মৃত্যুর পর দৈহিকভাবে পুনরায় জীবিত) হওয়ার আকীদা।

২. কোন কোন আলেম বলেন যে, না; তা নয়; আহ্‌লে হকের সাথে বিরোধকারী (নিঃশর্তভাবে) কাফের। (কেননা, সে হকের বিরোধী।)

---

[২২]. নিশ্চিতভাবে কুফরী আকীদা ও আমলে লিপ্ত থাকার পরও অনেক লোক ও ফেরকাকে সাধারণ মুসলমানরা কাফের বলে না। তারা যেহেতু আল্লাহ্, রসূল ও কুরআনের নাম ব্যবহার করে, এজন্য মুসলমানরা তাদেরকে কাফের এবং ইসলাম থেকে খারেজ বলা থেকে বিরত থাকে। তাদের সাথে মুসলমানের মতই আচরণ করা হয় এবং বলা হয় যে, 'আমরা আহলে কেবলাকে কাফের বলা জায়েয মনে করি না।' বিষয়টি মারাত্মক ভুল ও ধোঁকা। বড় বড় মুসলমানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ এর পন্থায় এটি প্রবচন ও ধোঁকা। একে গুমরাহ ও কাফের লোকজন নিজেদেরকে মুসলমান প্রমাণ করা এবং হক্কানী আলেমদের কাফের ঘোষণা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করে। এজন্য গ্রন্থকার উল্লিখিত শিরোনাম কায়েম করে এই ভুল বোঝাবুঝি বা ধোঁকার পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং মুসলমানদেরকে এই ভুল বোঝাবুঝি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

৩. গ্রন্থকারের মতে যারা আমাদেরকে (আহলে হককে) কাফের বলবে, আমরাও তাদেরকে কাফের বলব। আর যারা আমাদেরকে (আহলে হককে) কাফের বলবে না, আমরাও তাদেরকে কাফের বলব না।

মুতাযেলীদের বক্তব্য

১. পূর্ববর্তী মুতাযেলীরা বলতেন, যারা বান্দাকে নিজের আমল ও ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে অপরাগ, আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে অবিনশ্বর এবং আল্লাহকে বান্দার আমল ও ক্রিয়াকর্মের খালেক মান্য করে (অর্থাৎ মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুতাযেলীদের বিপরীত অবস্থান নেয়), তারা আমাদের দৃষ্টিতে কাফের।

২. সাধারণ মুতাযেলীগণ বলে থাকেন, যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে (তাঁর সত্তা থেকে) পৃথক মনে করে, (আখেরাতে) আল্লাহ তাআলার দীদার, (গুনাহগার মুসলমানের) জাহান্নাম থেকে মুক্তি সমর্থন করে এবং বান্দার সমস্ত দুষ্কর্মকে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা ও এরাদার অধীন এবং আল্লাহ তাআলাকেই সেগুলোর খালেক সাব্যস্ত করে, তারা সবাই কাফের।

আহলে সুন্নাত আলেমদের দলীল

আহলে সুন্নাত আলেমদের দলীল হচ্ছে এই যে, নবী আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরে সাহাবা-তাবেয়ীন (এভাবে) আকায়েদ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন না (যেভাবে মুতাযেলীরা করে)। তাঁরা বরং শুধু হক আকায়েদ সম্পর্কে অবহিত করে দিতেন (এবং তাওহীদ, রেসালত ও মওতপরবর্তী হায়াত ইত্যাদি মৌলিক আকীদা অবলম্বন করাকে ইসলামের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন)।

যদি এখানে আপত্তি তোলা হয় যে, তা হলে সর্বসম্মত আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারেও একইভাবে হক বয়ান করে দেওয়ার উপর ক্ষান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই আপত্তির জওয়াব হচ্ছে এই যে, সর্বসম্মত আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং সেগুলোর দলীল-প্রমাণ সেইসব উষ্ট্রচালক আরবদের উপলব্ধির মাপকাঠি অনুযায়ী (এতটা) প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট ছিল (যে, প্রত্যেক মুসলমান সেগুলো অবগত হয়ে আশ্বস্ত হয়ে যেত এবং সেগুলো তারা নির্দ্বিধায় কবুল করত)। কোন কোন আলেম এই আপত্তির জওয়াবে বলে থাকেন যে, (প্রথম দিকে) আকাইদ বিস্তারিত বয়ান করা হত না। কেননা, (সেই যুগে বিস্তারিত

না জেনে) এজমালী ঈমান গ্রহণই যথেষ্ট ছিল। (কেননা, আরবরা ছিল সাধারণত যৌক্তিক জটিলতামুক্ত সাদা মনের অধিকারী একটি জাতি। তারা চু-চারা না করে নির্দ্বিধায় হক আকাইদ গ্রহণ করে নিত।) বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন তো তখনই দেখা দেয়, যখন দৃষ্টি থাকে চুলচেরা পর্যালোচনা ও বিস্তারিত বিবরণের প্রতি। (অর্থাৎ বাতিল আকীদা-বিশ্বাস আগে থেকে মস্তিষ্কের উপর আপতিত থাকলে, সেগুলো দূর করার জন্য বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ এবং হকের বিপক্ষে উত্থিত শক-সন্দেহ বিতাড়নের প্রয়োজন দেখা দেয়।) অন্যথায় এমন অসংখ্য পরিপক্ক ও মুখলিস মুমিন রয়েছে, যারা অবিনশ্বর ও নশ্বরের অর্থ পর্যন্তও বোঝে না। (অথচ তারা সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুমিন।)

এই আলোচনা তো যথাস্থানে যথার্থ। তবে এক ফেরকা কর্তৃক অপর ফেরকাকে কাফের সাব্যস্ত করার বিষয় এতটা প্রসিদ্ধ যে, তা বয়ান করার প্রয়োজন নেই। (সুতরাং গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে যারা আহলে হককে কাফের বলবে, তারা নিঃসন্দেহে কাফের এবং আমরা তাদেরকে কাফের বলেই ব্যক্ত করব, যদিও তারা হোক আহলে কেবলা।)

সর্বসম্মত আকাইদ অস্বীকারকারী কাফের

'মাকাসিদ' রচনাকার কুফ্র ও ঈমানের আলোচনা প্রসঙ্গে ২/২৬৮-২৭০ পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

(আহলে কেবলা প্রসঙ্গে) উল্লিখিত আলোচনা শুধু ওইসব লোক সম্পর্কে, যারা জরুরিয়াতে দীন– যেমন, (তাওহীদ, নবুয়ত, ওহী, এলহাম,) দুনিয়ার নশ্বরতা ও সশরীরে পুনরুত্থান ইত্যাদি সর্বসম্মত আকাইদের ব্যাপারে আহলে হকের সঙ্গে একমত; তবে এগুলো বাদে অন্যান্য আকাইদ, যৌক্তিক আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতির ক্ষেত্রে আহলে হকের বিরুদ্ধে। যেমন, আল্লাহর গুণাবলি, খাল্কে আমল, ভালো-মন্দ উভয়ের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট হওয়া, আল্লাহর কালামের অবিনশ্বরতা, আল্লাহর দীদারের সম্ভাব্যতা এবং এগুলো ছাড়া ওইসব যৌক্তিক আকাইদ ও মাসাইল, যেগুলোর ক্ষেত্রে হক নিঃসন্দেহে যে কোন একদিকে নিশ্চিত– এমন হক বিরোধীদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, এমন আকাইদের প্রবক্তা হওয়া (বা না হওয়া)-র ভিত্তিতে কোন আহলে কেবলা (মুসলমান)-কে কাফের বলা যাবে কি না? অন্যথায়

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই আহলে কেবলা (মুসলমান হওয়ার দাবিদার), যে সারা জীবন রোযা, নামাযসহ সব ধরনের এবাদত ও আহকামের পাবন্দ করেছে; কিন্তু দুনিয়াকে সে অবিনশ্বর মানে, বা মৃত্যুর পর দৈহিক পুরুত্থান অস্বীকার করে, অথবা আল্লাহ তাআলাকে প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবগত মনে করে না, (সে কেবলার দিকে নামায পড়া সত্ত্বেও) নিঃসন্দেহে কাফের। এমনইভাবে যদি অন্য কোন কুফরী কাজ বা মন্তব্য তার থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও সে কাফের।

لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ কাদের মত?

উপরের বক্তব্যটি (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না) এটা আবুল হাসান আশআরী ও তাঁর বেশিরভাগ অনুসারীর অভিমত। ইমাম শাফেয়ীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও এমনটাই বোঝা যায়। তিনি বলেন–

আমি খাত্তাবিয়া ছাড়া অন্যান্য গুমরাহ ফেরকার সাক্ষ্য রদ করি না। (অর্থাৎ তাদেরকে কাফের মনে করি না।) কেননা, খাত্তাবিয়ারা মিথ্যা বলাকে হালাল মনে করে।

মুন্তাকা নামক কিতাবে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে এমনই বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা কোন আহলে কেবলাকে কাফের বলেননি। বেশিরভাগ হানাফী ফকীহদের অভিমত এমনই। তবে কিছু কিছু হানাফী ফকীহ আহলে হকের বিরোধীদেরকে কাফের বলে থাকেন।

আহলে কেবলা কারা?

মোল্লা আলী কারী রহ. 'শরহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

মনে রাখতে হবে, সেইসব লোকই আহলে কেবলা, যারা জরুরিয়াতে দীন– যেমন, দুনিয়ার নশ্বরতা, দৈহিক হাশর, প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর আল্লাহর ইলমের পরিব্যপ্তি এবং এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী মাসায়েলের ব্যাপারে আহলে হকের সাথে একমত হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি শমস্ত শরয়ী আহকাম ও এবাদতের পাবন্দী করে; তবে দুনিয়াকে অবিনশ্বর মনে করে এবং দৈহিক হাশরকে অস্বীর করে অথবা আল্লাহ তাআলাকে প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপারে অবগত মানে না, সে কখনও আহলে কেবলা নয় (এবং উভয় মতানুসারে সবার মতে কাফের)। তা ছাড়া আহলে সুন্নাত আলেমদের

মতে কোন আহলে কেবলাকে কাফের না বলার মানে হচ্ছে এই যে, কোন আহলে কেবলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কুফরের কোন আলামত– কোন কুফরী মন্তব্য অথবা কোন কুফরী কাজ না পাওয়া যাবে এবং কুফর নিশ্চিতকারী কোন ব্যাপার তাকে দিয়ে সংঘটিত না হবে। (কেমন যেন কোন মুসলমান থেকে যদি কোন কুফরী মন্তব্য বা কাজ সংঘটিত হয়, অথবা তার মধ্যে যদি কুফরের কোন আলামত পাওয়া যায়, তা হলে সে আহলে কেবলা থেকে খারিজ হয়ে যায়। যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে এবং অন্যান্য মুসলমানের মত এবাদত-বন্দেগী ও শরীরে হুকুম চালন করতে থাকে।)

সীমালঙ্ঘনকারী সর্বাবস্থায় কাফের

মোল্লা আবদুল আযীয বুখারী রহ. 'তাহকীকু শারহি উসূলিল হুস্‌সামী' গ্রন্থে ইজমা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ২০৮ পৃষ্ঠায় وَإِنْ غَلَا فِيهِ -এর অধীনে বলেন–

> যদি কোন গুমরাহ ফেরকার লোকজন তাদের বাতিল আকীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়, তা হলে সে ফেরকাকে কাফের সাব্যস্ত করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে আহলে হকের সাথে তাদের সামঞ্জস্য ও বিরোধের ব্যাপারটিও বিবেচ্য নয়। তার কারণ, তারা সেই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্তই নয়, যাদের জান ও মালের নিরাপত্তা রয়েছে। যদিও তারা কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি। কেননা, কেবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেই কেউ মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ঈমান রয়েছে পুরো দীন, একীনী আকায়েদ ও নিশ্চিত বিধি-বিধানের উপর। এর ব্যতিক্রম ব্যক্তি অবশ্যই কাফের; যদিও সে নিজেকে কাফের মনে না করে।

বযদূবীর শরাহ 'কাশ্‌ফে'র ৩/২৩৮ পৃষ্ঠায় ইজমার আলোচনা প্রসঙ্গে এবং আমুদীর কিতাব 'আল-আহকামে'র ১/৩২৬ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ মাসআলার অধীনে হুবহু এই বিশ্লেষণই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা শামী 'রাদ্দুল মুহতার' ১/৩৭৭ (নতুন সংস্করণ ১৪২৬ হি. ৫২৪) পৃষ্ঠায় 'ইমামত' প্রসঙ্গে এবং ১/৬২২ পৃষ্ঠায় 'ইনকারে বিতর' প্রসঙ্গে বলেন–

সেই ব্যক্তির কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই, যে জরুরিয়াতে দীন (ইসলামের একীনী ও অকাট্য আকায়েদ-আহকাম)-এর বিরোধী। চাই সে আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সারা জীবন এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাক। (শায়েখ ইবনে হুমাম) যেমন, 'শরহে তাহরীর'-এ বয়ান করেছেন।

এরপর ১/৫২৫ পৃষ্ঠায় লেখেন–

> (আল-বাহরুর রায়েক রচয়িতা বলেন–) সারকথা হচ্ছে 'কোন আহলে হকের বিরোধিতাকারী ব্যক্তি বা ফেরকাকে কাফের বলা যাবে না' মর্মে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা ওই ব্যক্তি বা ফেরকার ব্যাপারে, যারা ওইসব স্বীকৃত মূলনীতির বিরোধী নয়, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিশ্চিত। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কুফর নিশ্চিতকারী আকায়েদ ও আ'মাল এবং আহলে কেবলাকে কাফের বলার মতলব

'শরহে আকায়েদে নাসাফী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নিবরাস' রচয়িতা ৫৭২ পৃষ্ঠায় লেখেন–

কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ওইসব লোককেই 'আহলে কেবলা' বলা হয়, যারা সমস্ত জরুরিয়াতে দীন অর্থাৎ ওইসব আকায়েদ ও আহকাম মান্য করে, যেগুলো শরীয়তে অকাট্য ও প্রসিদ্ধভাবে প্রমাণিত। সুতরাং যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনের কোন একটি বিষয় অস্বীকার করে– যেমন, দুনিয়াকে নশ্বর মানে না, মৃত্যুর পর দৈহিক পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলাকে প্রতিটি অণু-পরমাণুর আলেম অস্বীকার করে, অথবা নামায-রোযা ফরয হওয়ার কথা অমান্য করে– সে আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও সে সমস্ত শরয়ী আহকাম দৃঢ়তার সাথে পালন করে। এমনইভাবে যার মধ্যে কোন প্রকারে কুফরের আলামত পাওয়া যায়– যেমন, কোন মূর্তিকে প্রণাম করে, অথবা শরীয়তের কোন বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তা নিয়ে মযাক করে, তা হলে সেও কখনও আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলে কেবলাকে কাফের না বলার মানে হচ্ছে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে বা অপ্রসিদ্ধ যৌক্তিক কোন বিষয় অস্বীকার করার কারণে কাফের বলা হবে না। মুহাক্কিকদের তাহকীক এটাই। বিষয়টি ভালো করে মনে রাখা উচিত।

জরুরিয়াতে দীন অস্বীকারকারী কাফের
তাকে কতল করা ওয়াজিব

'জাওহারাতুত তাওহীদ' নামক কিতাবের একটি কবিতা–

وَمَنْ لِمَعْلُومٍ ضَرُورِيٍّ جَحَدْ
مِنْ دِينِنَا يُقْتَلُ كُفْرًا لَيْسَ حَدّ

> যে আমাদের ধর্মের জরুরী কোন বিষয় অস্বীকার করবে, তাকে কুফরের কারণে হত্যা করে দেওয়া হবে; দণ্ড হিসেবে নয়।

(তার কারণ, হাদ্দ [দণ্ড] মুসলমানদের উপর কার্যকর হয়। আর এই ব্যক্তি কাফের। এজন্য অন্য কাফেরদের মত কুফরের ভিত্তিতে হত্যা করে দেওয়া হবে। 'জাওহারাহ'র ব্যাখ্যাতা এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন–

এমন অস্বীকারকারীর কুফর একীনী এবং সর্বসম্মত। তা ছাড়া মাতুরিদীগণ যে কোন অকাট্য বিষয়ের অস্বীকারকারীকে কাফের বলে থাকেন; যদিও তা সর্বসম্মতভাবে জরুরী না হোক।

সাহাবীদের ইজমা অকাট্য দলীল এর অস্বীকার কুফর

সমস্ত হানাফী আলেম একথার উপর একমত যে, যে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে, সেটা অস্বীকার করা কুফর। কেননা, হানাফীগণ সাহাবায়ে কেরামের ইজমাকে কিতাবুল্লাহ সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন। সুতরাং 'ইকামাতুদ দলীল' নামক গ্রন্থের ৩/১৩০ পৃষ্ঠায় হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

> সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অকাট্য হুজ্জত এবং তা মান্য করা ফরয। এটা বরং সবচেয়ে শক্তিশালী হুজ্জত এবং অন্যসব দলিলের উপর অগ্রবর্তী। যদিও বিষয়টি প্রমাণ ও বিশ্লেষণ করার স্থান এটা নয়; তবে বিষয়টি যথাযথ স্থানে শুধু ফকীহদের কাছেই স্বীকৃতই নয়; ওইসব মুসলমানের কাছেও স্বীকৃত, যারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন। শুধু কিছু গুমরাহ ফেরকা এর বিরোধিতা করেছে, যাদের পথভ্রষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাফের বা ফাসেক সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু এ-ই নয়; বরং তারা ওইসব ফাসেদ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে

সাথে এমনসব কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, যেগুলো তাদের ফাসেকী নিশ্চিত করে।

তবে গ্রন্থকারের মতে এই সম্ভাবনাও আছে যে, এসব গুমরাহ ফেরকার মতেও ইজমায়ে সাহাবা হুজ্জত। যেমন, তাফসীরে রূহুল মাআনী ১/১২৭ পৃষ্ঠায় কুরআনের আয়াত إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ এর তাফসীরে এদিকে ইশারা করা হয়েছে।

মুহাক্কিক ইবনে আমীরিল হাজ, যিনি শায়েখ ইবনে হুমাম ও হাফেয ইবনে হাজার– উভয়ের বিশিষ্ট শাগরিদ, 'তাহরীর' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'তাকসীমে খাতা' সংক্রান্ত মাসআলার অধীনে ইজমায়ে সাহাবা অকাট্য হুজ্জত হওয়ার বিষয়টি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বয়ান করেছেন। একইভাবে আল্লামা তাফতাযানী রহ. 'তালবীহ' নামক গ্রন্থে ইজমার হুকুম প্রসঙ্গে এই মাসআলাটি ফুঁটিয়ে তুলেছেন।

কুফরী আকায়েদ ও আমল

শারহুত তাহরীর নামক গ্রন্থের ৩/৩১৮ পৃষ্ঠায় মুহাক্কিক ইবনে আমীরিল হাজে'র এবারত নিম্নরূপ–

সেই বেদআতী (গুমরাহ)-ও আহলে কেবলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যাকে তার বেদআত (গুমরাহী)-এর কারণে কাফের বলা হয় না; তবে কখনও কখনও গুনাহগার আহলে কেবলা বলে ব্যক্ত করা হয়। যেমন, গ্রন্থকার (শায়েখ ইবনে হুমাম) ইতোপূর্বে وَلِلنَّهْيِ عَنْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ-এর আওতায় ইশারা করেছেন। এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে আহলে হকের সাথে একমত। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ার নশ্বরতা ও সশরীরে হাশর হওয়ার পক্ষে এবং অন্য কোন কুফরী কাজ ও মন্তব্যও তার থেকে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ মনে করা, কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রবিষ্ট হওয়া (অর্থাৎ কাউকে খোদার অবতার মান্য করা), মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত অস্বীকার করা অথবা তাঁকে তাচ্ছিল্য করা বা তাঁর নিন্দা করা– এমন কোন কুফরী বিষয় তার থেকে পাওয়া যায় না। তবে এগুলো বাদে এমনসব যৌক্তিক মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সে আহলে হকের বিপক্ষে, যেগুলোর ক্ষেত্রে

সর্বসম্মতভাবে সত্য (হাঁ, বা না) যে কোন এক পক্ষে। যেমন, সিফাতে এলাহী, খালকু আফআলিল ইবাদ, খায়ের ও শর– উভয়ের সাথে এরাদায়ে এলাহীর সম্পৃক্তি, কালামে এলাহীর অবিনশ্বরতা ইত্যাদি। (এসব মাসআলায় মতবিরোধকারীকে কাফের বলা হয় না। মোটকথা, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আহলে হকের সাথে একমত, তবে শাখাগত মাসায়েলে বিরোধকারী, শুধু এমন ব্যক্তিকেই কাফের সাব্যস্ত করা হবে না।) সম্ভবত গ্রন্থকার (শায়েখ ইবনে হুমাম) ইতোপূর্বে উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা এদিকেই ইশারা করেছেন। কেননা, এই বেদআতীও কুরআন, হাদীস বা যুক্তির সাহায্যে নিজের আকীদা-বিশ্বাসের উপর দলীল পেশ করে থাকে। অন্যথায় জরুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে বিরোধকারীকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আহলে হক সমাজে কোন বিরোধ নেই। যেমন, দুনিয়ার নশ্বরতা বা সশরীরে হাশর হওয়া অথবা প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে আল্লাহর অবগত হওয়া ইত্যাদি– এগুলো মৌলিক মাসআলা, এগুলো অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। যদিও সে আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সারা জীবন এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাক। তা ছাড়া সেই ব্যক্তিও বিনাবিরোধে কাফের হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে কুফর আবশ্যককারী মন্তব্য বা কাজে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায়, খাত্তাবিয়া সম্প্রদায় (যাদের আকীদা হচ্ছে মিথ্যা বলা হালাল এবং জায়েয)-কেও কাফের বলা উচিত, যাদের কথা আমরা 'রাবীর শর্তাবলি' প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। সেই বিশ্লেষণ থেকে একথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, কোন গুনাহের কারণে আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করণের নিষিদ্ধতার মূলনীতিও ব্যাপক নয়। তবে এখানে গুনাহ্ বলে সেই গুনাহ উদ্দেশ্য করতে হবে, যা কুফর নয়। তা হলে সেই ব্যক্তি, যাকে কোন কুফর ওয়াজিবকারী গুনাহের কারণে কাফের সাব্যস্ত করা হবে, সে এই মূলনীতি থেকে অবশ্যই খারিজ হবে। (তাকে কাফেরই সাব্যস্ত করা হবে।) যেমন, শায়েখ তাকীউদ্দীন সুবকী সেদিকে ইশারা করেছেন।

এরপর মুহাক্কিক ইবনে আমীরিল হাজ সুবকীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের উক্ত বিশ্লেষণের জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়। কেননা, শায়েখ সুবকী সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যে মুখে কুফরী কথা বলার পর সাথে সাথে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে ফেলে। (এমন ব্যক্তি কাফের নয়।) এমন ব্যক্তিকে তিনি সেই মুসলমানের মত সাব্যস্ত করেন, যে মুরতাদ

হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম কবুল করে। তবে উল্লিখিত মুহাক্কিক তাকেও বিবেচনার ক্ষেত্র সাব্যস্ত করে থাকেন এবং তার মুসলমান হওয়ার জন্যও সেই কুফরী কালিমা থেকে তওবা ও পবিত্রতার ঘোষণা জরুরী সাব্যস্ত করে থাকেন, যা সে যবান থেকে বের করেছে। এই শর্ত সুবকীর বক্তব্যের মধ্যেও নিহিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত মুহাক্কিক ও শায়েখ সুবকীর মাঝে কোন বিরোধ নেই।

দীনের বুনিয়াদী আকীদা ও কাতয়ী হুকুমের বিরোধিতা কুফর

মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ওয়াযীরে ইয়ামানী তাঁর কিতাব 'ঈসারুল হক'র ৪২৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

দ্বিতীয় শাখা হচ্ছে এই যে, সাধারণ বিরোধ মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক বিবাদ-বিদ্বেষের কারণ হওয়া উচিত নয়। সাধারণ বিরোধ বলতে বোঝায় ওই বিরোধকে, যা দীনের ওইসব বুনিয়াদী ও কাতয়ী বিষয় নিয়ে হয় না, যেগুলো সম্পর্কে বিরোধকারী কাফের সাব্যস্ত হওয়ার উপর শরয়ী দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (বরং সাধারণ বিরোধ বলতে শাখাগত ও যৌক্তিক মাসায়েলের ওই বিরোধ বোঝায়, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কাতয়ী ও সর্বসম্মত নয়।)

একই মুহাক্কিক উক্ত কিতাবের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন–

যেমন, ওইসব মুলহিদ ও যিন্দীকদের কুফর, যারা আল্লাহ তাআলার কিতাবের বিভিন্ন আয়াতের এসব বাতেনী ব্যাখ্যা করে কুরআনকে এমন খেলনা বানিয়েছে, যার কোনটির উপর কোন দলীল নেই, কোন আলামত নেই, পূর্ববর্তীদের যুগে এমন ব্যাখ্যার প্রতি কোন ইশারাও নেই। (অর্থাৎ তারা কুরআন মাজীদের মনগড়া তর্জমা ও তাফসীর করে থাকে।)

এই তালিকার মধ্যে ওইসব দল ও লোকজনও অন্তর্ভুক্ত, যারা শরীয়তের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়া এবং কাতয়ী ও একীনী বিষয়াদিকে রদ করার জন্য ওইসব যিন্দীক ও মুলহিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যাদের কথা মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের থেকে শুনে আসছে; বর্ণনা করে আসছে।

এই কথাই মুহাক্কিক উল্লিখিত কিতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

যা হোক, মনে রাখতে হবে, ইজমা দুই প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার হচ্ছে সেই ইজমা, যার শুদ্ধতা দীন থেকে এমন কাতয়ী ও একীনীভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার বিরোধকারী কাফের সাব্যস্ত হবে। এটাই সেই সহীহ্ ও প্রকৃত ইজমা, যা একীনী ও নিশ্চিতভাবে দীন হওয়ার কারণে আলোচনার উর্ধ্বে।

আহলে কেবলার তাকফীরের নিষিদ্ধতার মূলোৎস

মনে রাখতে হবে, আহলে কেবলাকে কাফের বলার নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গের মূলোৎস সুনানে আবু দাউদের ১/২৪৩ পৃষ্ঠা বাবুল জিহাদের একটি হাদীস। সেখানে হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন–

ঈমানের মূল হচ্ছে তিনটি বস্তু– (১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠকারীর (জান-মালের) উপর হস্তক্ষেপ না করা, (২) কোন গুনাহের শিকার হওয়ার কারণে তাকে কাফের না বলা এবং (৩) কোন আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ না করা।'

এই হাদীসে শরীয়তের ওরফ অনুযায়ী 'গুনাহ' বলতে নিঃসন্দেহে সেই গুনাহ উদ্দেশ্য, যা কুফর নয়। এই একই কথা ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে। যেমন, আল-এওয়াকীতে ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত আছে। সুফ্য়ান ইবনে উয়ায়না হুমায়দী থেকে তার মুসনাদের শেষে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া ইমামগণের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যে 'গুনাহে'র শর্তের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমনইভাবে হাদীসে لَا يُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ এসেছে; ঠিক তেমনইভা ইমামগণের একই অভিমত لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ। যেমন, 'আল-এওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির নামক গ্রন্থের ২/১২৩ পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত আছে। তবে কালপরিক্রমায় কিছু বাস্তবপূজারী, কিছু জাহেল এবং কিছু মুলহিদ ওই ইমামদের বক্তব্য থেকে 'গুনাহ' শব্দটি ছেঁটে দিয়েছে। (এখন রয়ে গেছে لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ القِبْلَةِ।) পরবর্তীতে ইমামদের বক্তব্য দেদারসে ব্যবহার করা হচ্ছে (যে, ইমামদের মতে আহলে কেবলাকে কাফের বলা জায়েয নয়)।

আহলে কেবলার তাকফীরের নিষিদ্ধতার সম্পর্ক শাসকশ্রেণির সাথে

আহলে কেবলার তাকফীরের নিষিদ্ধতা মূলত আমীর-ওমারা ও শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ এই কথাটি আসলে শাসকদের বেলায় প্রযোজ্য)। সুতরাং হযরত আনাস রাযি. এর উল্লিখিত রেওয়ায়েত এবং এই জাতীয় অন্যান্য রেওয়ায়েত মূলত আমীর ও শাসকশ্রেণির আনুগত্য এবং যতক্ষণ তারা নামায পড়তে থাকে, ততক্ষণ তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমের (২/১২৫ পৃষ্ঠায়) এসব রেওয়ায়েত এই পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া এসব বর্ণনায়– চাই সহীহ মুসলিমে হোক, অথবা হাদীসের অন্য কোন কিতাবে হোক– নীচের শর্তটি উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সহীহ বুখারীতে আছে–

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

> তবে যদি তোমরা (আমীরদের কথা ও কাজে) এমন খোলাখুলি কুফর দেখতে পাও যে, তা কুফর হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

এই একই উদ্দেশ্য হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নীচের এই হাদীসটির, যা ইমাম বুখারীসহ অন্যরা বর্ণনা করেছেন–

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ.

> যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিল, আমাদেরকেবলার অভিমুখি হল, আমাদের নামাযের মত নামায পড়ল, এবং আমাদের জবাইকৃত পশু (হালাল মনে করে) ভক্ষণ করল, সে মুসলমান। একজন মুসলমান যেসব অধিকার লাভ করে, সেও তাই লাভ করবে এবং একজন মুসলমানের উপর যেসব যিম্মাদারী আরোপিত হয়, তার উপরও সেগুলো আরোপিত হবে। (অর্থাৎ যে শাসক ইসলামের এইসব প্রতীকতুল্য হুকুম-আহকাম মানে এবং পালন করে, সে মুসলমান। তার আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি– إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ প্রমাণ করে যে, বিষয়টি দেখা (এবং প্রমাণ

করা) প্রতক্ষদর্শীদের কাজ। তাদের দেখতে হবে, নিজেদের এবং আল্লাহর মাঝে যে, এটা কি খোলাখুলি কুফর, না কি তা নয়? তবে লিপ্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে ঘায়েল করা তাদের জন্য আবশ্যক নয় যে, সে জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং (নিজের কথা ও কাজের) কোন তাবীল করতে না পারে; বরং তাদের উপর আবশ্যক এতটুকু যে, তারা দেখবে লোকটির কুফরের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ আছে কি না?

স্পষ্ট কুফরের ক্ষেত্রে তাবীল গ্রহণযোগ্য নয়

তাবরানীর বর্ণনায় এই হাদীসে كُفْرًا بَوَاحًا এর বদলে كُفْرًا صُرَاحًا শব্দ এসেছে। (যার অর্থ পরিষ্কার কুফর।) হাফেয ইবনে হাজার যেমন [সহীহ] বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী'র ১৩/০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, পরিষ্কার কুফরের ক্ষেত্রে কোন তাবীল গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন্ তাবীল বাতিল কোন্ তাবীল বাতিল নয়

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইযালাতুল খাফা নামক গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় খলীফার বিপক্ষে বিদ্রোহের বৈধতা এবং জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, তাবীল অকাট্যভাবে বাতিল হওয়ার ভিত্তি হল তাবীলটি কুরআনী আয়াত, মাশহূর হাদীস, ইজমা অথবা কিয়াসে জলী'র খেলাফ হওয়া। (অর্থাৎ প্রত্যেক ওই তাবীল, যা কুরআন, প্রসিদ্ধ হাদীস, ইজমায়ে উম্মত অথবা স্পষ্ট কিয়াসের বিপরীত, নিঃসন্দেহে তা প্রত্যাখ্যাত।)

খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতেও তাকফীর জায়েয

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীতে عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيهِ بُرْهَانٌ এর খেই ধরে বলেন–

أَيْ نَصٌّ أَوْ خَبَرٌ صَحِيحٌ لاَ يَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ.

অর্থাৎ স্পষ্ট দলীল, চাই তা (কুরআনের) কোন আয়াত হোক, অথবা এমন সহীহ হাদীস, যাতে তাবীলের কোন সম্ভাবনা নেই।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সহীহ খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতেও কাফের সাব্যস্ত করা জায়েয। যদিও সেই রেওয়ায়েত মাশহূর বা মুতাওয়াতির না হোক।

আর এমনটাই হওয়া উচিত। কেননা, যখন ফকীহদের গণনাকৃত হেতুগুলোর ভিত্তিতে কাফের সাব্যস্ত করা হয়, তখন কি এমন সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে, যার মধ্যে তাবীলের সম্ভাবনা নেই?

কেবলা না ছাড়লেও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে

এই হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, আহলে কেবলাকে কাফের বলা যেতে পারে, (যখন সে পরিষ্কার কুফরে লিপ্ত থাকবে।) যদিও সে কেবলা পরিত্যাগ না করে। তা ছাড়া একথাও প্রমাণিত হয় যে, অনেক সময় স্বেচ্ছায় কুফর অবলম্বন না করলেও এবং ধর্ম বদলানোর ইচ্ছা না থাকলেও মানুষ কাফের হয়ে যায়। (অর্থাৎ নিজেকে মুসলমান জ্ঞান করা সত্ত্বেও কুফরী মন্তব্য বা কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায়।) যদি তা না হত, তা হলে উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে দলীল-প্রমাণ মজুদ থাকার প্রয়োজন হত না। (বরং ফতোয়ার ভিত্তি হত লিপ্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও এরাদার উপর।) আর এমন তাকফীরের উপযুক্ত লোক আমাদের (মুসলমানদের)-ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সহীহ্ বুখারীর অন্য একটি হাদীস যেমন বিষয়টি স্পষ্ট করে–

> نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا
>
> এসব লোক আমাদেরই ধর্মের, আমাদের ভাষায়ই কথা বলে (নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে এবং কুরআন হাদীসের সাহায্যে যুক্তি পেশ করে), অথচ তারা জাহান্নামের দরজায় দণ্ডায়মান এবং মানুষকে তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (অর্থাৎ তাদের আকীদা-বিশ্বাস স্পষ্ট গুমরাহী এবং জাহান্নামমুখো। যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করবে, তারা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।)[২৩]

হাফেয ইবনে হাজার مِنْ جِلْدَتِنَا -এর যে ব্যাখ্যা কাবেসী থেকে গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নরূপ–

مَعْنَاهُ أَنَّهُم فِي الظَّاهِرِ عَلَى مِلَّتِنَا وَفِي الْبَاطِنِ مُخَالِفُونَ.

---

[২৩]. বুখারীঃ হাদীস নং- ৩৬০৬

এর অর্থ হচ্ছে বাহ্যত তারা আমাদের ধর্মের উপরই (অর্থাৎ মুসলমান) থাকবে; কিন্তু ভিতরগতভাবে তারা হবে আমাদের বিরোধী (অমুসলমান)।

যদিও হাফেয ইবনে হাজার এই হাদীসের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেন খারেজীদেরকে। ফাতহুল বারীর ১৩/৭৭ পৃষ্ঠায় দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

وَأَمَّا الَّذِيْ يَدَّعِيْهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلاً فَيَدَّعِي الإِيْمَانَ وَالصَّلاحَ ثُمَّ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَدَّعِي الإِلَهِيَّةَ.

যে এরকম দাবি করবে, সে প্রথমে ঈমান, ইসলাহ্ ও তাকওয়ার দাবি করবে, তারপর নবুয়তের এবং তারপর খোদায়ীর।

ত্রিশ জন দাজ্জাল সম্বলিত হাদীস এবং কোন কোন বর্ণনায় ত্রিশের অধিক সংখ্যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৭৪ পৃষ্ঠায় হাফেয বলেন–

হতে পারে, নবুয়ত (ও খোদায়ী) দাবিকারীর সংখ্যা ত্রিশই হবে; আর বাকিরা শুধু কায্যাব হবে। তবে গুমরাহীর দিকে লোকজনকে দাওয়াত দিতে থাকবে। যেমন, সীমালঙ্ঘনকারী শিয়া, বাতেনী ফেরকা, ইত্তেহাদিয়া ফেরকা, হুলূলিয়া ফেরকা এবং এগুলো বাদে ওইসব ফেরকা, যেগুলো এমনসব আকীদার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়, যেগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দীনের বিপরীত হওয়া কাতয়ী ও একীনী।

দেখুন, হাফেয ইবনে হাজার এসব ফেরকাকে দাজ্জালের কাতারভুক্ত করে, শুধু জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করার কারণে কাফের আখ্যায়িত করেননি; বরং রসূলুল্লাহর আনীত দীনের বিরোধী হওয়ার কারণেও। (সুতরাং এসব গুমরাহ্ ও কাফের ফেরকা মুসলমানদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে। এরপরও তারা নিশ্চিতভাবে কাফের। এতে বোঝা গেল যে, আহলে কেবলা যদি কুফরী আকীদা ও আমলে লিপ্ত হয়, তা হলে নিজেকে মুসলমান বলা ও মনে করার পরও কাফের হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।)

এরপর ইবনে আবেদীন (আল্লামা শামী)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শারহু মানহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক' ১/৩৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিম্নের বিবৃতির উপর আমার দৃষ্টি পড়েছে–

وَحَرَّرَ العلاَّمَةُ نُوحٌ آفِندِي أَنَّ مُرَادَ الإِمَامِ بِمَا نُقِلَ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الفِقهِ الأَكْبَرِ مِنْ عَدَمِ التَّكْفِيْرِ بِالذَّنْبِ الذِيْ هُوَ مَذهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، تَأَمَّلْ.

আল্লামা নূহ আফেন্দীর তাহকীক হচ্ছে এই যে, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে যে আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত আছে, তা থেকে উদ্দেশ্য সেটাই, যা ফিকহে আকবারে উল্লেখ রয়েছে– অর্থাৎ গুনাহের কারণে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের অভিমত। বিষয়টি ভালো করে বুঝবার মত।

ইমাম আবু হানীফা গুনাহের কারণে কাফের সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন

ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে আহলে কেবলার তাকফীর নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সবাই 'মুন্তাকা'র বরাত দিয়েই বয়ান করে থাকে। যেমন, শারহে মাকাসিদ ২৬৯ পৃষ্ঠা এবং মুসায়ারা (নতুন সংস্করণ, মিশর) ২১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাক্কিক ইবনে আমীর হাজ 'শারহে তাহরীর' ৩/৩১৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত 'মুন্তাকা'র যে এবারত উল্লেখ করেছেন, তা এ রকম–

لاَ نُكَفِّرُ أَهْلَ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ.

কোন গুনাহের কারণে আমরা আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করি না।

দেখুন, এই এবারতের মধ্যে بِذَنْبٍ শর্ত উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্র এই বক্তব্য শুধু মুতাযেলা ও খারেজীদের রোধ করার জন্য। (কেননা, খারেজীরা গুনাহে কবীরায় লিপ্ত মুসলমানকে কাফের বলে। মুতাযেলা এমন ব্যক্তিকে ঈমান থেকে খারিজ এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী সাব্যস্ত করে। তবে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত তাকে

কাফেরও বলি না; ইসলাম থেকে বহিষ্কৃতও বলি না; এমন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামীও বলি না। বরং আমরা তাকে মুসলমান এবং ক্ষমার উপযুক্ত বলে থাকি।) কেননা, বাক্যের ধরণ বলছে, ইমাম হানীফা তাদেরকে কটাক্ষ করেছেন, যারা একজন মুমিনকে কোন কুফরী মন্তব্য বা কাজ না পেয়ে শুধু কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ সাব্যস্ত করে থাকে। তবে কুফরী কথাবার্তা বলার পরও যদি কাউকে কাফের বলা না হয়, তা হলে সেই কথাবার্তাকে কুফরী কথাবার্তা বলা উচিত নয়। আর এটা শুধু ধোঁকা ও ফেরেব।

এরপর হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাবুল ঈমান (পুরনো সংস্করণ, ১৩২৫ হি.) ১২১ পৃষ্ঠার নিম্নবর্ণিত এবারতের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হয়–

وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكَفَّرُ بِذَنْبٍ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا.

আমরা যখন বলি যে, আহলে সুন্নাত একমত যে, গুনাহের কারণে কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না, তখন গুনাহ্ বলে আমাদের উদ্দেশ্য যেনা, মদপান জাতীয় গুনাহখাতা।

আল্লামা কাওনাভী 'আকীদাতুত তাহাভী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুলহিদ ও যিন্দীকদের ধোঁকা ও ফেরেব

(ইমামদের বক্তব্য لاَ نُكَفِّرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ আশ্রয়ে মুলহিদ ও যিন্দীকেরা ধোঁকা ও ফেরেবের পন্থায় অনেক স্বার্থ হাসিল করেছে। সবসময় কাফের সাব্যস্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য ইমামদের এই মন্তব্যটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।) এজন্যই অনেক ইমাম একথা বলা থেকেও বিরত থাকেন–

لاَ نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ.

(গুনাহের কারণে আমরা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করি না।)

বরং তারা বলেন–

إِنَّا لاَ نُكَفِّرُهُمْ بِكُلِّ ذَنْبٍ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ.

আমরা যে কোন গুনাহের কারণে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করি না, যেমনটা খারেজীরা করে থাকে।[২৪]

কাজেই আল-ফিকহুল আকবারে'র ১৯৬ পৃষ্ঠায় ঈমানের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা কাওনাভী (এই প্রসিদ্ধ কথিকা لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ. এর আওতায় শুধু ফাসাদ আকীদার সুরতে) কাফের সাব্যস্তকরণের কথা উদ্ধৃত করেছেন–

وَفِي قَوْلِهِ بِذَنْبٍ إِشَارَةٌ إِلَى تَكْفِيْرِهِ بِفَسَادِ اعْتِقَادِهِ كَفَسَادِ اعْتِقَادِ الْمُجَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَنَحْوِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى وَالْكَلَامُ فِي الذَّنْبِ.

بِذَنْبٍ শব্দটির মধ্যে এদিকে ইশারা রয়েছে যে, আকীদা ফাসেদ হলে অবশ্যই কাফের সাব্যস্ত করা হবে। মুজাস্সিমা ও মুশাব্বিহা সম্প্রদায়ের যেমন ফাসেদ আকীদা রয়েছে। তাদেরকে তাদের ফাসেদ আকীদার কারণে কাফের বলা হয়ে থাকে। (কোন গুনাহের উপর ভিত্তি করে নয়। একথা স্পষ্ট যে, আকীদা ফাসেদ হওয়াকে গুনাহ্ বলা হয় না।) অথচ আমাদের আলোচনা গুনাহ্ প্রসঙ্গে।

ইমাম তহাভী রহ. থেকে এই পার্থক্যই বর্ণিত হয়েছে 'আল-মু'তাসারে'র ৩৪৯ পৃষ্ঠার বাবুত তাফসীরে। ইমাম গাযালীও 'ইকতেসাদ'র শেষে এই পার্থক্য উল্লেখ করেছেন।

(সারকথা হচ্ছে এই যে, কোন গুনাহের কারণে কোন মুসলমানকে কাফের বলা নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ এই যে, কুফরী আকীদা ও আমল থাকার কারণেও তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং بِذَنْبٍ এর শর্ত একথা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কাফের সাব্যস্তকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম শুধু গুনাহ্ পর্যন্ত সীমিত এবং শুধু মুসলমানদের জন্য। কুফরী আকীদা ও আমল অবলম্বন করার পর তো কেউ মুসলমান এবং আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্তই থাকে না।)

---

[২৪]. শারহুল ফিকহিল আকবার (মুজতাবায়ী মুদ্রণ, দিল্লী) : ২০০

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র কিছু উদ্ধৃতি

শরয়ী ফরয অস্বীকার করলে কাফের

তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া ওয়াজিব

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীর ১২/২৪৮ পৃষ্ঠায় ইরতিদাদ[২৫] সংক্রান্ত হাদীসের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর লিখেছেন–

> মুরতাদদের উপর বিজয় লাভের পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এই বিষয়ে যে, কাফেরদের মত মুরতাদদের ধনসম্পদকে গনীমত এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানকে গোলাম বানানো হবে, না কি তাদের সাথে বিদ্রোহী মুসলমানদের মত আচরণ করা হবে? হযরত আবু বকর সিদ্দীক প্রথম অভিমতের পক্ষে ছিলেন। তিনি তাঁর আমলে এই অভিমতের উপরই আমল করে যান। হযরত উমর দ্বিতীয় অভিমত লালন করতেন। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকরের সাথে এই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। যার বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুল আহকামে আসবে। উমরের খেলাফতকালে তার সঙ্গে অন্যান্য সাহাবীও একমত হন। (যা হোক, তখন সমস্ত সাহাবী একথার উপর একমত হন যে,) যে কোন ব্যক্তি (বা কওম) কোন

---

২৫. উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী বর্ণিত এই হাদীসটি–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোন শরয়ী ফরয অস্বীকার করলে, তাকে অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হবে। এতে সে (বা তারা) যদি লড়াই করতে প্রস্তুত হয়, তা হলে হুজ্জত পূর্ণ করার পর তার (বা তাদের) সাথে লড়াই করা হবে। যদি তারা (আত্মসমর্পণের পর) অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালো; অন্যথায় তাদের সঙ্গে কাফেরদের সাথে পালনীয় আচরণ দেখানো হবে। (অর্থাৎ তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে এবং তার ধনসম্পদ গনীমত এবং তার স্ত্রীসন্তানকে গোলাম সাব্যস্ত করা হবে।) বলা হয় যে, মালেকীদের মধ্য থেকে আসবাহ্ প্রথম অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন। এজন্য তাকে বিরল (স্বতন্ত্র) বিরোধী হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ্রন্থকারের মতে عُومِلَ مُعَامَلَةَ الْكَافِرِ বলে উদ্দেশ্য কুফরের ভিত্তিতে হত্যা করে দেওয়া। এজন্য হাফেয ইবনে হাজার এর পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বলে এসেছেন–

وَالَّذِيْنَ تَمَسَّكُوا بِأَصْلِ الإِسْلَامِ وَمَنَعُوا الزَّكَاةَ بِالشُّبْهَةِ الَّتِيْ ذَكَرُوهَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ.

যারা ইসলামের মূলের উপর বহাল ছিল; কিন্তু উল্লিখিত সন্দেহের কারণে যাকাত দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছিল, তাদের বিপক্ষে হুজ্জত পরিপূর্ণ হওয়ার আগে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হয়নি। (বরং হুজ্জত পূর্ণ হওয়ার পর কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে।)[২৬]

এমনইভাবে সামনে গিয়ে হাফেয ইবনে হাজার ইমাম কুরতুবী থেকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে একই হুকুম (হুজ্জত পূর্ণ হওয়ার পর কাফের সাব্যস্ত করা হবে।) উল্লেখ করেছেন, যে দিলের ভিতরে কোন বেদআত (গুমরাহী) গোপন রাখে।

---

[২৬]. ফাতহুল বারী: ১২/২৪৮

জরুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে তাবীল কুফর থেকে বাঁচাতে পারে না

উল্লিখিত এবারতে شُبْهَةٌ [সন্দেহ] থেকে হাফেযের উদ্দেশ্য তাবীল। সুতরাং বোঝা গেল, তাবীলকারীকেও তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে ফেলে, তা হলে ভালো; অন্যথায় তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে। তাবীলের এটাই চূড়ান্ত ফায়দা। (অর্থাৎ তওবার সুযোগ দেওয়া হয়।) কিন্তু তাবীলের উপর ভর করে কেউ কুফরের হুকুম থেকে বেঁচে যাবে, এমনটা সম্ভব নয়। (সুতরাং হাফেয ইবনে হাজার ও ইমাম কুরতুবীর উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হল যে, তাবীলকারী ফিরে না এলে তাকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে, যদিও সে আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত হয়। একথাও জানা গেল যে, তাবীল কুফরের হুকুম থেকে বাঁচায় না।)

আহলে কেবলা হওয়া সত্ত্বেও খারেজীরা কাফের

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীর ১২/২৬৬-২৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আন্হু'র (উল্লিখিত) রেওয়ায়েত[২৭] (যে, তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়।) ওইসব লোকের দলীল, যারা খারেজীদেরকে কাফের বলে থাকেন। ইমাম বুখারীর কর্মপন্থার দাবিও এমনই। কেননা, তিনি শিরোনামে খারেজীদেরকে মুলহিদদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন (এবং বলেছেন, (بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ)। অথচ তাবীলকারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। (এ থেকে বোঝা যায়, ইমাম বুখারীর মতে খারেজী ও মুলহিদদের হুকুম অভিন্ন। উভয়ই কাফের এবং হত্যার উপযুক্ত।)

---

২৭. উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী বর্ণিত নীচের হাদীসটি–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ... سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

খারেজীদের কাফের হওয়ার দলীল-প্রমাণ

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বিষয়টি তিরমিযীর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, সহীহ কথা হচ্ছে এই যে, খারেজীরা কাফের। কেননা–

০১. নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ওরা দীন থেকে বের হয়ে গেছে।

০২. নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, আমি তাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের মত হত্যা (করে নিঃশেষ করে) দিব। কোন কোন বর্ণনায় আদের পরিবর্তে সামূদের কথা এসেছে। এই উভয় কওম কুফরের কারণে ধ্বংস হয়েছে।

০৩. নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ [তারা নিকৃষ্ট সৃষ্টি] আর এই শিরোনাম শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

০৪. নবী আলাইহিস সালাম আরও বলেন, এরা (খারেজীরা) আল্লাহর দৃষ্টিতে সমস্ত মাখলুক থেকে অধিক ঘৃণিত।

০৫. এই খারেজীরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে থাকে, যে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী। এজন্য এরাই এই নামের (অর্থাৎ কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার) অধিক উপযুক্ত। (কেননা, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলে, সে নিজেই কাফের।)

শায়েখ সুবকীর দলীল এবং বিরোধীদের সংশয় নিরসন

হাফেয ফাতহুল বারীর ১২/২৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন, পরবর্তীদের মধ্যে যারা খারেজীদেরকে কাফের বলেন, শায়েখ তাকীউদ্দীনও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তিনি তাঁর ফতোয়ার ভিতরে লিখেছেন–

যারা খারেজীদের ও কট্টর রাফেযী (খাঁটি শিয়া)-দেরকে কাফের বলেন, তারা দলীল পেশ করেন এই যে, এরা উঁচু মর্যাদার সাহাবীদেরকে কাফের বলে থাকে। আর এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তিনি এসব সাহাবীকে জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। (আল্লামা) সুবকী বলেন, আমার মতে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য এই দলীল সম্পূর্ণ সঠিক। তবে যারা তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেন না, তারা দলীল পেশ করে থাকেন এই যে, এই মিথ্যাপ্রতিপন্ন

করা আবশ্যক হতে পারে তখন, যখন প্রমাণিত হবে যে, ওই বড় সাহাবীদেরকে কাফের বলে মন্তব্য করার আগে রসূলুল্লাহর সাক্ষ্যদানের কথা তাদের নিশ্চিতভাবে জানা ছিল (এবং তারপরও তারা সাহাবীদেরকে কাফের বলেছে)। কিন্তু (সুবকী বলেন,) আমার দৃষ্টিতে এই দলীল অস্পষ্ট। কেননা, তারা সেইসব সাহাবীকে কাফের বলেছে, যাদের আমৃত্যু কুফর ও শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন থাকার কথা আমরা একীনী ও অকাট্যভাবে জানি। (আর কাতয়ী ও একীনী বিষয়াদিতে অনবগতি ওজর সাব্যস্ত হয় না।) এই একীন প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করণের আকীদা রাখার জন্য যথেষ্ট, যারা বড় বড় সাহাবীকে কাফের বলে। [সুবকী] বলেন, এই দলিলের তায়িদ সেই হাদীস দ্বারাও হয়, যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলল, দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই কাফের হয়ে গেল। (অর্থাৎ যাকে বলা হল, সে কাফের না হলে যে বলল, সে কাফের হয়ে গেল।)

সহীহ মুসলিমের ১/৫৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসের শব্দমালা এমন–

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের হওয়ার অপবাদ দিল, অথবা তাকে 'হে আল্লাহর দুশমন' বলল, সে নিজেই কাফের হয়ে গেল।[২৮]

এর পর সুবকী বলেন–

একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা (খারেজী ও কট্টর শিয়ারা) সেই জামাআতের উপর কুফরের অভিযোগ দিয়ে থাকে, যাদের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাতয়ী ও একীনী ইলম রয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে এই যে, শরীয়তপ্রবর্তক [নবী] আলাইহিস সালামের ফরমান অনুসারে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে। আর এটা (বড় বড় সাহাবীকে কাফের বলার কারণে খারেজী ও রাফেযীদেরকে কাফের বলা) এমনই, যেমন আলেমগণ (সর্বসম্মতভাবে) কোন ব্যক্তিকে মূর্তি বা অন্য কোন বস্তু সেজদা করতে দেখে কাফের বলে থাকেন। যদিও সেই ব্যক্তি স্পষ্ট করে ইসলামকে অস্বীকার নাও করে। অথচ সমস্ত আলেম কুফরের ব্যাখ্যা করেন 'জুহুদ'

---

[২৮]. সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং- ২২৬

(অস্বীকৃতি) দিয়ে। (কেমন যেন জুহূদের দুই তরীকা– একটি কওলী, আরেকটি আমলী। মূর্তির সেজদাকারীর কাজ মুখে অস্বীকার করার সমার্থক এবং জুহূদে আমলী। একইভাবে খারেজী ও কট্টর শিয়াদের এই আমল, সাহাবা ও মুমিনদেরকে কাফের সাব্যস্তকরণও জুহূদে আমলী। সুতরাং তাদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হবে।) সুবকী বলেন, যদিও এরা গাইরুল্লাহকে সেজদাকারী ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করার হেতু উল্লেখ করেন 'ইজমা'। (অর্থাৎ উম্মতের ইজমা হচ্ছে যে, গাইরুল্লাহকে সেজদাকারী কাফের।) কাজেই আমরা বলি, যেমনইভাবে মূর্তির সেজদাকারী মুখে অস্বীকার না করেও ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে কাফের, তেমনইভাবে সেইসব সহীহ মুতাওয়াতির হাদীস, যেগুলো খারেজীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়। যদিও এরা ওইসব সাহাবায়ে কেরামের কুফর থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার আকীদা নাও রাখে, যাদের এরা কাফের সাব্যস্ত করে। (ইজমা ও মুতাওয়াতির হাদীস এক সমান পর্যায়ের কাতয়ী হুজ্জত।) ইসলামের উপর এজমালী বিশ্বাস ও শরয়ী ফারায়েযের উপর আমল তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না। (মোটকথা, কুফরী কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়া নিঃশর্তভাবে কুফর আবশ্যককারী। যদিও লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করে এবং শরয়ী ফারায়েযের উপর আমল করে।)

অনিচ্ছায়ও আহলে কেবলা কাফের হতে পারে

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠায় বলেন, তাহযীবুল আসার নামক কিতাবে ইমাম তাবারীর ঝোঁকও অনেকটা এদিকেই। সুতরাং পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ বিস্তারিত বয়ান করার পর তিনি বলেন–

এসব হাদীস ওই সমস্ত লোকের কথা রদ করে, যারা বলে থাকে যে, ইসলামে দাখিল হওয়ার এবং মুসলমান নাম পাওয়ার পর আহলে কেবলা থেকে কোন ব্যক্তি বা দল ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে খারেজ (ও কাফের) হতে পারে না, যতক্ষণ সে জেনে বুঝে ইসলাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা না করে। এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে বাতিল। কেননা, নবী আলাইহিস সালাম এই হাদীসে বলছেন–

يَقُولُونَ الْحَقَّ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرآنَ وَيَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ لاَ يَتَعَلَّقُونَ مِنْهُ بِشَيءٍ.

তারা হক কথা বলতে থাকবে, কুরআন পড়তে থাকবে। এরপরও তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

উদ্দেশ্যের খেলাফ কুরআন ব্যাখ্যা ও হারামকে হালালকরণ

এরপর তাবারী বলেন, একেবারে স্পষ্ট কথা এই যে, এই খারেজীরা মুসলমানদের জান-মালকে হালাল মনে করার অপরাধে লিপ্ত হয়েছে শুধু ওই তাবীলগুলোর আশ্রয়ে, যেগুলো তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত করে রেখেছিল। (এজন্যই তারা মুসলমানদেরকে কাফের বলতে এবং তাদের জান ও মাল হালাল সাব্যস্ত করার অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং তারা নিজেরাই কাফের হয়ে গেছে; যদিও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তারা করেনি।)

এরপর তাবারী নিজের বক্তব্যের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু'র নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছেন–

وذُكِرَ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ وَمَا يَقُولُونَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: يُؤْمِنُونَ بِمُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُوْنَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ.

ইবনে আব্বাসের সামনে খারেজীদের এবং কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারা যেসব তাবীল করে, সেগুলো অ লোচনা এলে তিনি বললেন, এরা কুরআনের 'মুহকাম' (স্পষ্ট) আয়াতের উপর ঈমান আনে ঠিকই; কিন্তু মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের (বাতিল) ব্যাখ্যায় ধ্বংস হয়।

তাবারী বলেন, যারা খারেজীদের কাফের বলেন, তাদের সমর্থন এ থেকেও হয় যে, হাদীসে তাদের কতল করে দেওয়ার হুকুম এসেছে–

فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِم أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

সুতরাং তোমরা যেখানে তাদেরকে পাবে, সেখানেই তাদেরকে হত্যা করে দিবে। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাদেরকে হত্যা করার বিনিময়ে অনেক সওয়াব থাকবে।

এ ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু'র বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে, তিন কারণের কোন একটি না পাওয়া গেলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়। সেই তিন কারণের একটি হচ্ছে এই যে, সে তার দীন

ছেড়ে দিবে এবং মুসলমানদের জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (বোঝা গেল, খারেজীদের হত্যা করে দেওয়ার হুকুমটি এই কারণেরই আওতায় পড়ে। অর্থাৎ তারা তাদের দীন ছেড়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে।)

সুতরাং ইমাম কুরতুবী 'আল-মুফহিম' নামক গ্রন্থে বলেন–

খারেজীদের কাফের হওয়ার তায়িদ আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর হাদীসের[২৯] উপমা থেকেও পাওয়া যায়। কেননা, সেই উপমার উদ্দেশ্য এ-ই মনে হয় যে, ওসব লোক ইসলাম থেকে পরিষ্কারভাবে বের হয়ে যাবে এবং ইসলাম থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেমন তীর তীব্রতার কারণে এবং নিক্ষেপকারীর শক্তি প্রয়োগের কারণে শিকারের দেহ ভেদ করে পরিষ্কারভাবে বের হয়ে যায়। তীরের গায়ে কোন প্রকারের আসর থাকে না। একেবারে সম্পর্ক না থাকার এই বিষয়টি নবী আলাইহিস সালাম বয়ান করেছেন এভাবে–

قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ

সেই তীর গোবর আর রক্ত ভেদ করে পরিচ্ছন্নভাবে পার হয়ে যায়। (অর্থাৎ রক্ত বা গোবরের কোন আলামত তীরের গায়ে থাকে না। এমনইভাবে খারেজীরা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। ইসলামের নাম-নিশানা তাদের সাথে থাকবে না।

উম্মতকে গুমরাহ এবং সাহাবাকে কাফের বলা

কাযী আয়ায 'শিফা' নামক গ্রন্থে এই হাদীসের আলোকে বলেন–

এমনইভাবে আমরা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির কাফের– ইসলাম থেকে খারিজ ও সম্পর্কহীন হওয়ার কাতয়ী একীন রাখি, যে এমন কোন কথা বলে, যদ্বারা উম্মতকে গুমরাহ এবং সাহাবাকে কাফের সাব্যস্ত করা হয়।

---

[২৯] উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী বর্ণিত নীচের হাদীসটি–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ... سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

'আর-রওযা'র রচয়িতা 'আর-রিদ্দা' নামক কিতাবে কাযী আয়াযের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং এর উপর সমর্থনও ব্যক্ত করেছেন।

খারেজীদের ব্যাপারে আলেমদের সাবধানতা

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

আহলে সুন্নাত কালামশাস্ত্রবিদ আলেমগণ সাধারণত খারেজীদেরকে ফাসেক বলে থাকেন; (কাফের বলেন না।) কারণ, কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করা এবং আরকানে ইসলামের পাবন্দী করার দরুণ (তারা মুসলমান এবং) তাদের উপর ইসলামের আহকাম কার্যকর হয়। ফাসেকও শুধু এ কারণে যে, তারা একটি বাতিল তাবীলের আশ্রয়ে নিজেদের বাদে সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করে থাকে এবং তাদের এই বাতিল আকীদাই বিরোধীদের জান-মাল হালাল ও মুবাহ মনে করার এবং তাদের উপর কুফর ও শিরকের সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যম হয়েছে।

খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

মুসলিম আলেমসমাজ একথার উপর ঐক্যবদ্ধ যে, হাঁকডাকে গুমরাহী সত্ত্বেও খারেজীরা মুসলমান ফেরকাসমূহ থেকে একটি ফেরকা। আলেমগণ তাদের সাথে বিবাহ-শাদী এবং তাদের হাতের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয মনে করেন। মনে করা হয় যে, যতক্ষণ তারা ইসলামের মূল (অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালত ও পরকালীন হায়াতের আকীদা)-এর উপর কায়েম থাকবে, ততক্ষণ তাদেরকে কাফের বলা যাবে না।

কাযী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

মনে হয়, (খারেজীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার) এই মাসআলা কালামবিদদের কাছে সবচেয়ে বেশি জটিল আকার ধারণ করেছিল। এজন্য ফকীহ আবদুল হক যখন ইমাম আবুল মাআলীকে এই মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন তিনি একথা বলে জওয়াব দেওয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, কোন কাফেরকে (মুসলমান বলে) ইসলামে দাখিল করে দেওয়া এবং কোন মুসলমানকে (কাফের বলে) ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়া দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বড় যিম্মাদারীর কাজ।

কাযী আয়ায আরও বলেন–

আবুল মাআলীর আগে কাযী আবু বকর বাকেল্লানীও এই মাসআলায় মতপ্রকাশ থেকে বিরত রয়েছেন। এর কারণ বলেছেন এই, খারেজীরা স্পষ্ট করে কুফর অবলম্বন করেনি; তবে তারা এমন আকীদা অবশ্যই গ্রহণ করেছে, যা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফায়সালুত তাফ্‌রিকাতি বাইনাল ঈমান ওয়ায-যান্দাকাহ' নামক গ্রন্থে বলেন–

যতক্ষণ সম্ভব কাউকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাওহীদের স্বীকারোক্তি দানকারী নামাযীদের জান-মালকে মুবাহ (এবং তাদেরকে কাফের) সাব্যস্ত করা অনেক বড় অন্যায়। হাজার হাজার কাফেরকে (মুসলমান বলে) জীবিত ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে অন্যায় করা একজন মুসলমানকে (কাফের বলে তার) রক্ত ঝরানোর অন্যায় করার তুলনায় অনেক সহজ।

বিরোধী পক্ষের দলীল-প্রমাণ

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

খারেজীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার বিপক্ষীয় আলেমগণ একটি দলীল এও পেশ করে থাকেন যে, তৃতীয় হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দীন থেকে বের হয়ে যাওয়াকে তীর শিকার ভেদ করে যাওয়ার সাথে তুলনা করে বলেছেন–

فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

নিক্ষেপকারী তীরটি আগাগোড়া সন্দেহের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে– তাতে কি কিছু লেগেছে? (না কি তা লাগেনি। অর্থাৎ তীর কি দেহ ভেদ করেছে, না কি তা করেনি? এমনইভাবে এদের ব্যাপারে সন্দেহ হবে, এরা কি দীন থেকে বের হয়ে গেছে, না কি তা যায়নি?)

সুতরাং ইবনে বাত্তাল বলেন–

সংখ্যাগুরু আলেমদের অভিমত হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা– فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খারেজীরা মুসলমানদের জামাত থেকে খারিজ (ও কাফের) নয়। কেননা, فَيَتَمَارَى শব্দটি সন্দেহের প্রমাণ বহন করে। আর যখন তাদের কুফর সন্দেহপূর্ণ, তখন

তাদের উপর ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার হুকুম নিশ্চিতভাবে কীভাবে লাগানো যেতে পারে? যে ব্যক্তি কাতয়ী ও একীনীভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাকে একীন ছাড়া ইসলাম থেকে খারিজ করা যায় না।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর বর্ণনা

ইবনে বাত্তাল রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, একবার হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে খারেজীদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যে, তারা কি কাফের, না কাফের নয়? তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু জবাবে বললেন, مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوْا কুফরী থেকে তো তারা পালায়ন করে। (অর্থাৎ তাদের ধারণা অনুপাতে তারা কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যারা কুফরী থেকে এভাবে বেঁচে থাকে তারা কি করে কাফের হতে পারে?)

মুহাদ্দিসগণের জবাব

হযরত হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, যদি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর এই কথাটি সনদের দিক থেকে সহীহ্ হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে এটি তাঁর ঐ সময়ের উক্তি যখন তিনি খারেজীদের কুফরী আকীদা সমন্ধে অবগত ছিলেন না। যে কারণে লোকেরা খারেজীদেরকে কাফের বলা সত্ত্বেও তিনি কাফের বলেননি। (হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই কথাটি ঐ সময় বলে ছিলেন, যখন তিনি খারেজীদের কুফরী আকীদা পোষণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অন্যথায় বোখারী শরীফে স্বয়ং তার থেকেই খারেজীদের বিরুদ্ধে হাদীস বর্ণিত আছে। সেই হাদীসে পরিষ্কারভাবে এ কথাটিও উল্লেখ আছে যে,

> فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
>
> খারেজীদেরকে তোমরা যেথায় পাও সেথায় হত্যা করে ফেলো। তাদেরকে হত্যা করলে, নিশ্চয়ই হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতের দিন নেক ও পুরস্কার রয়েছে।

এ কথার প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ খারেজীদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেছেন।

তাছাড়া হযরত হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ দ্বারা তাদের কাফের

হওয়ার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলীল দেওয়া বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, কোন কোন সনদে যেমন উক্ত বাক্যটি উল্লেখ আছে, তেমনিভাবে কোন কোন সনদে এই বাক্যও উল্লেখ আছে- لَمْ يُعلقْ مِنْهُ بِشَيْءٍ। আবার কোন কোন সনদে قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ বাক্যটিও উল্লেখ আছে। বিধায় এই তিনো সনদের উল্লিখিত বাক্যগুলোর মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধান করার সুরত এটাই যে, তীর নিক্ষেপকারী প্রথমবার তীর একেবারে পরিষ্কার দেখে الْفُوقَةِ তথা তীরের মাথাকে সংশয়-সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে যে, তীরটি শিকারের শরীরে লেগে শরীর ভেদ করে বের হয়েছে, কি না? তারপর তার দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যায় যে, তীরটি তো অবশ্যই শিকারের শরীর ভেদ করে বের হয়েছে। তবে এত দ্রুত বের হয়ে গেছে যে, সেটির মাথায় রক্ত ইত্যাদির নামনিশানা পর্যন্ত বাকি নেই; একেবারে পরিষ্কার অবস্থায় বের হয়েছে ।

এটাও হতে পারে যে, হাদীসের শব্দগুলো বিভিন্ন রকম এসেছে ঐ লোকদের অবস্থা বিভিন্নরকম হওয়ার কারণে। কেননা, তাদের কিছু লোকতো নিশ্চিত ও অকাট্যভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর কিছু লোকের বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ যে, ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক বাকি আছে কি নেই। তো فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ কথাটি দ্বিতীয় প্রকার লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ও لَمْ يُعلقْ مِنْهُ بِشَيْءٍ কথাটি প্রথম প্রকার লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আলমুফহাম কিতাবে বলেন, হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে খারেজীদের কাফের হওয়ার বিষয়টি কাফের না হওয়া অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট।

খারেজীদেরকে কাফের বলা ও না বলার মাঝে পার্থক্য

তারপর হযরত কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, খারেজীদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে এবং তাদেরকে হত্যা করা যাবে। তাদের বিবি-বাচ্চাদেরকে যুদ্ধবন্দী বানানো যাবে। তাই তো খারেজীদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের একটি বিরাট দলের মত এটাই।

আর তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত না করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে সেসব রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমানদের আচরণ করা হবে, যারা ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে যুদ্ধ করতে নেমে পড়েছে। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধাবস্থায় মারা যাবে তারা তো মারাই গেল। কিন্তু যারা বেঁচে গেল তাদেরকে বিদ্রোহ করার শাস্তি দেওয়া হবে, অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যার ফায়সালা মুসলিম শাসকের উপর ন্যাস্ত।)

একটু সামনে বেড়ে তিনি বলেন, তবে তাদের মধ্য হতে যারা অন্তরে ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে, তাদেরকে জনসম্মুখে আনা হবে। অতঃপর তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করার সুরতে কি তাকে হত্যা করা হবে, না কি হবে না? বরং তার সংশয়-সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যেমন মতভেদ রয়েছে তাদেরকে কাফের বলা, না বলার ব্যাপারে। (অর্থাৎ যারা কাফের বলেন, তারা প্রথম সুরত অবলম্বন করেন এবং হত্যার হুকুম দেন। আর যারা কাফের বলেন না, তারা দ্বিতীয় সুরত অবলম্বন করেন।)

তবে তিনি বলেন, কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। এর থেকে বেঁচে থাকার সমপর্যায়ের কোন কিছু আমাদের কাছে নেই।

খারেজী সর্ম্পকীয় হাদীসসমূহ থেকে বের করা বিধান

হযরত কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ সব হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযীমুশ শান ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্যতার প্রমাণও রয়েছে যে, একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটির হুবহু সংবাদ দিয়ে দিতেন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হচ্ছে, যখন খারেজীরা তাদের বিরোদ্ধাচারণকারী মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে কাফের ঘোষণা দিতে থাকল, তখন তারা তাঁদেরকে হত্যা করাও নিজেদের জন্য হালাল ও বৈধ মনে করতে লাগল। (এবং নির্দ্বিধায় রক্তপাত, হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে শুরু করল।) অমুসলিম যিম্মী তথা ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে এই বলে ক্ষমা করে দিল যে, এরা তো যিম্মী। এদের সাথে আমরা জান-মালের নিরাপত্তা দেওয়ার চুক্তি করেছি। তাই অবশ্যই চুক্তি পুরা করতে হবে। হিন্দু-মুশরেকদের সাথেও হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে দেয়। (মনে করত, এরা তো নিরেট কাফের-মুশরিক, এদের দ্বারা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না।)

কিন্তু তাদের বিরোধী মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানো, তাদের সাথে যুদ্ধ করা ও নিষ্পাপ মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালানোর মধ্যে তারা লিপ্ত থাকে। (মনে করতে থাকে এদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি হবে, গোমরাহী ছড়াবে কাজেই ধরার বুক থেকে এদের নামনিশানা মিটিয়ে দেওয়া আমাদের জন্য ফরযে আইন। নাউযুবিল্লাহ) এটা এই জাহেলদের চূড়ান্ত পর্যায়ের আহাম্মকী ও ক্লোষিত অন্তরের প্রমাণ। তাদের অন্তর ইলম ও মারেফতের নূর থেকে বঞ্চিত ও অন্ধকারচ্ছন্ন ছিল। ঈমান ও একীনের কোন মজবুত জায়গার উপর তাদের পা অবিচল ছিল না। (আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তাদের এই পড়া তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।) এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার নেতা ইবনে যুল খুওয়াইসিরা নিজেই শরীয়তপ্রবর্তক হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যুলুম ও অত্যাচার করার অপবাদ দিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! (একারণে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়ে ছিলেন।) আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন অবাধ্যতা ও বিয়াদবী থেকে হেফাযত করুন।

খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা বেশী জরুরী

ইবনে হুবাই রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাফের-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের ফেতনার পুরোপুরি অবসান ঘটানো বেশী জরুরী। (কেননা, তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

> খারেজীদেরকে তোমরা যেথায় পাও সেথায় হত্যা করে ফেলো। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতের দিন নেক ও পুরুস্কার আছে।)

এর হেকমত হচ্ছে এই যে, খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের মূলপুজি তথা দীন ও দীনদারগণকে হেফাযত করা। আর কাফের-মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা ও উপকারিতা অর্জন অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অমুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস করা। (আর এ

কথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, মুনাফা হেফযত করার তুলনায় মূলপুজি হেফাযত করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য।

বাহ্যিক অর্থ এজমা পরিপন্থী হলে তাবীল করা জরুরী

এ সব হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাবীলযোগ্য যে সব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এজমায়ে উম্মত পরিপন্থী, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না। (অর্থাৎ যেসব আয়াতের মধ্যে সহীহ্ তাবীল করে এজমায়ে উম্মতের অনুকুল বানানো যায়, সেগুলোর এমন বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না, যা এজমায়ে উম্মতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (হুকুমত শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য।) এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য হাকিম হওয়া বৈধ নয়। বিধায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুও কাফের এবং তাঁকে হত্যা করা ওয়াজিব। হযযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্হুও কাফের (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা, তারা উভয়ে হাকিম হওয়ার দাবি করেছেন। অথবা তারা উভয়ে একজন হাকাম তথা ফায়সালাদাতার ফায়সালা মেনে নিয়েছেন। এরূপ অর্থ নিশ্চিত ভুল এবং এজমায়ে উম্মত ও কুরআনী ভাষ্যসমূহের পরিপন্থী।

দীনী বিষয়ে সীমালংঘন মারাত্মক ভয়ানক

উক্ত হাদীসগুলোতে দীনী বিষয়ে সীমালংঘন করা এবং গোরামী করা- শরীয়ত যার অনুমতি দেয়নি- এগুলিকে মারাত্মক ভয়ানক ও আশঙ্কাজনক আখ্যায়িত করেছে। (খারেজীদের এই সীমালংঘনই তো সমস্ত ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার এবং তাদের কাফের ও অপদস্ত হওয়ার মূল হেতু ও কারণ হয়েছে।) কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এই শরীয়তকে পুরোপুরি সহজ ও আমলযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। এমনিভাবে মুসলমানদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন কাফেরদের সাথে কঠোরতা করতে ও মুমিনদের সাথে রহমশীল হতে। কিন্তু এই খারেজীরা নিজেদের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ির কারণে পুরোপুরি এর বিপরীত করেছে। (তারা মুমিনদের উপর জুলুম ও কঠোরতা করা আর কাফেরদের সাথে বিনম্র ও দয়াপরশ আচরণ করাকে নিজেদের প্রতীক বরং ঈমানের অঙ্গ বানিয়ে নিয়েছে। আর দীনী বিষয়ে সীমালংঘন করে দীনকে সীমাহীন কঠিন ও শরীয়তকে আমল অযোগ্য বানিয়ে দিয়েছে।)

ন্যায়পরায়ণ বাদাশার বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা জরুরী

এমনিভাবে এসব হাদীস থেকে এই অনুমতিও প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তি বা দলের সাথে যুদ্ধ করা যাবে, যারা ন্যায়পরায়ণ বাদাশার আনুগত্য গর্দান থেকে ছুড়ে ফেলে বাদাশার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরী হয়ে যায় এবং নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তিতে হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তপাত ঘটানো শুরু করে দেয়। এমনিভাবে সেই ব্যক্তি বা দলের সাথে যুদ্ধ করা যাবে, যারা ডাকাতি-রাহাজানি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে অনিরাপত্তা, ফেতনা-ফাসাদ ও অরাজকতা ছাড়ায় এবং জনসাধারণের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া ও সফর করা ভয়ানক ও দুষ্কর বানিয়ে দেয়।

তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি বা দল কোন জালেম শাসকের অত্যাচার-নির্যাতনের নিজের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যদি বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাকে শরীয়তে মাযুর ও নিরূপায় ধরা হবে। এরূপ জালেম শাসককে রক্ষা করার জন্য ঐ মাজলুম ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা চাই। কেননা, মাজলুমের এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে জালেমদের থেকে নিজের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনকে হেফাযত করবে।

যেমন হযরত তবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি করেছেন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু খারেজীদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যদি এসব লোক ন্যায়পরায়ণ বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর যদি জালেম বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করে তাহলে কখনোই তাদের সাথে যুদ্ধ করো না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিরূপায়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, কারবালার ময়দানে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর যুদ্ধ এবং হাররাতে উকবা ইবনে মুসলিমের বাহিনীর বিরুদ্ধে মদীনাবাসীর যুদ্ধ এবং মক্কাতে হাজ্জায বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর যুদ্ধ, এমনিভাবে আবদুর রহমান ইবনে আশআস এর ঘটনায় হাজ্জাযের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ এগুলো হল জালেমদের জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে করা যুদ্ধ। তাই এ সকল মহান ব্যক্তিগণ আল্লাহ তাআলার নিকট অপারগ ও নিরূপায়।

অনিচ্ছায়ও মুসলমান দীন থেকে বের হয়ে যায়

হযরত ইবনে হুবাইরা রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, উক্ত হাদীসগুলো থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় মুসলমান দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এবং ইসলামের পরিবর্তে অন্য ধর্ম গ্রহণের এরাদা করা ছাড়াও নিজের কুফরী আকীদা ও আমলের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফের হয়ে যায়। (অর্থাৎ, কোন মুসলমানের কাফের হওয়ার জন্য এটা জরুরি নয় যে, সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে। বরং কুফরী মতবাদ, উক্তি ও আমল অবলম্বন করাই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

খারেজী সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী ভয়ানক ও ক্ষতিকর

এমনিভাবে এসব হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে যত ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থী দল রয়েছে, তাদের মধ্য হতে খারেজীরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ভয়ানক ও ক্ষতিকর। এ দলটি ইসলামের জন্য ইহুদী নাসারাদের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর।

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইবনে হুবাইরা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই শেষ উক্তিটির ভিত্তি হচ্ছে এ কথার উপর যে, খারেজীরা নিঃশর্তে কাফের।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর কৃতিত্ব

এ সব হাদীস থেকে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর বিশাল বড় কৃতিত্বও বুঝে আসে যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে খুবই কঠিন ও আপোষহীন ছিলেন।

শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখেই দীন ও ঈমানের সত্যায়ন নয়

এমনিভাবে এসব হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি বা দলের আদেল হওয়ার অর্থাৎ দীনদার ও ঈমানদার হওয়ার সত্যায়ন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে শুধু তাদের জাহেরী কথা ও কাজের উপর ক্ষ্যান্ত না থাকা চাই। যদিও সে ইবাদত, দীনদারী, পরহেজগারী এবং দুনিয়াবিমুখতার সর্বোচ্চ শিখরে

পৌছে যাক না কেন। বরং এক্ষেত্রে তার আভ্যন্তরীণ আকীদা-বিশ্বাস, আমল এবং ভিতরগত অবস্থা প্রথমে যাচাই করে নিতে হবে।

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ২৪৭ পৃষ্ঠায় بَابُ قَتْلِ مَنْ اَبَى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ এর অধীনে হাদীসে রিদ্দত এর আলোচনা করতে গিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শরীয়তে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাওহীদ-রেসালাতের সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর উপর ঈমান আনা এবং শরীয়তের সকল হুকুম-আহকামের পাবন্দী স্বীকার করাও জরুরী। যাতে করে এটা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, শরীয়তের যে কোন ফরয বিধান অস্বীকার করাও কুফরী। তাই তো হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর এই বর্ণনার ধারাবাহিকতায়-ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ যেটিকে بَابُ قَتْلِ مَنْ اَبَى قَبولَ الْفَرَائِضِ এর অধীনে তাখরীজ করেছেন এবং আমি হাশিয়াতে সেটি উল্লেখ করেছি-তাতে তিনি বলেন, এই হাদীসে রিদ্দত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি শুধু لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ বলে, যদি مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ যুক্ত নাও করে, তবুও তাকে হত্যা করা নিষেধ। তবে শুধু এতটুকু বলার কারণে সে কি মুসলমানও হয়ে যাবে?- এটি এখন আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে সে মুসলমান হয়ে যায়নি। তবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তারপর অনুসন্ধান করতে হবে, যদি সে তাওহীদের সাথে রিসালাতেরও সাক্ষ্য দেয় এবং শরীয়তের সকল হুকুমের পাবন্দী করা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তখন তাকে মুসলমান আখ্যায়িত করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ এর এস্তেসনা দ্বারা এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

হযরত ইমাম বগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ কাফের যদি মূর্তিপুজারী হয় অথবা দুই খোদা স্বীকারকারী হয়, তবে তো শুধু তাওহীদের কালিমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ পড়াতেই তাকে মুসলমান আখ্যায়িত করা হবে। তারপর তাকে শরীয়তের সমস্ত হুকুম মানার এবং ইসলাম ব্যতীত বাকি সব ধর্মের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হবে। আর যদি এ কাফের

তাওহীদ তথা একাত্ববাদ স্বীকারকারী হয় কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত অস্বীকার করে (যেমনটা ইহুদী-খ্রিস্টানরা করে থাকে,) তাহলে তো যতক্ষণ পর্যন্ত مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ না বলবে, তাকে মুসলমান আখ্যায়িত করা যাবে না।

আর যদি তার আকীদা এই হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো রাসূল, তবে শুধু আরববাসীর জন্য রাসূল; সবার জন্য নয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তির মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ এর সাথে اِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ (সমস্ত মাখলুকের জন্য) এ কথাও যোগ করতে হবে।

আর যদি শরীয়তের কোন ফরয অস্বীকার করার কারণে অথবা কোন হারামকে হালাল মনে করার কারণে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তাহলে তার মুসলমান হওয়ার জন্য তার এই ভ্রান্ত আকীদা থেকে তাওবা করার ঘোষণা দেওয়াও অত্যন্ত জরুরী।

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীর ১২/২৪৭ পৃষ্ঠায় বলেন, আল্লামা বগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বয়ানের মধ্যে ব্যবহৃত يُجْبَرُ শব্দের তাকাযা হচ্ছে এই যে, যদি সে শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনে নেওয়ার কথা স্বীকার না করে, তাহলে তার উপর মুরতাদের হুকুম প্রয়োগ হবে।

খারেজীদের ব্যাপারে ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর গবেষণা

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারীর ২৫২ পৃষ্ঠায় এর অধীনে খারেজীদের বিভিন্ন ফেরকা ও তাদের মতাদর্শের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর বলেন, ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ওয়াসীত্ব কিতাবে অন্যান্য উলামায়ে কিরামের অনুসরণ করতে গিয়ে বলেন, খারেজীদের হুকুমের ব্যাপারে দুটি সুরত রয়েছে। এক. তাদের ব্যাপারে মুরতাদের হুকুম লাগানো হবে। দুই. রাষ্ট্রদ্রোহী মুসলমান আখ্যায়িত করা হবে। ইমাম রাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ প্রথম সুরতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে মুরতাদ হওয়ার হুকুম প্রত্যেক খারেজীর উপর প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, খারিজীদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। এক দল হচ্ছে, যারা ইসলামী

শাসকদের সাথে বিদ্রোহ করে এবং লোকদেরকে নিজেদের বাতিল আকীদা মানতে বাধ্য করে। এ দলটির আলোচনাই পূর্বে করা হয়েছে। এ দলটি নিশ্চিত কাফের। আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে, যারা নিজেদের আকীদা মানতে কাউকে বাধ্য করে না। বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য চলমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই দ্বিতীয় দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল হচ্ছে, যাদের বিদ্রোহ করার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে দীনকে হেফাযত করার, আল্লাহ তাআলার মাখলুককে জালেম শাসকদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার জযবা ও আগ্রহ। এ দলটি আহলে হক। এদেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কারবালার শহীদ হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আন্হু, হাররাতে যুদ্ধকারী মদীনাবাসী এবং হেজাযবাসীর সাথে যুদ্ধকারীগণ। এঁদেরকে কোনভাবেই কাফের-মুরতাদ বলা যাবে না। এঁরা তো হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তার সৈনিক ও মুজাহিদ।

আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে, যারা শুধু জোশের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহ করে, চাই তাদের মধ্যে ধর্মীয় কোন গোমরাহী পাওয়া যাক বা না যাক। এরা নিশ্চিত বাগী ও রাষ্ট্রদ্রোহী।

এজমায়ে উম্মতের 'বিরোধিতাকারী কাফের ও ধর্মত্যাগী

"যেসব ফরয ও শরয়ী হুকুম অস্বীকার করার কারণে মুসলমান কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়, সেগুলো মুতাওয়াতির হওয়া জরুরী নয়, বরং সর্বসম্মত আকীদা ও আমল অস্বীকারকারীও কাফের-মুরতাদ বলে গণ্য হবে।"- এ কথাটা প্রমাণ করার জন্য হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ১২/১৭৭ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত হাদীস–

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ.

এর অধীনে التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ এর ব্যাখ্যা করার পর বলেন, ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন, الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ থেকে একথা এস্তেম্বাত হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই ব্যক্তি যে ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী। এই সুরতে উক্ত হাদীস দ্বারা সেসব লোক দলীল দিতে

পারবে, যারা এজমার বিরোধিতাকারীদেরকে কাফের বলেন। তাই তো কতক আলেমের দিকে এরূপ এস্তেদলাল করার সম্বন্ধ করা হয়। তবে এই এস্তেদলাল খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। কেননা, কতিপয় এজমায়ী (সর্বসম্মত) মাসআলাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত আছে। যেমন নামায ফরয হওয়া। কিন্তু কতক এজমায়ী মাসআলা সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে মুতাওয়াতির নয়। প্রথম প্রকার মাসআলা অস্বীকারকারী তো নিঃসন্দেহে কাফের। কারণ সে মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকারকারী এবং এজমায়ে উম্মতের বিরোধী।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার মাসআলা অস্বীকারকারী কাফের হবে না। কেননা সে তো কোন মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করেনি। তাই তো আমাদের উস্তাদ হাফেয ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শরহে তিরমিযীতে বলেন, সঠিক মত হচ্ছে এই যে, এজমা অস্বীকারকারীকে কেবল এমন এজমায়ী বিষয় অস্বীকার করার সুরতে কাফের বলা যাবে, যে বিষয়টি দীনের আবশ্যকীয় বস্তু হওয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায অস্বীকারকারী।

কতক আলেম এর চেয়েও সতর্কতাপূর্ণ বচন অবলম্বন করেছেন। তারা বলেছেন, যেই এজমায়ী বিষয়টির আবশ্যকতা মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত, সেটির অস্বীকারকারী কাফের। পৃথিবী হাদেস ও নশ্বর হওয়ার বিষয়টিও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহসহ অনেক আলেমে দীন পৃথিবী কাদীম হওয়ার আকীদা পোষণকারীর কাফের হওয়ার উপর উম্মতের এজমা বর্ণনা করেছেন।

শাইখ ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, পৃথিবী হাদেস হওয়ার মাসআলায় কতক এমন বড় ব্যক্তির পদস্খলন হয়ে গেছে, যারা উলূমে আকলিয়্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ হওয়ার দাবি করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তারা ইউনানী দর্শনের দিকে ধাবিত। তাদের ধারণা যারা পৃথিবী হাদেস হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তো শুধু এজমা অস্বীকার করা হচ্ছে। আর তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন যে, এজমা বিরোধী কাফের; তবে নিঃশর্তে নয়। বরং যে এজমায়ী মাসাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত হয়ে এসেছে, শুধু

সেটির বিরোধিতাকারী কফের। আর (এদের ধারণা অনুযায়ী) পৃথিবী হাদেস হওয়ার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত নয়।

শাইখ ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এরূপ দলীল উপস্থাপন ভ্রুক্ষেপ অযোগ্য। ঈমানী দূরদর্শিতা না থাকাই এর মূল চালিকা শক্তি। কিংবা জেনে-শুনে প্রকৃত বিষয় থেকে চোখ বন্ধ করে নেওয়াই এর মূল কারণ। কেননা, পৃথিবী হাদেস হওয়া এমন একটি আকীদা, যার ব্যাপারে উম্মতের এজমাও রয়েছে এবং সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা মুতাওয়াতিরও বটে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ১৮০ পৃষ্ঠায় এ কথার উপর আলোচনা সমাপ্ত করেছেন যে, এজমা বিরোধী ব্যক্তি اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ এর অন্তর্ভুক্ত এবং কাফের।

ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আলোচনার সারাংশ ও মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আরো দলীলসহ সতর্কতা

খারেজী ও নাস্তিকদের সম্পর্কে ইমাম বোখারীর অভিমত

আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীস ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি খারেজীদের সেসব দলকে কাফের আখ্যায়িত করার দিকে ধাবিত, যারা তাকফীরের উপযুক্ত। তাই তো তিনি স্বীয় কিতাব "খলকে আফআলে ইবাদ" এর মধ্যে স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ কছেন। এমনকি হক স্বীকার করানো ও তাওবা করানোর পরও যদি ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার পাশাপাশি হত্যা করাও ওয়াজিব বলেছেন। আর তাদের থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করানোও আবশ্যক নয়। বরং এটা তো সম্ভবই নয় যে, তাদেরকে হক কবুল করতে বাধ্য ও নিরূপায় করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এটা মানবসাধ্য বহির্ভূত বিষয় যে, কোন মানুষ কোন হক বিষয় অস্বীকারকারীর অন্তরে এমনভাবে ঈমান ও একীন সৃষ্টি করবে এবং হককে মনের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল করবে যে, এরপর আর জানা-শোনা সত্ত্বেও গোরামীবশত অস্বীকার করা ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় ও স্তর থাকবে না। যেমনটা হালকা আকলওয়ালাদের ধারণা ও দাবি। যারা আয়িম্মায়ে দীনের মতামত ও কিতাবসমূহের ইলম ও অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত। তাদের এই ধারণার মূলভিত্তি ও উৎস হচ্ছে বর্তমান যুগের প্রচলিত স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মুক্তমনা ভাব এবং যৌক্তিক ভাল-মন্দ।

অথচ মুরতাদের ব্যাপারে চারো মাযহাবের আলেমগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মুরতাদকে তাওবা করানো হবে। তার সংশয়-সন্দেহ দূর করা হবে। অর্থাৎ তাদের সামনে এমন সব দলীল-প্রমাণ পেশ করা হবে, যা তাদের সংশয়-সন্দেহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হয়। এমনটি নয় যে, সে ইচ্ছে করুক বা না করুক, তার অন্তরে হকের একীন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে তা মানতে বাধ্য করা হবে। এরপরও যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তাকে কাফের হওয়ার ভিত্তিতে হত্যা করে দেওয়া হবে।

শাইখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাসায়ারা কিতাবের ২০৮ নং পৃষ্ঠায় যেসব অকাট্য বিষয় মুতাওয়াতির নয়, সেগুলো অস্বীকার করার ব্যাপারে বলেছেন, "তবে আলেমগণ অস্বীকারকারী ঐ লোকটিকে বুঝাবে এবং বলবে,

এটি দীনের নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়। এরপরও যদি সে তার অস্বীকারের উপর অটল থাকে, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করে হত্যা করে দেওয়া জায়েয আছে।

হামাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, "আল-জামউ ওয়াল ফারকু" কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এবং আল-বাহরুর রায়েক কিতাবে ফেরকায়ে জাহেলার তালীমের অধীনে ইমাম আবু ইউসূফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার ১/২৬৯ পৃষ্ঠায় নামাযসংক্রান্ত যে মন্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে, এই সবগুলো উক্তি দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে, অস্বীকারকারী প্রতিপক্ষের নিকট দলীলাদি বর্ণনা করে দেওয়া এবং তার সংশয়-সন্দেহ দূর করে দেওয়াই যথেষ্ট। তার দিলে হককে ঢুকিয়ে দেওয়া এবং হক স্বীকার করানো আবশ্যক নয় বরং এটাতো মানব সাধ্যের বাইরে।

এখন আপনি সহীহ বোখারীর শিরোনাম সামনে নিয়ে দেখেন যে, আমরা ইমাম বোখারীর রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ধাবিত হওয়ার কথা দাবি করেছি, তা কতটাই সুস্পষ্ট। সহীহ বোখারিতে ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

بَاب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ.

এই অধ্যায় খারেজী ও নাস্তিকদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার বর্ণনা এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে তার প্রমাণ থাকা সম্পর্কে- আল্লাহ তাআলার শান নয় যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হেদয়াত দেওয়ার পর গোমরাহ করে দিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহী থেকে বাঁচার পথ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে না দিবেন।

তারপর তিনি যেসব ওযর-আপত্তির কারণে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা হবে, সেগুলো বর্ণনা করার জন্য অন্য একটি অধ্যায় কায়েম করেন এবং বলেন–

بَاب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং মানুষ যেন ইসলাম থেকে সরে না যায় এ লক্ষ্যে খারেজীদেরকে হত্যা করা ত্যাগ করার বর্ণনা সম্পর্কে এই অধ্যায়।

তারপর ১০২৫ পৃষ্ঠায় তাবীল সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি অধ্যায়ে কায়েম করেন এবং বলেন, بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ (তাবীলকারীদের সম্পর্কে বর্ণনার অধ্যায়।)

এ কথা স্পষ্ট যে, এখানে তাবীলকারী বলতে খারেজীদের মত তাবীলকারী উদ্দেশ্য নয়। কেননা, খারেজীদের সম্পর্কে তো পূর্বেই অধ্যায় কায়েম করছেন।

ফাতহুল বারীর রচিতার ভাষায়- এখানে সেসব তাবীল উদ্দেশ্য, আরবদের ভাষায় যেগুলোর অবকাশ আছে এবং ইলমে দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা বৈধ হওয়ার কারণও রয়েছে।

তাই তো হাফেয ইবনে হাজার আসাকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর সুযোগ্য শাগরেদ শাইখুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আনসারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বোখারী শরীফের শরাহ তুহফাতুল বারীতে বলেন,

وَلَا خِلَافَ اَنَّ الْمُتَأَوِّلَ مَعْذُورٌ بِتَاوِيلِه اذا كَانَ تَاوِيلُه سَائِغًا

এ ব্যাপারে কোন মতোবেধ নেই যে, তাবীলকারীকে তার তাবীলের ব্যাপারে মাযুর মনে করা হবে, যদি আরবদের ভাষায় এমন তাবীল করা সুযোগ থাকে।

বিধায় বুঝা গেল, বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এ 'তাবীল' দ্বারা মতলক তাবীল উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শুধু তাবীল তাবীলকারীকে হত্যা থেকে বাঁচাতে পারে না। এমনকি কুফর থেকেও বাঁচাতে পারে না।

যে কোন অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা কুফরী

যে কোন কেতয়ী (অকাট্য ও নিশ্চিত) বিষয় অস্বীকার করা কুফরী। এর জন্য এটাও শর্ত নয় যে, সে বিষয়টির অকাট্যতা সম্পর্কে জেনে অস্বীকার করতে হবে, আর কেবল তখন সে কাফের হবে। যেমন ধারণা করে কিছু ধারণাপূজারী লোক। বরং বিষয়টি বাস্তবে অকাট্য হওয়া শর্ত। এরকম বাস্তবিক অকাট্য বিষয় যে ব্যক্তিই অস্বীকার করবে, তাকে তাওবা করতে বলা

হবে। যদি তাওবা করে তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় কাফের হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে। কবির ভাষায়-

وَلَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبٌ

মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ও তাঁকে ভয় করা ছাড়া কোন উপায় ও পথ নেই ।

কাফের হওয়ার জন্য ধর্ম পরিবর্তনের ইচ্ছা করা শর্ত নয়

হাফেয ইবনে হাজার আসাকালনী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উল্লিখিত বয়ান সেসব লোকের মতকেও খণ্ডন করে দেয়, যারা বলে, ইসলামে দিক্ষিত হওয়া এবং মুসলমান বলার পর কোন আহলে কেবলা মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জেনে-শুনে ধর্ম পরিবর্তন বা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা না করবে।

হাফেয ইবনে হাজার আসাকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ১২/২৬৭ পৃষ্ঠায় ইমাম তবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর যে বয়ান উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে, এমনিভাবে ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বয়ানের শেষাংশ থেকেও এই অনুসন্ধান ও মিমাংসা বের হয়ে আসে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিম্নোক্ত আলোচনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, গালমন্দ ও কটূক্তি ছাড়াও যেমন মুরতাদ হওয়া পাওয়া যায়, তেমনিভাবে ধর্ম পরিবর্তনের সংকল্প ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা ছাড়াও কাফের ও মুরতাদ হওয়া পাওয়া যায়। যেমন ইবলীস আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত অস্বীকার করার সংকল্প করা ছাড়াই (শুধু আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে অস্বীকার ও অহংকার করার কারণে) কাফের হয়ে গেছে। কুফরী কথা বলনেওয়ালার কাফের হওয়ার জন্য যেমন কুফরের এরাদা করার কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ এই ব্যক্তিরও মুরতাদ হওয়ার জন্য ধর্ম পরিবর্তনের এরাদা করার প্রয়োজন নেই।

এরপর তিনি বলেন, তাছাড়া এই ব্যক্তি শুধু আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করার বিষয়টিই প্রকাশ করেনি যে, এই আকীদা থেকে ফিরে এসে তাওবা করার

দ্বারা জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে এবং মুরতাদ হওয়ার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বরং সে দীন কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে । আর মুখে মুরতাদ হওয়ার কথা বলা আকীদা পরিবর্তন হওয়ার জন্য লাযেমও তো নয় যে, এ কথার হুকুম আকীদা পরিবর্তনের হুকুমের মত হবে।

একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন, (যার সারাংশ হচ্ছে-) যদি মুখে কুফরী বা মুরতাদ হওয়ার মত কথা বলনে ওয়ালার কাফের/মুরতাদ হওয়ার হুকুম লাগানোর জন্য ধর্ম পরিবর্তনের এরাদা করাকে গ্রহণযোগ্য শর্ত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে একটি বিশাল বড় কুফর তথা দীনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার দরজা খুলে যাবে। সেই সাথে মুখে কুফরী কথা বলার ভয়ভীতি অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উক্ত তাহকীক (গবেষণা) উদ্ধৃত করার পর হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই ফায়সালা সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উল্লিখিত হাদীসে مروق শব্দের উদ্দেশ্য এটাই যে, সে দীন থেকে বের হয়ে যাবে কিন্তু সে টেরও পাবে না। শব্দটির শাব্দিক অর্থের তাকাযা ও হকও এটাই।

তারপর বলেন, আর যেসব লোক কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে ধর্ম পরিবর্তনের এরাদাকে ধর্তব্য করার পক্ষে, তারা এ কথারও পক্ষে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের লোকও যদি মুআনিদ (প্রতিরোধকারী) না হয়, তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। (কারণ সে ইসলামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার ইচ্ছা করেনি।) কতক আলেমের দিকেও এ কথার সমন্ধ করা হয়। অথচ আবু বকর বাকিল্লানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এটি সম্পূর্ণ কুফরী উক্তি। যেমন কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ শিফা কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা এরাদা করার শর্ত দেন, যদি তাদের দলীল সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়েও যায়, তাহলেও নিঃসন্দেহে সেটি ব্যাপক হবে এবং সেসব লোকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, যারা মুআনিদ নয়, চাই তারা মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক। (অথচ এটা নিশ্চিত ভুল ও বাতিল।)

খারেজীদের ব্যাপারে মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ফায়সালা

যারা খারেজীদেরকে কাফের বলার পক্ষে নয়, অথচ তারাই আবার খারেজীদেরকে "কাফের" ও "কাফের নয়" এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। সেই সাথে আবার তা শক্তিশালী করার জন্য ওয়াসীত কিতাব থেকে ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বয়ান উদ্ধৃত করেন। ফলে এটা প্রমাণ হয় যে, যদিও হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ খারেজীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার পক্ষে নন, তবুও তিনি কাফের আখ্যায়িত না করার দলীলসমূহের জবাব দিচ্ছেন।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিজেই ফায়সালা দিচ্ছেন যে, সঠিক বিষয় হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার না করে, তাকে কাফের বলা যবে না । একইভাবে এটাও হক যে, يمرقون শব্দবিশিষ্ট হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে দলটি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ টেরও পায় না, তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরের অধিক নিকটবর্তী। আর তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার মাসআলা সম্পর্কে আমি সুনানে ইবনে মাজাতে হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি সুস্পষ্ট রেওয়ায়াত পেয়েছি। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا.

'এ সব লোক মুসলমান ছিল, তারপর কাফের হয়ে গেছে।'

হাদীসটির বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি আপনার মত? তিনি জবাব দিলেন, না আমার মত নয়। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই শুনেছি।

হযরত হাফেয মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ "ঈসারুল হক" কিতাবের ৪২১ পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহও এই রেওয়ায়াতের সংক্ষিপ্তরূপ বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন।

ইমাম তাহতাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহসহ কতিপয় ফকীহ ইমামতির মাসআলার আলোচনার

অধীনে বলেছেন, খারেজী হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাসমূহ থেকে খারেজ এবং মুনকির। (মুতাযিলা ও শিয়াসহ সমস্ত বাতিল ফেরকা এদের অন্তর্ভুক্ত।)

খারেজীদের মেসদাকের পরিধির ব্যাপকতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইমাম নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহ হযরত আবু বুরযা আসলামী রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সদকার কিছু মাল আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলি বন্টন করে দেন। তারপর (ইবনে যুল খুওয়াইসারার আপত্তির প্রেক্ষিতে) বলেন, শেষ যমানায় একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, মনে হচ্ছে এই লোকটিও তাদের একজন। তারা কুরআন পাক তেলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। সর্বশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ধারাবাহিকভাবে এদের আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। এমনকি এদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির আবির্ভাব ঘটবে দাজ্জালের সাথে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলূল কিতাবের ১৭৭ ও ১৭৮ নং পৃষ্ঠায় খারেজীদের কাফের হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সেখানে তিনি সে সব দলীল ও আপত্তির জবাব দিয়েছেন, যেগুলো এ বিষয়ে তুলে ধরা হয়ে থাকে। এমনকি পনের নম্বর হাদীসেরও জবাব দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন, কানযুল উম্মালের ২/৬৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসতাদরাকে হাকেমের ৪/৪৮ পৃষ্ঠায় আবু বুরযাহ আসলামী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর উল্লিখিত বর্ণনার শাহেদ রয়েছে।

বর্তমান যুগের নাস্তিক-মুরতাদদের কাফের আখ্যায়িত করার প্রয়োজনীয়তা

"হিন্দু-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অধিক।" এটি ইবনে হুবাইরা রহমাতুল্লাহি আলাইহর বয়ান। মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমার মতে ঠিক একইভাবে বর্তমান যুগের অমুসলিমদের তুলনায় নাস্তিক-মুরতাদ ও কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যাকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

কেননা, অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে মানুষ প্রকৃত দীন মনে করে। যেমন অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীরা তার অপব্যাখ্যাকেই প্রকৃত দীন মনে করছে। কিন্তু প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতাকারী এর বিপরীত। কারণ, তার বিরোধিতা সম্পর্কে সবাই জানে। বিধায় কেউ ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে কৃত তাবীল শ্রবণযোগ্য নয়

হযরত ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইতিপূর্বে ২/১০২৩ পৃষ্ঠায় কতক জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করার ফলে কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি বাব (অধ্যায়) প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেটির ভাষ্য নিম্নরূপ-

بَاب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ.

> এ অধ্যায় সে সব লোককে হত্যা করা সম্পর্কে, যারা জরুরিয়াতে দীন মানতে অস্বীকার করে এবং মুরতাদ বলে আখ্যা পায়।

তিনি এ অধ্যায়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক ঐ সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ করার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছে, অর্থাৎ নামায মেনে নিয়েছে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। তবে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন। অথচ তারাও তাবীল করে ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে তাবীল করা কুফরী থেকে বাঁচাতে পারে না। বেশীর চেয়ে বেশী তাতে এতটুকু সুযোগ বের করা যেতে পারে যে, তাদেরকে জাহেল ও মাযুর ধরা হবে। তাই তাদেরকে তাওবা করানো হবে। যদি তাওবা করে তো ভাল কথা। অন্যথায় হত্যা করে দেওয়া হবে।[৩৩]

তাওবা করানো একরাহ বা জবরদস্তী?

এই তাওবা করানোটা ঐ একরাহ বা জোর-জবরদস্তী নয়, যেটা যুক্তি ও শরীয়ত উভয় দিক থেকে নিন্দনীয়। বরং এটাতো সেই হক গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যেটার হক হওয়ার বিষয়টি সূর্যের চেয়ে সুস্পষ্ট। এটা তো শুধু

---

[৩৩] 'অন্যথায় হত্যা করে দেওয়া হবে' এ হুকুমটি তখনই কার্যকর হবে যখন দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

পথপ্রদর্শন ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা। সেই জোর-জবরদস্তি নিন্দনীয় যা কোন গর্হিত ও মন্দ কাজের ব্যাপারে করা হয়। কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাফসীরে আহকামুল কুরআনের মধ্যে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ এর ব্যাখ্যায় বলেন–

> اَلْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : (لَا إِكْرَاهَ) عُمُومٌ فِي نَفْيِ إِكْرَاهِ الْبَاطِلِ فَأَمَّا الْإِكْرَاهُ بِالْحَقِّ فَإِنَّهُ مِنْ الدِّينِ ؛ وَهَلْ يُقْتَلُ الْكَافِرُ إِلَّا عَلَى الدِّينِ؛ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.

দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জোর-জবরদস্তি, যেটা বাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু হকের ব্যাপারে একরাহ করা তো মূল দীন। কাফেরকে তো কেবল দীন কবুল না করার কারণেই হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি মানুষের সাথে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ না তারা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত কথাটির উৎস হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত ফেতনা (শিরক) নিঃশেষ না হয় এবং আনুগত্য কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই না হয়।[৩১]

সূরায়ে মুমতাহিনার তাফসীরে এই তাহকীকের পুনরাবৃত্তি ও সমর্থনে তিনি বলেন–

وَفِي الصَّحِيحِ : عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ.

---

[৩১] সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৩

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রভূ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্য হোন, যাকে বেড়ি পড়িয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, তাহকীকী কথা হচ্ছে এই যে, যেসব হক বিষয় হক হওয়ার ব্যাপারে স্বতসিদ্ধ, সেগুলো গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে, তা একরাহ এর মধ্যে পড়েই না। আল্লামা আলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহও রুহুল মাআনী কিতাবে এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই আলোচনা সমাপ্ত করতে গিয়ে বলেন, সাধারণত এই মাসআলা গবেষণাকারীদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যদিও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উল্লিখিত তাহকীক তাদের যথাযথভাবে মূলৎপাটন করে দিয়েছে এবং তাদের সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু চশমপুশী পছন্দকারী লোক কখন আবার ভাল বিষয় মেনে নিয়েছে? তারা শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর ঘোড়া দৌড়িয়ে থাকে এবং নফসের ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকে। হেদায়াতদানকারী তো কেবল আল্লাহ তাআলাই। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন, তাকে কে হেদায়াত দিতে পারে?

ایں سعادت بزور بازو نیست

تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত নয়,

প্রভু দান করলেই কেবল অর্জিত হয়।

অস্বীকারকারীরা তো নূরে ইলাহীর বাতি নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তাঁর নূর (দীন) পরিপূর্ণকারী।

কুফরী আকীদা পোষণকারী যিন্দীকদের ব্যাপারে চার ইমামসহ অন্যান্য ইমাম যথা ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম বুখারী প্রমুখ ইমামগণের বাণী ও অভিমত

কুফরী আকীদা পোষণকারী যিন্দীক হত্যারযোগ্য তাদের তাওবাও গ্রহণযোগ্য নয়

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

এক. আল্লামা আবু বকর রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আহকামুল কুরআন' এর ১/৫৩ পৃষ্ঠায় এবং হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'উমদাতুল কারী'র ১/২১২ পৃষ্ঠায় ইমাম ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে সুলাইমান ইবনে শুআইব এর সনদে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান ইবনে শুআইব বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বর্ণনাটিকে 'নাওয়াদির' এর অধীনে স্বীয় রচনার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

> ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন, অপ্রকাশ্য যিন্দীককে (যে নিজের কুফরি গোপন করে) হত্যা করে দাও। কেননা, তার তাওবার ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। (তার মুখের কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।)

দুই. আবু মুসআব রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন–

> কোনো মুসলমান যখন জাদুকে পেশারূপে গ্রহণ করবে, তখন তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে এবং তা থেকে তাওবাও করানো হবে না। কেননা, কোনো মুসলমান যখন বাতেনীভাবে মুরতাদ হয়ে যায়, (ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিকট যার প্রামাণ্যতা জাদু-কর্ম) কেবল মৌখিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করার দ্বারা তার তাওবার ব্যাপারে সঠিক কিছু জানা যায় না।[৩২]

---

[৩২]. আহকামুল কুরআন : ১১/৫১

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুরতাদের ব্যাপারে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর এই ফায়সালা (যে, মুরতাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়) 'মুয়াত্তা'য় بَابُ الْقَضَاءِ فِىْ مَنْ اِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ এ-ও বর্ণিত আছে।

তিন. আল্লামা আবু বকর রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামুল কুরআন' এর ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

> যিন্দীকদের তাওবা গ্রহণ না করার ব্যাপারে আইম্মায়ে দীনের ফায়সালার দাবি হচ্ছে এই যে, অন্যান্য সমস্ত যিন্দীকদের মতো ইসমাঈলিয়্যা সম্প্রদায় ও ওই সকল যিন্দীক ফেরকাকেও তাওবা করানো হবে না, যাদের কুফরী আকীদা সকলেরই জানা ও প্রসিদ্ধ। তারা তাওবার দাবি করা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে।[৩৩]

আল্লামা আবু বকর রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামুল কুরআন' এর ২/২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠায় এ মাসআলাটিকে রেওয়ায়াত ও দেরায়াত এর আলোকে এর চেয়েও বেশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এমন যিন্দীকদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, তাদেরকে সম্মান দেওয়া জায়েয হবে না এবং তাদের সঙ্গে সালাম-কালাম করাও ঠিক নয়। তাদের জানাযা পড়া যাবে না, তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না, তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না।

উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' এর ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–

> হিশাম ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মু'তাযিলার পিছনে নামায আদায় করবে, তার নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। এই হিশাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ই ইয়াহইয়া ইবনে

---

৩৩. 'হত্যা করে দেওয়া হবে' এ হুকুমটি তখনই কার্যকর হবে যখন দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

আকছাম এর বরাতে ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলেন, তারা তো যিন্দীক। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহও 'কিতাবুল কিয়াস'-এ মু'তাযিলাসহ অন্যান্য গোমরা ফেরকাসমূহের সাক্ষ্য গ্রহণ করার অভিমত থেকে রুজআত করেছেন। (অর্থাৎ ইতিপূর্বে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ সাধারণত গোমরা ফেরকাসমূহের সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু 'কিতাবুল কিয়াস'-এ তিনি তা থেকে ফিরে এসেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর বিস্তারিত বয়ান সামনে আসছে।) ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ও মদীনার ফুকাহায়ে কেরামেরও অভিমত এই-ই (যে, গোমরাহ ফেরকাসমূহের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।)

উস্তাদ আবু মানসুর রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, আইম্মায়ে ইসলাম কৃদরিয়া (মু'তাযিলা)দেরকে কাফের বলার পরও তাদের সম্মানার্থে সওয়ারী বা বাহন থেকে অবতরণ করা কীভাবে সহীহ্ হতে পারে?

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'কিতাবুল উলূয়্যি'তেও এ কথাই লিখেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'কিতাবুল উম্ম' এর ৬/২১০ পৃষ্ঠায় প্রবৃত্তিপূজারীদের (গোমরাহ ফেরকাসমূহের) সাক্ষ্যগ্রহণ করার ব্যাপারে বলেন–

আমি এমন কোনো তাবীলকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করি না, যার তাবীলের ব্যাপারে অবকাশ বিদ্যমান আছে।

'আল-ইয়াওয়াকীত'-এ মাখযূমী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এ অভিমতটি ওই সকল গোমরা ফেরকার সাক্ষ্যের ব্যাপারে প্রদান করেছেন, যাদের তাবীলের ব্যাপারে (আরবী ভাষার দিক থেকে) অবকাশ বিদ্যমান থাকবে।

'আল ফারকু বাইনাল ফিরাক' এর ৩৫১ পৃষ্ঠায় উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন–

হিশাম ইবনে উবাইদুল্লাহ্ রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো ইমামের পিছনে নামায আদায় করবে, যে কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট হওয়ার দাবি করে, তার নামায পুনরায় পড়তে হবে।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, এ তো হল নামায পুনরায় পড়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর ফতোয়া। 'ফাতহুল ক্বদীর'-এ 'বাবুল ইমামত' এর অধীনে স্বয়ং ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রবৃত্তিপূজারীদের (গোমরাহ্ ফেরকাসমূহের) পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই।

মুতাআখ্খিরীন সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও ওসিয়ত

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, 'আল ফারকু বাইনাল ফিরাক' এর ১৫ পৃষ্ঠায় এবং 'আকীদায়ে সাফারীনী'র ১/২৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

মুতাআখ্খিরীন সাহাবায়ে কেরাম –যাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী আউফা, উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযিয়াল্লাহু আন্হুম অন্তর্ভুক্ত– এবং তাঁদের সমকালীনগণ প্রবৃত্তিপূজারীদের (গোমরা ফেরকাসমূহ) ব্যাপারে নিজেদের অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেছেন এবং আগত প্রজন্মকে ওসিয়ত করেছেন যে, ক্বদরিয়া (মু'তাযিলা)দের না সালাম দিবে, না তাদের জানাযার নামায পড়বে আর না তাদের অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। (কেননা, তারা ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত ও কাফের।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, তারপর 'আল ফারকু বাইনাল ফিরাক' এর লেখক রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ সুবিস্তারিতভাবে সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে মারফু রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

যে কোনো শরয়ী হুকুম অস্বীকার করা
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে প্রত্যাখ্যান করার শামিল

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'সিয়ারে কাবীর' এর ৪/২৬৫ পৃষ্ঠায় ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমত বর্ণিত আছে–

যে ব্যক্তি শরীয়তের কোনো (অকাট্য) হুকুমকে অস্বীকার করে, সে তার মুখে বলা কথা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে প্রত্যাখ্যান করে।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'খালকে আফ্‌আলে ইবাদ'-এ বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেছেন–

أَبْلِغْ اَبَا فُلَانِ الْمُشْرِكَ فَاِنِّىْ بَرِئٌ مِنْ دِيْنِهٖ وَكَانَ يَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ.

তুমি অমুকের পিতা মুশরিককে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দাও যে, তার দীন-ধর্মের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; আমি তার থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কেননা, এই অমুকের পিতা কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলে মানত।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলবে, সে কাফের।

আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ مَنْ قَالَ اِنَّهٗ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ لَا يُصَلّٰى خَلْفَهٗ.

কুরআনে করীম আল্লাহ তাআলার কালাম। যে ব্যক্তি তাকে মাখলুক বলবে, সে কাফের। তার পিছনে নামায আদায় করা জায়েয নেই।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

نَظَرْتُ فِىْ كَلَامِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَمَا رَأَيْتُ اَضَلَّ فِىْ كُفْرِهِمْ مِنْهُمْ وَاَنِّىْ لَاَسْتَجْهِلُ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُمْ اِلَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ كُفْرَهُمْ.

আমি ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অগ্নিপূজকদের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলে বিশ্বাসকারীরা ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক সকলের চেয়ে বেশি গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। আর আমি সুনিশ্চিতভাবে ওই ব্যক্তিকে মূর্খ মনে করি, যে তাদেরকে কাফের মনে করে না; তবে ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তাদের কুফরির ব্যাপারে অবগত না।

যুহাইর সাখতিয়ানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন,

سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ مُطِيْعٍ يَقُوْلُ اَلْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ.

আমি সালাম ইবনে মুতী' রহমাতুল্লাহি আলাইহকে বলতে শুনেছি যে, জাহ্‌মিয়া (সম্প্রদায়) কাফের।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন,

مَا اُبَالِيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ وَالرَّافِضِيِّ اَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعَادُوْنَ وَلَا يُنَاكَحُوْنَ وَلَا يُشْهَدُوْنَ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ.

একজন জাহ্‌মী কিংবা একজন রাফেযীর পিছনে নামায পড়া আর কোনো ইহুদী কিংবা নাসারার পিছনে নামায পড়ার মাঝে আমি কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করি না। (কেননা, এই উভয় সম্প্রদায়ই ইহুদী খ্রিস্টানদের ন্যায় কাফের। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে।) তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, তাদের অসুস্থদের শুশ্রূষা করা হবে না। তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্য 'আল আসমা ওয়াস-সিফাত' নামক কিতাবেও বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাষ্যটিকে হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় ফতোয়াসমূহের মধ্যেও উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুল উলুয়্যি'তে নিম্নবর্ণিত সনদে ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

> وَقَالَ اِبْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكَرَاعِىْ قَالَ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفُ : نَاظَرْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ فَاتَّفَقَ رَاْيُنَا عَلَى اَنَّ مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.
>
> ...ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি পূর্ণ ছয় মাস ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে বিতর্ক করেছি। অতঃপর আমরা উভয়ে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে, সে কাফের।

এই 'কিতাবুল উলুয়্যি'তে ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে। কিতাবের লেখক বলেন, আহমাদ ইবনে কাসেম ইবনে আতিয়্যা বলেছেন যে, আবু সুলাইমান জুযজানী বলেছেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছ থেকে শুনেছি; তিনি বলতেন–

> وَاللهِ! لَا اُصَلِّىْ خَلْفَ مَنْ يَّقُوْلُ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ وَلَا استفتى اِلَّا اَمَرْتُ بِالْاِعَادَةِ.
>
> আল্লাহর কসম! আমি এমন ব্যক্তির পিছনে কখনোই নামায পড়ব না, যে কুরআনকে মাখলুক বলে। আর যদি আমার কাছে ফতোয়া চাওয়া হয়, তা হলে আমি নামাযকে পুনরায় পড়ার আদেশ দিব।

সতর্কীকরণ

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ সকল আইম্মায়ে কেরামের নিকট কুরআনকে মাখলুক বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনকে না আল্লাহর সিফাত তথা গুণ মনে করা হবে, আর না তাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করা হবে, বরং আল্লাহ তাআলা থেকে পৃথক সম্পূর্ণ আলাদা একটি সৃষ্ট বস্তু বলে সাব্যস্ত করা হবে। (তা হলে এটা কুফরি এবং এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তি কাফের।)

কেননা, কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম; অন্যান্য সিফাত ও গুণের ন্যায় এটিও তাঁর একটি সিফাত এবং তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর যাবতীয় সিফাত ক্বদীম তথা অনাদি-অনন্ত, তেমনিভাবে কুরআনে করীমও ক্বদীম তথা অনাদি ও অনন্ত। তবে হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এ কুরআন নাযিল হওয়া এবং তিনি এটিকে যবানে উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহে হাদেস ও মাখলুক। অতএব, কালামে লফযী (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক থেকে বের হওয়া শব্দমালা ও তার অংশ) হাদেস ও মাখলুক হওয়া তার পরিপন্থী নয়।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়টিকে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসায়ারা'র ২১৪ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ] (গোমরাহ ফেরকা জাহ্‌মিয়ার প্রতিষ্ঠাতা) জাহ্‌ম ইবনে সফওয়ানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, أُخْرُجْ عَنِّى يَا كَافِرُ (হে কাফের! তুমি আমার সামনে থেকে বেড়িয়ে যাও।)

এমনিভাবে হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রেসালায়ে তাসয়িনিয়্যা'য় ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বরাতে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (কোনো এক সময়) বলেছিলেন, لَعَنَ اللهُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (আল্লাহ তাআলা আমর ইবনে উবাইদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।)

শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসায়ারা'য় বলেন, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ জাহ্‌ম ইবনে সফওয়ানকে কাফের (অথবা আমর ইবনে উবাইদকে অভিশপ্ত) বলেছেন তাবীল হিসাবে। (অর্থাৎ তিরস্কার ও ধমকি হিসাবে কাফের অথবা অভিশপ্ত বলেছেন। এমন নয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মতে জাহ্‌ম ইবনে সফওয়ান ইসলাম

থেকে বের হয়ে গেছে এবং সে কাফের। এমনিভাবে আমর ইবনে উবাইদের বিষয়টিও তেমনই।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর এই অভিমতের সঙ্গে বিরূপ মত পোষণ করেন এবং বলেন, আমাদের ধারণায় এ অভিমতটি সঠিক বলে মনে হয় না। এটা কীভাবে সম্ভব যে, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন মুসলমানকে কাফের বলে ফেলবেন। অথচ পবিত্র হাদীসে কোনো মুসলমানকে কাফের বলার ব্যাপারে কঠোর ধমকি বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এটা ইমাম সাহেবের শানের সম্পূর্ণ খেলাফ যে, জাহ্ম ইবনে সফওয়ান তাঁর নিকট কাফের না হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে কাফের বলে দিবেন।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি সুলাইমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হারেছ ইবনে ইদ্‌রীস রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সনদে ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটি রেওয়ায়াত শুনেছি যে, ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন–

مَنْ قَالَ اِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوْقٌ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهٗ.

যে কুরআনকে মাখলুক বলে, তুমি তার পিছনে নামায পড়ো না। (সে মুসলমান নয়।)

স্বয়ং ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম দাক্কাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাবে মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটি রেওয়ায়েত এই সনদে পড়েছি যে, কাসেম ইবনে আবু সালেহ আল হামদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আবু আইয়ুব রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে, তাতে মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমি ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করেছি, أَكَانَ اَبُوْحَنِيْفَةَ يَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ؟ (আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলতেন?) ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, مَعَاذَ اللّٰهِ! وَلَا اَنَا اَقُوْلُهٗ. 'আল্লাহর পানাহ!

(আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ কুরআনকে মাখলুক মানেন না) আর আমিও কুরআনকে মাখলুক বলে মানি না।

মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমি আবার প্রশ্ন করলাম, أَكَانَ يَرٰى رَأىَ جَهْمٍ؟ 'আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ কি জাহ্‌মী আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন? ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবারও বলে উঠলেন, مَعَاذَ اللهِ! وَلَا اَنَا اَقُوْلُهُ. 'আল্লাহর পানাহ! (তিনি জাহ্‌ম-কে কাফের বলেন।) আর আমিও জাহ্‌মী আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই রেওয়ায়াতের সমস্ত রাবী [বর্ণনাকারীগণ] নির্ভরযোগ্য।

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমাকে আবু আব্দুল্লাহ আল হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিম্নবর্ণিত সনদে

قال انا ابو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى قال ثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكى قال : سمعت ابا يعقوب سمعت ابا يوسف القاضى

বলেছেন যে, ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন–

كَلَّمْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ سَنَةَ جرداء فِىْ اَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوْقٌ اَمْ لَا؟ فَاتَّفَقَ رَأْيُهُ وَرَأْيِىْ عَلَى اَنَّ مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত আমি ও ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই মাসআলার ব্যাপারে বিতর্ক করেছি যে, কুরআনে করীম মাখলুক কি না? অবশেষে আমরা উভয়ে ঐকমত্যে পৌছেছি যে, যে কেউ-ই কুরআনকে মাখলুক বলবে, সে কাফের।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শিফা' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনে মুনযির রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে

বর্ণনা করেন, لَا يُسْتَتَابُ الْقَدَرِيَّةُ (ক্বদরিয়া {মু'তাযিলা}কে তাওবা করানো হবে না ।) এবং পূর্বসূরী অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম 'ক্বদরিয়াদের' কাফের বলেন ।

কুফরী আকীদা পোষণকারী সমস্ত ফেরকা, যদিও ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে এবং তারা কুরআন-হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে, তবুও তারা কাফের; উম্মতের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শিফা' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনে মুবারক, আউদী, ওকী, হাফ্স ইবনে গিয়াস, আবু ইসহাক ফাযারী, হুশাইম, আলী ইবনে আসেমসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম ও মুতাকাল্লিমীন– ক্বদরিয়া, খারেজীসহ গোমরাহ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী সমস্ত ফেরকা ও মনগড়া বাতিল তাবীলকারী যিন্দীকদেরকে কাফের বলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অভিমতও এটিই ।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আল ফারকু বাইনাল ফিরাক' এর লেখক উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'আল আসমা ওয়াস-সিফাত' এ غالى (সীমালঙ্ঘনকারী) বিদআতীদের কুফরির ব্যাপারে সুবিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমনটি 'শরহে এহ্ইয়া' এর ২/২৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ।

সতর্কীকরণ

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি সতর্ক করে দিচ্ছেন : প্রকাশ থাকে যে, বিদআত এবং প্রবৃত্তিপূজা ওই গোমরাহীকে বলে, যার ভিত্তি কোনো না কোনো -সন্দেহের উপর হয়ে থাকে। (অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআত এবং গোমরাহীর ভিত্তি কোনো না কোনো শোবা-সন্দেহ এবং তাবীলের উপর হয়ে থাকে ।) এ জন্য এ সকল আইম্মায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিমীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো তাবীল তাবীলকারীকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারে না। (অর্থাৎ তাবীলকারী তাবীল করা সত্ত্বেও কাফের ।)

সুন্নাত বিদআতের পার্থক্য ও মানদণ্ড

মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনে ওজীর আল ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ (এর নিম্নবর্ণিত বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি) 'ইছারুল হক' নামক গ্রন্থের ৩২১ পৃষ্ঠায় বলেন–

> নিঃসন্দেহে সুন্নাত তাকেই বলে, যার প্রামাণ্যতা পূর্বসূরী আইম্মায়ে কেরাম থেকে প্রসিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছে এবং শরীয়তের নস্‌রূপে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি এটি সুন্নাতের মানদণ্ড না হয়, তা হলে সমস্ত বিদআত (এবং গোমরাহী) সুন্নাতের ভিতর এসে যাবে। কেননা, প্রত্যেক বিদআতী (এবং ধর্মদ্রোহীই) নিজের বিদআত (ও ধর্মদ্রোহিতা)-র প্রমাণ কুরআন-হাদীসের কোনো 'আম' কিংবা 'মুহতামাল নস্‌' থেকে অথবা কুরআন-হাদীসের নস থেকে ইস্তিম্বাত করে পেশ করে থাকে।

সুনিশ্চিতভাবে ও অকাট্যরূপে প্রমাণিত ইসলামের রুকন এবং আল্লাহ তাআলার কোনো নাম কিংবা গুণের (নতুন) কোনো তাফসীরও গ্রহণযোগ্য নয়

এই মুহাক্কিকই [অর্থাৎ মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনে ওজীর আল ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ] (ওই একই কিতাব 'ইছারুল হক' এর ১৫৫ পৃষ্ঠায়) বলেন,

> অন্যান্য তাফসীরের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের অকাট্যরূপে প্রমাণিত রুকন এবং আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের তাফসীরেরও অনুমতি প্রদান করি না। কেননা, সেগুলো একেবারেই স্পষ্ট। সেগুলোর উদ্দেশ্য এবং সেগুলো দ্বারা কী বোঝানো উদ্দেশ্য তা, (উম্মতের নিকট) সুনির্দিষ্ট। (সকল মুসলমানই জানে এবং বুঝে।) সেগুলোর তাফসীর কেবল ওই গোমরাহ লোকেরাই করে, যারা এতে বিকৃতি ঘটাতে চায়। যেমন, অপ্রকাশ্য ধর্মদ্রোহী।[৩৪]

---

[৩৪] অথবা যেমন, আমাদের বর্তমান যামানার ধর্মদ্রোহী। যারা কুরআনের আয়াতের এমন নতুন ও মনগড়া অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, যা উম্মত কখনোও শোনেনি।

গোমরাহ্ ফেরকা কোন ধরনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে?

মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনে ওজীর আল ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'ইছারুল হক' গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় বলেন–

> এটাই কারণ যে, তোমরা এ ধরনের 'আম' কিংবা 'মুহতামাল' আয়াত ও হাদীস দ্বারা অধিকাংশ গোমরাহ ফেরকাকে দলীল পেশ করতে দেখবে। আর প্রত্যেক বাতিল আকীদা পোষণকারীই নিজের পক্ষে সমর্থনের জন্য এ ধরনের 'আম' অথবা 'মুহতামাল' আয়াত ও হাদীসের সাহায্য নিয়ে থাকে। এমনকি 'জরুরিয়্যাতে দীনের অস্বীকারকারীও। যেমন, ইত্তেহাদী ফেরকার বাড়াবাড়িকারী লোক (অর্থাৎ 'অহদাতুল অজুদ' এর বাড়াবাড়িকারী প্রবক্তা, যারা আল্লাহকে ছাড়া আর কোনো কিছুকেই বিদ্যমান বলে মানে না এবং كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে এবং বলে যে, هَالِكٌ ['ধ্বংসশীল'] বিদ্যমান নয়, বরং অস্তিত্বহীন হয়।)

সতর্কতা

এই একই মুহাক্কিক একই কিতাবের ৪২০ পৃষ্ঠায় বলেন,

> যে গোমরাহ্ ফেরকা সীমালঙ্ঘনকারী না, (উদাহরণস্বরূপ, নিজেদের ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের কাফের অথবা গোমরাহ্ বলে না) তাদের ব্যাপারে পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের মতামতই সঠিক যে, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। তবে এর জন্য দুটি শর্ত আছে। **এক.** ওই বিদআত (ভ্রান্ত আকীদা) ও ওই আকীদায় বিশ্বাসীদের সুনিশ্চিতভাবে গোমরাহ বলতে হবে।
>
> **দুই.** যেসকল উলামায়ে কেরাম তাদের অধিকাংশকে কাফের বলেছেন, সেসকল উলামায়ে কেরামকেও মন্দ বলা যাবে না। কেননা, ওই গোমরাহ্ ফেরকাসমূহের মধ্যে কিছু কিছু ফেরকা এমন,

---

যেমন, তারা বলে, أَطِيعُوا اللهَ [তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর।]-এর মধ্যে 'আল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জাতির কেন্দ্র'। অর্থাৎ সমকালীন শাসক ও রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক।

যাদের গোমরাহী সীমাতিরিক্ত খারাপ। তাদেরকে কাফের না বলার বিষয়টিও আমরা সুনিশ্চিতভাবে ফায়সালা করতে পারছি না। (যেমন সুনিশ্চিত ফায়সালা করা যাচ্ছে না কাফের বলার ব্যাপারেও। মোটকথা, উভয় দিকই বরাবর এবং নিশ্চিত না।) বরং এ ক্ষেত্রে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি এবং তাদের কাফের হওয়া না হওয়ার সুনিশ্চিত জ্ঞান ও অকাট্য ফায়সালা আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করি।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহও 'আস-সারিমুল মাসলুল' গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই অভিমতকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৫তম হাদীসের অধীনে বলেন–

> তাদের (খারেজীদের) এই মত তাদের উপর এমন ফাসেদ আকীদা চাপিয়ে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে তাদের দ্বারা এমন ভ্রষ্টতাপূর্ণ কাজ ও আমল সংঘটিত হয়েছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে উম্মতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের বলেছেন। আর কিছু উলামায়ে কেরাম (সতর্কতামূলক) তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। (এবং কাফের বলা থেকে বিরত থেকেছেন।)

যিন্দীক ও তাবীলকারীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম, মুতাকাল্লিমীন, মুহাক্কিকীনসহ মুসান্নিফীনে কেরামের এক বিরাট জামাআতের আলোচনা

খারেজীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার উদ্দেশ্য

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুসাউওয়া'র[৩৫] ২/১২৯ পৃষ্ঠায় বলেন–

> এই কওম, (যাদের দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচিত হাদীসে সংবাদ প্রদান করেছেন) সেই খারেজী সম্প্রদায়, যারা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর যামানায় তাঁর খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের মূলোৎপাটন করেছিলেন।

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তর কুরআনকে গ্রহণ করবে না এবং নেক আমল (কুরআন মোতাবেক আমল)-এর জন্য প্রস্তুত হবে না।

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ এর অর্থ হচ্ছে, তারা দীন থেকে (অজান্তে) বের হয়ে যাবে। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে এটি স্পষ্ট বর্ণনা। সহীহাইন [তথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম] এর অন্যান্য বর্ণনার ভাষ্য এর চেয়েও বেশি স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ.

যেখানেই পাবে তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলো। তাদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

الرمية : বলে ওই শিকারকে, যাকে তোমরা নিশানা বানাতে ইচ্ছা কর এবং তীর নিক্ষেপ কর।

---

[৩৫]. কুতুবখানায়ে রহীমিয়া, জামে মসজিদ, দিল্লি থেকে প্রকাশিত।

فتنظر...الخ : এই উপমা প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তীর শিকারের দেহ ভেদ করে এত দ্রুত গতিতে বের হয়ে গেছে যে, না তাতে সামান্য রক্ত লেগেছে আর না লেগেছে গোবর। ঠিক এমনই ক্ষিপ্র গতিতে এ সকল লোকও ইসলামে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যাবে যে, ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই বাকি থাকবে না।

খারেজীদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর সতর্কতাবলম্বন ও তাঁর দলীল

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ (খারেজীদের ব্যাপারে খুবই সতর্কতাবলম্বন করে) বলেন, যদি কোনো ফেরকা খারেজীদের মতো আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয় এবং মুসলমানদের সমস্ত জামাত থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সবাইকে 'কাফের' বলতে শুরু করে, তবুও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নেই। কেননা, আমার নিকট হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু মসজিদের এক কোণায় এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেছেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ (হুকুমত তো কেবল আল্লাহ তাআলারই জন্য।) এর উপর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন, 'এ কথাটি তো সত্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা বাতিল'। তারপর তিনি বলেছেন, আমাদের উপর তোমাদের তিনটি হক আছে।

(১) তোমাদেরকে আল্লাহর ঘর (মসজিদ)-এ আসা এবং তাঁর যিকির করা (নামায আদায় করা) থেকে বাধা দিব না।

(২) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হাত আমাদের হাতের সঙ্গে থাকবে, (তোমরা আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে) ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে গনীমতের অংশ থেকে বঞ্চিত করব না।

(৩) আমরা তোমাদের বিরুদ্ধেআগে যুদ্ধ শুরু করব না।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এর বিপরীতে হাম্বলী মাযহাবের মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হচ্ছে, (তারা কাফের) তাদেরকে হত্যা করা জায়েয।

ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর দলীলের জওয়াব

রেওয়ায়েতের আলোকে অর্থাৎ নক্বলী দলীল

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এটি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত। আমার নিকট হাদীসের আলোকে এবং যুক্তির নিরীখেও মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতামতই সঠিক। হাদীসের আলোকে তো হচ্ছে এই যে, সহীহ বুখারীর অন্যান্য মারফু রেওয়ায়েতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন–

فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ

['যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাবে, হত্যা করে ফেলো। তাদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।']

বাকি থাকল হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বাণী। ওই বাণীর সারকথা তো হচ্ছে শুধু এই যে, কেবল ইমামের নেতৃত্ব (এবং হুকুমতের) উপর অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করা ও সমালোচনা করা ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ইমামের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে নিবে। হাঁ, যদি ইমামের আনুগত্য অস্বীকার করে, তা হলে তাকে বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত বলা হবে। (এবং অবশ্যই তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে।)

তেমনিভাবে যদি 'জরুরিয়াতে দীন'-এর কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে, তা হলে ওই অস্বীকারের ভিত্তিতে তাকে অবশ্যই হত্যা করে দেওয়া হবে। তবে শুধু এই কারণে নয় যে, সে ইমামের নেতৃত্বের উপর অভিযোগ করেছে অথবা তার আনুগত্য করেনি। (বরং এ জন্য যে, সে 'জরুরিয়াতে দীন'কে অস্বীকার করেছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কথার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, কেবল ইমামের নেতৃত্বের উপর অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করা এবং সমালোচনা করা হত্যার কারণ নয়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, 'জরুরিয়াতে দীন'কে অস্বীকার করা কিংবা ইমামের আনুগত্যকে অস্বীকার করা এবং বিদ্রোহ করাও তাঁর নিকট হত্যার কারণ নয়।

উদাহরণ

বিষয়টির আরও স্পষ্টতার জন্য এভাবে বুঝুন যে, উদাহরণস্বরূপ যখন একজন মুফতী সাহেবের নিকট কারও নির্দিষ্ট কোনো কর্ম ও আমলের কথা উল্লেখ করে সে ব্যাপারে ফতোয়া চাওয়া হয়, তখন ওই মুফতী সাহেব জায়েযের ফতোয়া দেন। কিন্তু যখন ওই একই ব্যক্তির অন্যকোনো কর্ম বা আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন মুফতী সাহেব তাকে ফাসেক বলে ফতোয়া প্রদান করেন। আবার তৃতীয় কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন মুফতী সাহেব তাকে কাফের বলে ফতোয়া দেন। (এই তিনও ফতোয়ার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। স্ব স্ব স্থানে তিনও ফতোয়াই সঠিক। কেননা, প্রত্যেক কাজের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। যখন যে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, মুফতী সাহেব তখন তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। হতে পারে ওই ব্যক্তি বর্ণিত তিন ধরনের কাজই করবেন আর তার ব্যাপারে তিনও ফতোয়াই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।)

ঠিক তদ্রূপ উপরোল্লিখিত ঘটনায় ওই খারেজী লোকটি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর সামনে শুধু 'তাহকীম' তথা সালিসি ব্যবস্থাপনার উপর অভিযোগ করেছে। আর আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু শুধু তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। যদি ওই খারেজী লোকটি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর সামনে কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত করার বিষয়টি অস্বীকার করত, অথবা হাউজে কাউসারকে অস্বীকার করত, কিংবা এ জাতীয় অকাট্য ও সুনিশ্চিত কোনো আকীদা অথবা হুকুমকে অস্বীকার করত, তা হলে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু সুনিশ্চিতভাবেই তাকে কাফের বলে দিতেন। (অতএব, হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ কর্তৃক হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর এই বাণীর দ্বারা খারেজীরা কাফের না হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করা সহীহ হতে পারে না।)

বাকি أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِيَ اللهُ عَنْهُمْ ওয়ালা হাদীস মুনাফিকদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মদ্রোহী ও যিন্দীকদের ব্যাপারে নয়। (যার আলোচনা অচিরেই আসছে।)

কাফের, মুনাফিক ও যিন্দীকের পার্থক্য

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, বিষয়টির আরও পরিষ্কার বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, দীনে হকের বিরোধী যদি হককে একেবারে স্বীকারই না করে এবং না প্রকাশ্যে হককে কবুল করে আর না গোপনে, তা হলে সে 'কাফের'। আর যদি মুখে স্বীকার করে ঠিক, কিন্তু অন্তরে তা অবিশ্বাস করে না, তা হলে সে 'মুনাফিক'। আর যদি প্রকাশ্যভাবে দীনে হককে স্বীকার করে বটে, কিন্তু জরুরিয়াতে দীনের মধ্য থেকে কোনো বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উম্মতের ইজমারও পরিপন্থী, তা হলে সে 'যিন্দীক'। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি কুরআনে করীমকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং তাতে জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত যে আলোচনা আছে, তা-ও মানে। কিন্তু সে বলে, জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই আনন্দ ও প্রফুল্লতা, যা মুমিনদের লাভ হবে তাদের নেক আমল ও উত্তম চরিত্রগুণের ফলে। আর জাহান্নামের আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই অনুতাপ ও কষ্ট, যা কাফেররা ভোগ করবে তাদের মন্দকর্ম ও নিন্দনীয় চরিত্রগুণের কারণে। আরও বলে যে, এ ছাড়া জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা বলতে আর কিছু নেই। তা হলে এই ব্যক্তি 'যিন্দীক'। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نَهَانِيَ اللهُ عَنْهُمْ শুধু মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন। যিন্দীক (অথবা কাফের)-দের ব্যাপারে নয়।

যুক্তির নিরীখে অর্থাৎ আক্বলী দলীল

মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত যুক্তির নিরীখে এ জন্য সঠিক যে, যেমনিভাবে শরীয়ত ইরতিদাদ তথা [ইসলাম] ধর্মত্যাগ করার শাস্তি হিসাবে 'হত্যা'-কে নির্ধারণ করেছে, যাতে এই শাস্তি ধর্মত্যাগে ইচ্ছুকদের জন্য ধর্মত্যাগের পথে প্রতিবন্ধক হয়, আর তা ওই দীনে হকের হেফাজত ও সংরক্ষণের মাধ্যম হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেছেন, তেমনিভাবে এই হাদীসে (খারেজী) যিন্দীকদের শাস্তি হিসাবে 'হত্যা'-কে নির্ধারণ করেছেন এ জন্য, যাতে এই শাস্তি যিন্দীকদের জন্য 'যিন্দীকী' (ধর্ম-বিকৃতি) থেকে বিরত থাকার কারণ হয় এবং দীনের মধ্যে এমনসব ফাসেদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রাস্তা বন্ধ করার মাধ্যম হয়, যা মুখে আনাও উচিত নয়।

তাবীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রকারভেদ ও তার হুকুম এবং যিন্দীকীর স্বরূপ

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, মনে রাখবেন! তাবীল বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুই প্রকার।

এক. ওই ব্যাখ্যা, যা কুরআন-হাদীসের কোনো অকাট্য নস এবং ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত হয় না।

দুই. ওই ব্যাখ্যা, যা কুরআন-হাদীসের কোনে অকাট্য নস অথবা ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত ও বিরোধী হয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে ধর্মদ্রোহিতা ও যিন্দীকী।

অতএব, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভ, কবরের আযাব, মুনকার-নাকীরের সুওয়াল-জওয়াব, অথবা পুলসিরাত কিংবা হিসাব-নিকাশ এবং কর্মফল ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করবে, সে যিন্দীক। চাই সে এ কথা বলুক যে, আমি ওই (হাদীসগুলোকে সহীহ্ এবং) সেগুলোর বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য বলে মানি না, অথবা সে বলুক যে, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ঠিক, কিন্তু এ হাদীসগুলো 'মুআউওয়াল' তথা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ এবং এমন ব্যাখ্যা পেশ করে, যা কেবল ভুল আর ফাসেদই না, বরং ইতিপূর্বে আর কখনও এ ধরনের ব্যাখ্যা শোনা যায়নি, তা হলে সে যিন্দীক।

এমনিভাবে উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি 'শাইখাইন' তথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর ব্যাপারে বলবে যে, 'এঁরা জান্নাতী নন', অথচ এ দুই হযরতের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো 'হদ্দে তাওয়াতুর'[৩৬]-এ পৌঁছে গেছে, অথবা যদি একথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো অবশ্যই খাতিমুল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নবী, কিন্তু তার অর্থ শুধু এই যে, তাঁর পর কাউকে 'নবী' নামে নামকরণ করা হবে না। (অর্থাৎ কাউকে নবী বলা হবে না।) তবে নবুয়তের হাকীকত তথা কোনো মানুষ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ

---

[৩৬] অর্থাৎ কোনো সংবাদ বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বিপুল পরিমাণ হওয়া, যারা সকলে মিলে কোনো মিথ্যার উপর একমত পোষণ করেছেন বলে ধারণা করা অসম্ভব।–অনুবাদক

থেকে মাখলুকের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হওয়া, তাঁর আনুগত্য ফরয হওয়া, তিনি যাবতীয় গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হওয়া এবং ইজতিহাদী বিষয়ে ভুলের উপর অটল থাকা থেকে হেফাজতে থাকাসহ নবুয়তের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও ইমামদের জন্য বিদ্যমান আছে, তা হলে এই ব্যক্তিও নিঃসন্দেহে যিন্দীক। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে মুতাআখ্‌খিরীন এমন ব্যক্তি কাফের হওয়া এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত। والله اعلم بالصواب

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উপরোল্লিখিত আলোচনা উদ্ধৃত করার পর গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই আলোচনার দ্বারা যিন্দিকতার স্বরূপ ও তার হুকুম উভয়ই স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে জানা হয়ে গেল। পাশাপাশি এও প্রমাণ হয়ে গেল যে, জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে তাবীল বা ব্যাখ্যা কুফরি থেকে বাঁচাতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ খারেজীদেরকে কাফের না বলার ক্ষেত্রে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর যে রেওয়ায়েত পেশ করেছেন, তার ব্যাপারে হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আস-সারিমুল মাসলুল' এর ১৭৫ পৃষ্ঠায় চৌদ্দতম সুন্নাতের আলোচনায় পনেরোতম হাদীসের অধীনে যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'আস-সারিমুল মাসলুল'-এ বর্ণিত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার কাছে তাঁর ওই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তুলনায় অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়েছে, যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ'য়। ওই গ্রন্থের ১৯৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন–

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْكَلِمَاتُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : إِحْدَاهُنَّ : مَا هُوَ كُفْرٌ مِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ.

মোটকথা, এই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে অভিযোগের) ব্যাপারে তিনটি কথা। প্রথমত, ওই কথা, যা সুনিশ্চিত নির্জলা কুফরি। যেমন, যুলখুওয়াইসারা'র এ উক্তি যে, 'এ বণ্টন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়নি।' (বিধায় যুলখুওয়াইসারা নিঃসন্দেহে কাফের।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, খারেজীদের এই সরদারই যখন ওই সকল কথার উপর ভিত্তি করে কাফের প্রমাণিত হল, তখন তার শিষ্য-অনুসারীরাও নিঃসন্দেহে কাফের।

তিনি আরও বলেন, এ হল বিরোধিতাকারী ও দুশমনদের কষ্টদায়ক ও অবমাননাকর অভিযোগ-বাক্য; যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কষ্ট দেওয়া ও অবমাননা করা। অপরদিকে নিম্নবর্ণিত কথামালা إِنَّ نِسَائَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ (নিশ্চয় আপনার স্ত্রীগণ আপনার কাছে আল্লাহর নামে ইনসাফ কামনা করে।) (এ তো হল মাহাত্ম্য-মুহাব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত হওয়া সবিনয় আরজু ও নিবেদন।[৩৭] এর সাথে দুষ্ট ও কষ্টদাতা যুলখুওয়াইসারা'র আজেবাজে ও বিষাক্ত কথার কী সম্পর্ক?) এর দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র স্ত্রীগণের মাঝে সমতা বিধান ও সমান আচরণের বিনম্র প্রার্থনা ও সবিনয় অনুরোধ। ব্যস্, এটুকুই। আল্লাহর পানাহ! এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সত্য-বিচ্যুত হওয়া ও জুলুম-অন্যায়ের ব্যাপারে অভিযোগ করা উদ্দেশ্য নয়।

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শিফা' গ্রন্থের ২/৪২২ পৃষ্ঠায় فان قلت لم يقتل...الخ অধ্যায়ের অধীনে এই পার্থক্যই বর্ণনা করেছেন।

حديث مروق এর মুহাদ্দিসানা বিশ্লেষণ ও খারেজীরা কাফের-মুরতাদ হওয়ার দলীল

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মনে রাখবেন! যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ, সে সকল বিষয়-সংশ্লিষ্ট

---

[৩৭] কেননা, এ মুহাব্বতপূর্ণ কথাগুলো এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয়েছে, যার ভিতরটা ঈমান ও একীনের নূরে নূরান্বিত; অন্তর মুহাব্বত ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। এ জন্য এটি নিঃসন্দেহে এমন এক বিষয়ের অনুরোধ ও প্রার্থনা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ পালা বণ্টন ও স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান। এর বিপরীতে যুলখুওয়াইসারা'র বিষাক্ত কথা তার ভিতরগত নোংরামি ও অন্তরের কলুষতার পরিচায়ক। আর তার একমাত্র উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া ও অবমাননা করা।-[উর্দূ] অনুবাদক

হাদীস সহীহ বুখারীর 'কিতাবুদ দিয়্যত' এর بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ এর অধীনে সহীহ বুখারীর অধিকাংশ নোস্খায় নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত আছে[৩৮]–

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : (١) النَّفْسُ بِالنَّفْسِ (٢) وَالثَّيِّبُ الزَّانِي (٣) وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

যে মুসলমান لا اله الا الله [আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই] এর সাক্ষ্য দেয় এবং আমি আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত বৈধ ও হালাল নয় [অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ নয়] তবে এ তিন কারণের কোনোও এক কারণে। [যে কারণগুলো হত্যাকে আবশ্যক করে।] ১. জানের বদলায় জান। (নিহত ব্যক্তির কিসাসস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে।) ২. বিবাহিত কেউ ব্যভিচার করলে। (তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।) ৩. দীন থেকে বের হয়ে গেলে। মুসলমানদের দল থেকে আলাদা হয়ে গেলে। (তারা যিন্দীক, মুরতাদ; তাদেরকে হত্যা করা হবে।)[৩৯]

---

[৩৮]. হাফেয ইবনে হাজার রহ. 'ফাতুহুল বারী'র ১২/১৭৭ পৃষ্ঠায় كشميهني থেকে হযরত আবু যর রায়ি. এর বরাতে এই হাদীসকে المفارق لدينه التارك للجماعة শব্দে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, كشميهني ব্যতীত অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ হযরত ইমাম বুখারী রহ. থেকে এই শব্দের পরিবর্তে المارق من الدين শব্দে বর্ণনা করেন। নাসাফী, সারাখসী এবং মুসতামলী এই রেওয়ায়েতকে المارق لدينه শব্দে বর্ণনা করেন। (ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এই হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. থেকে তিন সূত্রে বর্ণিত আছে। (১) كشميهني এর সূত্রে المفارق لدينه শব্দে। (২) নাসাফী, সারাখসী এবং মুসতামলীর সূত্রে المارق لدينه শব্দে। (৩) আর বুখারীর সাধারণ নোসখাসমূহে المارق من الدين শব্দে। মূলত এক বর্ণনার শব্দ অন্য বর্ণনার শব্দের ব্যাখ্যা করে। এখানে ভিন্নতা শুধু শব্দের; অর্থ ও উদ্দেশ্য এক।

[৩৯]. সহীহ বুখারী : ২/১০১৬

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ اَلْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ. এর সর্বোত্তম প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করেন মুরতাদকে এবং এর সমর্থনে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তবে বিলকুল এই একই শিরোনাম يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ শব্দ এবং হুবহু এই একই اَلْمُرُوْقُ مِنَ الدِّيْنِ وَالْإِسْلَامِ খারেজীদের [ব্যাপারে বর্ণিত] প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, খারেজীদের হুকুমও তা-ই হওয়া উচিত, যে হুকুম মুরতাদদের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ কুফর ও হত্যার হুকুম। (বিদ্রোহী মুসলমানদের জন্য নয়।)

খারেজীদের ব্যাপারে হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর বিশ্লেষণ

(হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর 'ফাতাওয়া'য় চেঙ্গিস খানের অনুসারী, তাতারী ও তাদের সহযোগী-সাহায্যকারী মুসলমানদের ব্যাপারে এক জিজ্ঞাসার জওয়াবে ওই সমস্ত বাতিল ও ভ্রষ্ট ফেরকাসমূহের আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম দলীলসহ বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে কিংবা অন্যকে দিয়ে বলায়। সেই দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত আলোচনা থেকে গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নোল্লিখিত নির্বাচিত অংশ পেশ করছেন।)

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর 'ফাতাওয়া'র ৪/২৫৮ পৃষ্ঠায় প্রথমত খারেজীদের ব্যাপারে উলামায়ে উম্মতের দুটি অভিমত উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, সমগ্র উম্মত খারেজীদের নিন্দা করা ও তাদেরকে গোমরাহ বলার ক্ষেত্রে একমত। মতানৈক্য শুধু তাদেরকে কাফের বলা ও না-বলার বিষয়ে। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মাযহাবে দুটি অভিমত আছে। (অর্থাৎ মালেকী মাযহাব এবং হাম্বলী মাযহাবের পৃথক পৃথক দুটি করে অভিমত আছে। কেউ কেউ তাদেরকে কাফের বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন না।) ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মাযহাবেও তাদেরকে কাফের বলার ব্যাপারে এমনই মতানৈক্য আছে। (শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ তাদেরকে কাফের বলে, আবার কেউ কেউ কাফের বলে না।) এ জন্য ইমাম আহমাদ

রহমাতুল্লাহি আলাইহ প্রমুখ মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাবে ওই খারেজীদের ব্যাপারে প্রথম কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করে (যেসমস্ত ভ্রষ্ট ফেরকা এক সমান এবং তাদের হুকুমও একই) দুই সুরত হয়। ১. এই যে, তারা বিদ্রোহীদের ন্যায় মুসলমান। ২. এই যে, তারা মুরতাদদের ন্যায় কাফের। তাদেরকে প্রথমেই (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা ছাড়াই) হত্যা করা জায়েয। তেমনিভাবে তাদের বন্দীদেরও হত্যা করা জায়েয। পলায়নরতদের পিছনে ধাওয়া করাও জায়েয। আর যাদেরকে আয়ত্তে আনা যাবে, মুরতাদদের মতো তাদেরকে তাওবা করানো হবে। যদি তারা তাওবা করে নেয়, তা হলে ভালো কথা। অন্যথায় হত্যা করে দেওয়া হবে।

যেমন, যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ওই সকল লোকের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর দুটি অভিমত রয়েছে, যারা ইমাম [আমীরুল মুসলিমীন]-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। ১. এই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবল ইমাম [আমীরুল মুসলিমীন]-কে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি করার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কাফের-মুরতাদ সাব্যস্ত করা হবে। ২. এই যে, তাদেরকে বিদ্রোহী মুসলমান বলা হবে।

তারপর ৩০০ পৃষ্ঠায় হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিজের মতামত বর্ণনা করে বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, এ সকল লোক (চেঙ্গিস খানের অনুসারী, তাতারী) তাবীলকারী ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাদের কাছে এমন কোনো গ্রহণযোগ্য তাবীল বা ব্যাখ্যা নেই, ভাষাগত যার অবকাশ আছে। তারা তো হল সুনিশ্চিতরূপে দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া খারেজী, যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদ, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হালাল বলে দাবিকারী আহলে তায়েফ, ফেরকায়ে খরমিয়া ও এ ধরনের বে-দীন ফেরকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত; ইসলামের শরয়ী হুকুম-আহকাম থেকে বের হয়ে যাওয়া (এবং কাফের হয়ে যাওয়া)র উপর ভিত্তি করে যাদের সঙ্গে সব সময়ই যুদ্ধ করা হয়েছে।

খারেজীদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের দ্বিধা ও দ্বিধার কারণ

অতঃপর হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ ওই বিষয়ে সতর্ক করেছেন, যে কারণে (খারেজীদের ব্যাপারে) ফুকাহায়ে কেরাম ধোঁকায় পড়েছেন (এবং ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ব্যাপারে 'বিদ্রোহী মুসলমান' হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত করেছেন।) [তিনি বলেন,] এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম ধোঁকা খেয়েছেন। একমাত্র এ কারণে যে, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকারগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শিরোনামের অধীনে যাকাত অস্বীকারকারীদের যুদ্ধ, খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বসরাবাসী এবং হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও তাঁর সমমনাদের সঙ্গের যুদ্ধকে একই ধরনের যুদ্ধ সাব্যস্ত করে 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই' এই শিরোনামের অধীনে উভয় প্রকার লড়াইকেই একত্র করে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং ওই সমস্ত যুদ্ধকে (একই ধরনের এবং) শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। পাশাপাশি এমনভাবে মাসআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম বর্ণনা করেছেন, যেন এই সমস্ত লড়াই একই প্রকৃতির এবং একই ধরনের। আর এ-ই হচ্ছে ওই সকল গ্রন্থকারদের বিরাট বড় এক ভুল।

এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত (ও সিদ্ধান্ত) হচ্ছে সেটাই, যা ইমাম আওযায়ী, সাওরী, মালেক, আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ প্রমুখসহ আইম্মায়ে হাদীস ওয়া সুন্নাহ এবং আহলে মদীনার অভিমত। আর তা হচ্ছে এই যে, ওই দুই ধরনের লড়াইয়ের মাঝে পার্থক্য করা উচিত। (প্রথম প্রকারের লোকজন কাফের ও মুরতাদ। তাদের বিরুদ্ধের লড়াইসমূহ 'কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই' শিরোনামের অধীনে আনা উচিত এবং তাদের উপর কাফেরদের হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা উচিত। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোকজন মুসলমান বিদ্রোহী। তাদের বিরুদ্ধের লড়াইসমূহ 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই' শিরোনামের অধীনে আনা উচিত এবং তাদের উপর মুসলমান বিদ্রোহীদের হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা উচিত।)

(লক্ষ্য করুন, হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তাঁর নিকট খারেজীরা কাফের।)

নামায রোযার পাবন্দী সত্ত্বেও মুসলমান মুরতাদ হয়

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৯১ পৃষ্ঠায় ওইসব নামধারী মুসলমান, যারা তাতারীদের সঙ্গ দিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে বলেন–

> আর তাদের (চেঙ্গিস খানের অনুসারী সহযোগী মুসলমানদের) ভিতর ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে ইরতিদাদ [মুখ ফিরিয়ে নেওয়া] ততটাই ছিল, যতটা সে (চেঙ্গিস খান) ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। আর যখন পূর্বসূরী বুযুর্গানে দীন (সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাবেয়ীনে কেরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ তারা নামাযও পড়ত, রোযাও রাখত এবং সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত না। (তা হলে এদেরকে কেন মুরতাদ বলা হবে না? এরা তো স্পষ্ট কুফরি ও শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। বোঝা গেল হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট ইরতিদাদ-এর শামিল এমন যে কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকারকারীরা নামায-রোযার পাবন্দী সত্ত্বেও কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।)

কালিমায়ে শাহাদাত পড়া এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি ও মনে করা সত্ত্বেও মানুষ কাফের-মুরতাদ হয়

২৮২ পৃষ্ঠায় الطريقة الثانية (অর্থাৎ দুই ধরনের লড়াইকে আলাদা আলাদা রাখা হবে)-এর অধীনে বলেন, আলোচনা হচ্ছে ওই তাতারীদের ব্যাপারে, যারা নিত্যদিন শামে রক্তক্ষয়ী হামলা করত এবং নিরাপরাদ মুসলমান ও তাদের বিবি-বাচ্চাদের রক্ত প্রবাহিত করত। অথচ মুখে মুখে তারা কালিমায়ে শাহাদাতও পড়ত, নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবিও করত। এতে করে তারা ওই কুফরি থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে নিল, যে কুফরির উপর তারা ছিল। (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের জান-মালকে বৈধ ও লুটপাটকে হালাল মনে করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদেরকে কী বলা হবে? বিদ্রোহী মুসলমান? কাফের? মুরতাদ? এটা স্পষ্ট

কথা যে, যারা মুসলমানদের জান-মালকে নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে, তারা কাফের।)

(যারা 'জামাল' ও 'সিফ্ফীন' এর যুদ্ধ এবং 'খারেজী' ও 'হারুরিয়া'র যুদ্ধগুলোকে একই ধরনের সাব্যস্ত করে থাকেন, তাদের অজ্ঞতা ও দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে) ২৪২ পৃষ্ঠায় বলেন–

> যেমন, দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া খারেজীদের ব্যাপারেও এ কথাই বলা হয়ে থাকে। (যে, তারাও রাফেযী এবং মু'তাযিলাদের ন্যায় 'জঙ্গে জামাল' ও 'জঙ্গে সিফ্ফীন'-এ লড়াইকারী সাহাবায়ে কেরামকে কাফের ও ফাসেক বলে।) এ জন্য তাদের কুফরির ব্যাপারেও পূর্বসূরী বুযুর্গগণ (সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাবেয়ীনে কেরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ) এবং আইম্মায়ে দীনের দুটি অভিমত প্রসিদ্ধ আছে। (যার আলোচনা পূর্বোক্ত নির্বাচিত অংশে এসে গেছে।)

আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সমালোচনাকারী এবং তাঁকে অবমাননাকারী মুসলমান কাফের ও মুরতাদ

২৩৬ পৃষ্ঠায় 'বাতেনী' ফেরকার মিসর-অধিপতি (ফাতেমী)গণের কুফর ও ইরতিদাদের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> অতঃপর ওই বাতেনীরা হযরত মসীহ (ঈসা) আ.-কে বিশেষভাবে অভিযোগ আরোপ ও সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়েছে এবং তাঁকে ইউসুফ নাজ্জার (কাঠমিস্ত্রি)-র প্রতি সম্বন্ধিত করেছে (যে, তিনি ইউসুফ নাজ্জারের ছেলে ছিলেন।) তাঁকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতাহীন নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছে। এ জন্য যে, তিনি তাঁর দুশমনদের নাগালে চলে এসেছিলেন। এমনকি তারা তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে দিয়েছে। অতএব, এ সকল লোক হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামকে গালি দেওয়া ও তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের সমমনা। (কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অভিযোগ আরোপ ও সমালোচনা করা এবং তাঁর দুর্নাম ও অবমাননা করা সব সময়ই ইহুদীদের রীতি ছিল।) বরং এরা তো ইহুদীদের

থেকেও খারাপ ও অধিক কষ্টদাতা। তারা মুসলমান ও কুরআনের অনুসারী বলে দাবি করা সত্ত্বেও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালাম এর উপর অভিযোগ আরোপ, তাঁদের সমালোচনা ও বদনাম-অবমাননা করছে। (তাই সুনিশ্চিতভাবেই তারা কাফের ও মুরতাদ।)

(কাফেরদের তুলনায় একজন মুসলমানের কুফরী ও ইরতিদাদপূর্ণ কথা-কাজের ক্ষতি ও অনিষ্টতা অনেক বেশি।) এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে ২৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

কারণ, একজন প্রকৃত মুসলমান যখন ইসলামের কোনোও অকাট্য হুকুম কিংবা আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত ও মুরতাদ হয়ে যায়, তখন সে ওই কাফের থেকে বহুগুণ বেশি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, যে এখনও পর্যন্ত ইসলামে প্রবেশই করেনি। যেমন, ওই সকল যাকাত অস্বীকারকারী, যাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু (অন্যান্য সকল কাফের-মুশরিকদের ছেড়ে) যুদ্ধ করেছিলেন।[৪০] (কারণ, তাদের কুফরী ও দীন থেকে ফিরে যাওয়ার বিষয়টা ছিল ইসলামের ভিত্তিকেই ধসিয়ে দেওয়ার মতো।)

---

[৪০] 'ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া'র উল্লিখিত নির্বাচিত অংশ দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট ওই সকল লোক ও ফেরকাসমূহ, যারা মুসলমান বলে পরিচিত ও আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের সুনিশ্চিত অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্যুত হবে কিংবা অস্বীকার করবে, অথবা আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. বিশেষভাবে হযরত ঈসা আ.-কে গালি দিবে কিংবা তাঁর দুর্নাম-অবমাননা করবে, তারা শুধু কাফের-মুরতাদই না; তাদেরকে শুধু হত্যা করাই ওয়াজিব না, বরং অন্যান্য সমস্ত কাফের-অমুসলিমদের তুলনায় ইসলামের অনেক বড় ক্ষতিকর দুশমন তারা। তাদের মূলোৎপাটন করা সবচেয়ে বেশি জরুরি ও অগ্রগণ্য। তাদের কোনো তাবীল কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।–[উর্দু] অনুবাদক

যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীদের যিন্দীকী ও ধর্মদ্রোহিতা খোলাখুলিভাবে সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর তাদের তাওবাও গ্রহণযোগ্য নয়

(গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহীদের কুফর ও ইরতিদাদ প্রমাণ করার পর তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়া ও না-হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত উদ্ধৃত করছেন।)

যে ফেরকাসমূহের তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের আলোচনার অধীনে 'আদ্দুররুল মুখতার' এর গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, 'ফাতহুল ক্বদীর'এ বর্ণিত আছে, যে মুনাফিক (অন্তরে) কুফরকে গোপন রাখে আর (যবানে) ইসলাম প্রকাশ করে, সে ওই যিন্দীক (বে-দীন) এর ন্যায়, যে কোনো দীনকেই মানে না। (এবং যেমনিভাবে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনিভাবে এরও তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।) ঠিক তদ্রূপ ওই ব্যক্তি কিংবা ফেরকা(র তাওবাও গ্রহণযোগ্য নয়) যার ব্যাপারে জানা যাবে যে, তাকে (প্রকাশ্যে মুসলমান বলা সত্ত্বেও) সে ভিতরে ভিতরে কোনোও কোনোও জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, মদপান হারাম হওয়ার বিষয়টি। প্রকাশ্যে সে মদপান হারাম হওয়ার আকীদা প্রকাশ করে (কিন্তু মনে মনে মদকে হালাল মনে করে।) এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা 'ফাতহুল ক্বদীর'এ বর্ণিত আছে। (যার সারকথা হচ্ছে, যেমনিভাবে যিন্দীকের তাওবার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, কেননা সে আল্লাহকেই মানে না, তেমনিভাবে ওই মুনাফিকের তাওবার উপরও কোনো ভরসা নেই।

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'রদ্দুল মুহতার' নতুন সংস্করণ-১৩২৪ হিজরী এর ৩/২৯৭, ৪১ পৃষ্ঠায় 'আদ্দুররুল মুখতার' এর উল্লিখিত ভাষ্যের অধীনে বলেন, 'নূরুল আইন'-এ তামহীদের বরাতে বর্ণিত আছে, যে সকল ফেরকার গোমরাহী এমন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, (তার উপর ভিত্তি করে) তাদেরকে কাফের বলা ওয়াজিব হয়ে যাবে, তারা যদি ওই গোমরাহী থেকে ফিরে না আসে অথবা তাওবা না করে, তা হলে তাদের সকলকে হত্যা করে ফেলা জায়েয। হাঁ, যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে তাদের তাওবা গ্রহণ করে নেওয়া হবে। তবে রাফেযীদের 'ইবাহিয়্যা', 'গালিয়্যা' ও 'শিয়া' সম্প্রদায় এবং ফালসাফাদের 'কারামতা' ও 'যিন্দীক' সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তাদের তাওবা কোনো

অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না। তাওবা করুক অথবা না-করুক। তাওবা করার পূর্বেও এবং পরেও, সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হবে। কেননা, তারা বিশ্বজগতের স্রষ্টারূপে কাউকে মানেই না, তা হলে তারা তাওবা-ইস্তিগফার করবে কার কাছে? ঈমান আনবে কার উপর?

তারপর আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে নিজের মতামত পেশ করে বলেন–

> কোনো কোনো আলেম বলেন, যদি এ সকল লোক তাদের গোমরাহ আকীদার রহস্য ফাঁস হওয়া (এবং মুসলমান শাসক পর্যন্ত মোকদ্দমা পৌঁছা)র আগে তাওবা করে নেয়, তা হলে তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় নয়।

তিনি বলেন–

> ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর অভিমতের দাবিও এটিই এবং এটিই সর্বোত্তম ফায়সালা।

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ৩/২৮২ পৃষ্ঠায় 'মুরতাদের অধ্যায়'-এর অধীনে যিন্দীকের তাওবা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বলেন–

> হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত আছে যে, যিন্দীকের ন্যায় ওই ব্যক্তির তাওবাও গ্রহণ করা হবে না, যে বারবার মুরতাদ হতে থাকে। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ, ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এবং ইমাম লাইছ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর মাযহাবও এটিই। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বারবার এমন করে (অর্থাৎ বারবার তাওবা করে এবং বারবার বিচ্যুত ও মুরতাদ হয়ে যায়) তা হলে তাকে সুযোগ বুঝে হত্যা করে ফেলা হবে। আর তার পদ্ধতি হবে এই যে, তার পিছনে পিছনে লেগে থাকবে। যখনই কোনো সময় সে যবানে কুফরি কথা উচ্চারণ করবে, তৎক্ষণাৎ তাকে তাওবা করার পূর্বে হত্যা করে ফেলা হবে। কারণ, তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা তাওবা-ইস্তিগফারের সঙ্গে উপহাস প্রকাশ পেয়ে গেছে। (আর এ ধরনের

লোকের তাওবার কী মূল্য, যে তাওবা-ইস্তিগফারের সঙ্গেই উপহাস করে!)[৪১]

জরুরিয়াতে দীনের ন্যায় যে কোনো ক্বতয়ী [অকাট্য] বিষয়কে অস্বীকার করাও কুফরিকে আবশ্যক করে : জরুরি এবং ক্বতয়ী'র পার্থক্য

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রদ্দুল মুহ্তার' এর ৩/২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

> বাহ্যত শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কাফের হওয়ার হুকুম কেবলমাত্র ওই সকল বিষয়কে অস্বীকার করার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, যেগুলো জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ যা 'মুতাওয়াতিররূপে'[৪২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।) অথচ আমাদের (হানাফীদের) নিকট কাফের হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে তার অস্বীকার করা বিষয়টি কেবল 'ক্বতয়ীউস্ সুবুত'[৪৩] হওয়া; যদিও তা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না। বরং আমাদের নিকট তো এমন সব কথা-কাজের উপর ভিত্তি করেও কাউকে কাফের বলা যাবে, যে কথা-কাজ নবীকে হেয় করে কিংবা নবীর অবমাননাকে আবশ্যক করে। এ জন্যই শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসায়ারা'য় বর্ণনা করেছন–
>
> مَا يَنْفِيْ الْإِسْتِسْلَامَ اَوْ يُوْجِبُ التَّكْذِيْبَ فَهُوَ كُفْرٌ.

---

[৪১]. উল্লিখিত নির্বাচিত অংশ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মূলহিদ ও যিন্দীকের তাওবা কারও নিকটই এবং কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।–[উর্দূ] অনুবাদক

[৪২]. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো একটি বিষয় এমনভাবে প্রমাণিত হওয়া অথবা কোনো একটি বিষয়টিকে এত বিপুল পরিমাণ লোক বর্ণনা করা, যাদের ব্যাপারে এই সন্দেহ করা যায় না যে, তারা সকলে মিলে একটা মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন।

[৪৩]. যে বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যরূপে প্রমাণিত নয় ঠিক, কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য অকাট্য দলীল উদাহরণস্বরূপ ইজমা ইত্যাদি দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

প্রত্যেক ওই (কথা ও কাজ) যা তাসলীম [আত্মসমর্পণ] ও ইতাআত [আনুগত্য] এর পরিপন্থী হবে কিংবা (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হবে, তা-ই কুফরি।

অতএব, অবমাননাকে আবশ্যক করে– এমন যে সকল বিষয় আমাদের হানাফীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার মধ্যে নবী-হত্যা সবচেয়ে জঘন্যতম, কেননা এর মধ্যে দীনের অবমাননা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, (প্রথম অংশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ) আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরিপন্থী। (কেননা, হেয় প্রতিপন্ন করা ও অবমাননা করা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের সুনিশ্চিত পরিপন্থী।) এবং যে সকল বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, সেগুলোকে অস্বীকার করা (দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ) (নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক করে। বাকি ওই সকল অকাট্য বিষয়সমূহ অস্বীকার করা, যা জারুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় (অর্থাৎ যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়) উদাহরণস্বরূপ, মৃতের মেয়ের সঙ্গে তার নাতনীকেও ষষ্ঠাংশের হকদার সাব্যস্ত করা, যা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত (এবং অকাট্য), হানাফীদের[৪৪] বর্ণনা মোতাবেক এগুলোকে অস্বীকার

---

[৪৪] সারকথা হচ্ছে এই যে, জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা তো সর্বসম্মতিক্রমেই কুফুরি। বাকি হানাফীরা দ্বীনের ওই সকল অকাট্য বিষয়গুলো অস্বীকার করাকেও কুফুরির বলে সাব্যস্ত করে, যেগুলো যদিও জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যরূপে প্রমাণিত না, কিন্তু অকাট্য দলীল– উদারহণস্বরূপ, ইজমা ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত। এই আলোচনার দ্বারা 'জরুরিয়াতে দ্বীন' এবং 'অকাট্য বিষয়সমূহ' এর পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে গেল। 'অকাট্য' প্রত্যেক ওই বিষয়কে বলে, যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর [জরুরিয়াতে দ্বীন] 'জরুরি' প্রত্যেক ওই বিষয়কে বলে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অর্থাৎ মুতাওয়াতিরভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রামাণিত। অকাট্য দলীল চারটি : আল্লাহর কিতাব [কুরআন], মুতাওয়াতির হাদীস, ইজমা, প্রকাশ্য কিয়াস। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেকটি 'জরুরি' বিষয়ই 'অকাট্য', কিন্তু প্রত্যেক 'অকাট্য বিষয়' 'জরুরি' হওয়া শর্ত না। 'অকাট্য' আম শব্দ আর 'জরুরি' খাস শব্দ। 'জরুরি' এবং 'অকাট্য' এর পার্থক্য এই-ই।–[উর্দু] অনুবাদক

করাও কুফরিকে আবশ্যক করে। (কেননা, এই অস্বীকারও আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের পরিপন্থী) কারণ, হানাফীদের নিকট কাফের হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে 'বিষয়টি দীনের অন্তর্ভুক্ত' এ বিষয়টি অকাট্যরূপে প্রমাণিত হওয়া। (জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের নিকট শর্ত না।) হানাফীগণ আরও বলেন– এটাও জরুরি যে, 'বিষয়টি দীনের অকাট্য বিষয়' এই জ্ঞানটুকু অস্বীকারকারীর থাকতে হবে। কেননা, হানাফীদের নিকট যে দুটি বিষয়ের উপর কুফুরির ভিত্তি, অর্থাৎ একটি হচ্ছে নবীকে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে দীনকে হেয় ও অবমাননা করা, এ বিষয়টি কেবল তখনই বাস্তবায়ন হবে, যখন অস্বীকারকারীর এ জ্ঞানটুকু থাকবে (যে, আমি এই অকাট্য বিষয়টি অস্বীকার করে 'নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা' কিংবা 'দীনকে হেয় করা'র কাজে লিপ্ত হচ্ছি) পক্ষান্তরে যদি তার এই জ্ঞানটুকুই না থাকে, তা হলে তাকে কাফের বলা যাবে না। তবে যদি কোনো আহলে ইলম তাকে এ কথা বলে দেয় (যে, তুমি এই অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করে 'নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা' কিংবা 'দীনকে হেয় করা'র কাজে লিপ্ত হচ্ছ।) আর সে তা সত্ত্বেও (বিরত না থাকে এবং) নিজের কথার উপর অটল থাকে (তা হলে নিঃসন্দেহে তাকে কাফের বলা হবে।)

কাফের সাব্যস্ত করার মূলনীতি

যে কোনো অকাট্য হারামকে হালাল বলে দাবিকারী ব্যক্তি কাফের

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'সতর্কীকরণ' শিরোনামে আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিম্নবর্ণিত নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করে ওই সকল ধৃষ্ট লোককে সতর্ক করতে চান, যারা নিঃশঙ্কচিত্তে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম বলে দেন। তিনি বলেন–

সতর্কীকরণ

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আল বাহরুর রায়েক' এর বরাতে 'রদ্দুল মুহতার' এর ৩/২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আল বাহরুর রায়েক'-এ বর্ণিত আছে যে, (কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে) মূলনীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করে, আর ওই বিষয়টি যদি حرام لعينه (সত্তাগতভাবে হারাম) না হয়, তা হলে তাকে হালাল বলে বিশ্বাসকারী

ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। উদারহণস্বরূপ, অন্যের মাল (অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্যের মালকে নিজের জন্য হালাল মনে করে।) আর যদি ওই বিষয়টি حرام لعينه (সত্তাগতভাবে হারাম) হয়, তা হলে তাকে হালাল বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে। তবে শর্ত হচ্ছে বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম বলে সাব্যস্ত হতে হবে। (যেমন, মদ ও শূকর।) অন্যথায় নয়। (অর্থাৎ ওই সত্তাগত হারাম বিষয়টি যদি অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম বলে প্রমাণিত না হয়, তা হলে তাকে হালাল বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে না।) কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, ('আল বাহরুর রায়েক' এর গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর বর্ণনাকৃত) এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (এবং পার্থক্য) ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো সঠিক, যে (حرام لعينه 'সত্তাগত হারাম' এবং حرام لغيره 'অন্য কোনো কারণে হারাম' এর সংজ্ঞা ও তার পার্থক্য) সম্পর্কে অবগত। কিন্তু যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে, তার ক্ষেত্রে এই حرام لعينه এবং حرام لغيره এর পার্থক্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তার ক্ষেত্রে কুফরি সাব্যস্ত করার ভিত্তি হবে শুধু ক্বতয়ী [অকাট্য] হওয়া আর না-হওয়া। যদি সে অকাট্য হারামকে অস্বীকার করে, তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে; অন্যথায় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ বলে যে, মদ হারাম না, তা হলে তাকে কাফের বলা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আল বাহরুর রায়েক'।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'বকরীর যাকাত' এর অধীনে ২/৩৫ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, কাফের সাব্যস্ত করার ভিত্তি ক্বতয়ী[৪৫] [অকাট্য] হওয়ার উপর। যদিও তা حرام لغيره

---

[৪৫] বর্তমান যামানায় যারা 'রিবা' (সুদ) এর মতো ক্বতয়ী তথা অকাট্য বিষয়কে হালাল বলে দাবি করছে, অথচ তা হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআনের স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত; যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا [আর আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।] তাদের নিজেদের ঈমান সম্পর্কে ভাবা উচিত। কারণ শুধু এই সুদকে হালাল বলার কারণেই কুরআনে

[অন্য কোনো কারণে হারাম] হোক। (অর্থাৎ যদি حرام لغيره কেও হালাল বলে এবং তার হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য হয়, তা হলে তাকে কাফের বলা হবে।) তিনি বলেন, 'অযুহীন অবস্থায় নামায পড়া' এই শিরোনামের অধীনেও ১/৭৪ পৃষ্ঠায় কিছু আলোচনা এসেছে।

উসূলে দীন ও অকাট্য বিষয়ের অস্বীকারকারী সর্বসম্মতিক্রমে কাফের

(আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রদ্দুল মুহতার' নতুন সংস্করণের ৩/৩১০, ৪২৮ পৃষ্ঠায় باب البغاة-এ খারেজীদের কাফের প্রতিপন্ন না করা সংশ্লিষ্ট 'ফাতহুল ক্বদীর' এর ওই ভাষ্য, যার বরাত দিয়েছেন 'আদ্দুররুল মুখতার' এর গ্রন্থকার, তা উদ্ধৃত করার পর সংশোধনের নিমিত্তে বলেন–

কিন্তু শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসায়ারা'য় স্পষ্ট করেছেন যে, উসূলে দীন এবং জরুরিয়াতে দীন বিরোধী (অস্বীকারকারী) সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি জগতকে অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করবে অথবা কেয়ামতের দিন সশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করবে, কিংবা আল্লাহ তাআলা যাবতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েরও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন– এ বিষয়টি অস্বীকার করবে (সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের)। কাফের হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য হচ্ছে এ সমস্ত (উসূল এবং জরুরিয়াতে দীন) ব্যতীত অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ,

---

কারীমে তায়েফবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ তারা মুসলমান হয়েছিল এবং নামাযের প্রবক্তা ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

[হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে, তা ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড়, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।]

এ আয়াতটি সেই তায়েফবাসীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে এবং সুদকে হালাল বলার কারণেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছিল। (দেখুন, 'ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া' এর ৪/২৬৮-২৮২ পৃষ্ঠা।–[উর্দূ] অনুবাদক

আল্লাহ্ তাআলার সিফাত ও গুণাবলি অনাদি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যাবতীয় গুণাবলি আল্লাহ তাআলার সত্তার সঙ্গে স্থায়ী ও অনাদি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা) অথবা আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা (ভালো ও মন্দ উভয়ের জন্য) ব্যাপক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা (অর্থাৎ কেবল কল্যাণকর ও ভালো বিষয়গুলোই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও মর্জির অধীন বলে বিশ্বাস করা এবং অকল্যাণ ও মন্দকে তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির বাইরে বলা), কুরআনকে মাখলুক বলা (অর্থাৎ এ জাতীয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও গবেষণাসাপেক্ষ আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম এগুলোর অস্বীকারকারীকেও কাফের বলেন, আবার কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম কাফের বলেন না। বরং ফাসেক ও বিদআতী বলেন।)

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শায়েখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং বলেন–

তেমনিভাবে শরহে 'মুনিয়াতুল মুসল্লী' তে বর্ণনা করেছেন যে–

> কোনো সন্দেহ (এবং তাবীল) এর উপর ভিত্তি করে শায়খাইন (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু) এর খেলাফতকে অস্বীকারকারী ও (নাউযুবিল্লাহ) যারা তাঁদেরকে গালি দেয়, তাদেরকেও কাফের বলা হবে না। (বরং ফাসেক ও বিদআতী বলা হবে।) তবে ওই ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম, যে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে খোদা বলে দাবি করে। (যেমন, 'হুলুলিয়্যা' ফেরকার বিশ্বাস।) এবং যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম (হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর স্থলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ওহী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে) ভুল করেছেন। (যেমন, গালী/কট্টর শিয়াদের আকীদা।) এ ধরনের লোকদের অবশ্যই কাফের বলা হবে। কেননা, এ জাতীয় আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি নিঃসন্দেহে কোনো সন্দেহ (তাবীল) এবং সত্যান্বেষণের চেষ্টা-মেহনত ও অনুসন্ধানের উপর নয়। (বরং এগুলোর ভিত্তি শুধুই কুফরি ও মানসিক কলুষতার উপর রচিত।)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর উপর অপবাদ আরোপকারী কাফের

তারপর আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

আমি বলি, এমনিভাবে ওই ব্যক্তিও কাফের, যে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর উপর অপবাদ আরোপ করবে কিংবা তাঁর পিতা (হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) এর সাহাবী হওয়াকে অস্বীকার করবে। কেননা, এটা কুরআনে করীমকে পরিষ্কার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। যেমনটি এর পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

'শায়খাইন' এর খেলাফতকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের

(গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ শায়খাইন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে শরহে 'মুনিয়াতুল মুসল্লী'র উল্লিখিত বর্ণনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে,–)

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম শায়খাইন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর খেলাফত অস্বীকারকারীদেরকে কাফের বলেন। যেমন, এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য শরহে 'ওহবানিয়্যা' থেকে 'দুররে মুনতাকা'য় নিম্নবর্ণিত কবিতা উদ্ধৃত করেছেন–

وصح تكفير نكير خلافة الله
عتيق وفى الفاروق ذاك اظهر

'খেলাফতে আতীক তথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারীর ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, সে কাফের। তেমনিভাবে উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারীও কাফের এবং এ কথাই মজবুত ও শক্তিশালী।'

তিনি বলেন, বরং 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' এবং 'সাওয়ায়েক'-এ তো বর্ণনা করেছেন যে–

'আসল (মাবসূত)-এ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন (যে, শায়খাইনের

খেলাফতকে অস্বীকারকারী কাফের।) এমনিভাবে 'ফাতাওয়ায়ে জহীরিয়্যা"-তেও এ বক্তব্যকে সঠিক বলেছেন। যেমনটি 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা' (আলমগীরী)-তে উল্লেখ আছে।

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অসাবধানতা

তিনি বলেন, অতএব আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ উল্লিখিত আলোচনায় শরহে 'মুনিয়াতুল মুসল্লী'র বরাতে সন্দেহের উপর ভিত্তি করে শায়খাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত না করার ক্ষেত্রে অসর্তকতা অবলম্বন করেছেন। 'খাযানাতুল মুফতিয়্যীন' নামক কিতাবেও এ অভিমতটিকে সঠিক বলা হয়েছে। (যে, শায়খাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারী কাফের।) যেমনটি 'ফাতাওয়ায়ে ইনকুরউইয়া'তে বর্ণিত আছে।

এমনিভাবে 'ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়্যা'র ২/৯৪ পৃষ্ঠায় 'বুরহান' ও 'ফাতাওয়ায়ে বদীয়িয়্যা' থেকে এবং ফাতাওয়ার অন্যান্য কিতাবসহ কোনো কোনো শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। (যে, শায়খাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারী কাফের।) 'বুরহানের ভাষ্য নিম্নরূপ—

> আমাদের (হানাফী) উলামাগণ এবং ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাসেক ও ওই বিদআতী (গোমরাহ)'র ইমামতিকে মাকরূহ বলেছেন, যার বিদআত (গোমরাহী)'র উপর কুফরির হুকুম লাগানো হয়নি; লক্ষ্যণীয়, এখানে মাকরূহ বলেছেন, ফাসেদ বলেননি; যেমনটা ফাসেদ বলে থাকেন ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ। অতএব, আমাদের নিকট সমস্ত আহলে বিদআত (গোমরাহদের) পিছনে নামাদের ইকতিদা করা জায়েয। তবে জাহমিয়া, ক্বদরিয়া, কট্টরপন্থী রাফেযী, কুরআনকে মাখলূক বলে দাবিকারী, খেতাবিয়্যা এবং মুশাব্বাহ ফেরকা ব্যতীত। (কেননা, এদের পিছনে নামায পড়া সুনিশ্চিতভাবে জায়েয নেই। কারণ, এই সমস্ত ফেরকা কাফের।

তিনি বলেন, সারকথা হচ্ছে এই যে, যে মুসলমান আহলে কিবলা হবে এবং [গোমরাহীতে] কট্টরপন্থী না হবে এবং তার উপর কুফরির হুকুম লাগানো না

হবে, তা হলে তার পিছনে নামায পড়া তো জায়েয আছে, তবে মাকরূহ হবে। আর যে শাফায়াত, আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ, কবরের আযাব, কিরামান কাতিবীন ইত্যাদি মুতাওয়াতির বিষয়কে অস্বীকার করবে, তার পিছনে নামায পড়া সুনিশ্চিতভাবে জায়েয নেই। এই অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রামাণ্যতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'তাওয়াতুর' এর স্তরে পৌঁছে গেছে।

হাঁ, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর আজমত ও জালালিয়্যতের কারণে দৃষ্টিগোচর হতে পারেন না, সে বিদআতী। (কাফের নয়। কেননা, সে মূলত আল্লাহর দিদারের বিষয়টি অস্বীকার করছে না, বরং তার জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে দিদারে ইলাহীকে অসম্ভব বলে মনে করছে।) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 'মুজার উপর মাসাহ' করার বিষয়টি অস্বীকার করবে, অথবা হযরত আবু সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু কিংবা হযরত উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু অথবা হযরত উসমান গনী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকে অস্বীকার করবে, সে তার পিছনে নামায আদায় করা সুনিশ্চিতরূপে না-জায়েয। (কেননা, সে মুতাওয়াতির ও সর্ব-ঐকমত্যের বিষয়কে অস্বীকারকারী ও কাফের।) তবে হাঁ, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে (অপর তিন খলীফার চেয়ে) শ্রেষ্ঠ মনে করে, তার পিছনে নামায আদায় করা জায়েয। কেননা, সে-ও বিদআতী। (কাফের নয়।)

তিনি বলেন, এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ তো ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আহলে বিদআত তথা বিদআতীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই।

সে সকল খারেজীরা কাফের, যারা হযরত আলী রাযি.কে কাফের বলে

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া'র রচয়িতা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া'র শেষে ওই সকল খারেজীদের কাফের হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যারা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাফের বলে। باب التولى التبرى এর ষষ্ঠ মুকাদ্দামায় তিনি বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবে 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া'র রচয়িতা ওই স্থানে কুফর ও ইরতিদাদ [মুরতাদ হয়ে যাওয়া]'র মাঝে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু ফিকহের কিতাবে এই

পার্থক্য শুধু ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে মুসলমান হওয়ার দাবি করে, প্রসিদ্ধ নয়। মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃত ধর্ম পরিবর্তন করাকে 'ইরতিদাদ' আর ধর্ম পরিবর্তন করার ইচ্ছা ছাড়া হলে তাকে 'কুফর' বলেন। বাকি তাঁর বর্ণনা থেকে উভয় হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য প্রকাশ পায় না; শুধু এতটুকু ছাড়া যে, মুরতাদকে হত্যা করা ওয়াজিব আর কাফেরকে হত্যা করা জায়েয।

'ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়্যা'তে হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অধিকাংশ বক্তব্য ও আলোচনা থেকেও খারেজী ও তাদের মতো অন্যান্য লোকদের কুফরির বিষয়টিই প্রকাশ পায়। বাকি 'ফাতওয়ায়ে আযীযিয়্যা'র ১/১৯ পৃষ্ঠায় তাঁর যে বক্তব্য রয়েছে, তা স্বয়ং তাঁর নিকটই পছন্দনীয় নয়। যেমনটা তিনি নিজেই ১/১২ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ও পরিষ্কার করেছেন।

'ইলতিযামে কুফর' ও 'লুযূমে কুফর' এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই

হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফাতওয়ায়ে আযীযিয়্যা'র ১/৯৫ পৃষ্ঠায় বলেন, সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বিষয়াবলিতে 'ইলতিযামে কুফর' এবং 'লুযূমে কুফর' এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কোনো কুফরি কথা বলে কিংবা কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়, সে সর্বাবস্থায়ই কাফের হয়ে যাবে। চাই সে তা জেনে-বুঝে করুক বা না-বুঝে করে থাকুক; চাই সে কুফরির ইচ্ছা করুক, চাই কুফরির ইচ্ছা না করুক।) 'তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া'য় 'ধোঁকা : ৯১' এর অধীনে এবং 'ইমামত অধ্যায়' এর ৬ নম্বর আকীদার অধীনে পবিত্র কুরআনের আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ এর অধীনে এর আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা باب التولى التبرى এর পঞ্চম মুকাদ্দামায়ও এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়ত ও রিসালাতের দাবি করা কুফরি ও ইরতিদাদ

আল্লামা শিহাব খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে শিফা'য় 'নাসীমুর রিয়ায' (৪র্থ খণ্ড) فصل الوجه الثالث এর অধীনে ৪৩০ ও ৫৭৯ পৃষ্ঠায় বলেন–

তেমনিভাবে ইবনে কাসেম মালেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ওই ব্যক্তিকে মুরতাদ বলেছেন, যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে এবং এই দাবি করে যে, আমার কাছে ওহী আসে। মালেকী মাযহাবের সুহনূন রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমতও এটিই। ইবনে কাসেম মালেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ নবুওয়তের দাবিদারকে মুরতাদ বলেছেন; চাই সে গোপনে তার নবুওয়তের দাওয়াত প্রচার করুক, কিংবা প্রকাশ্যে। যেমন, মুসাইলামাতুল কায্যাব (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি) অতিবাহিত হয়েছে।

আসবাগ ইবনুল ফরজ আলকী বলেন, যে ব্যক্তি এই দাবি করবে যে, আমি নবী; আমার কাছে ওহী আসে, সে মুরতাদের মতো। (অর্থাৎ তার হুকুম তা-ই, যা মুরতাদের হুকুম।) কেননা, সে আল্লাহর কিতাব (খাতামুন্নাবিয়্যীন এর আয়াত)-কেও অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি শেষ নবী; আমার পর কোনো নবী আসবে না।' এর পাশাপাশি সে আল্লাহ তাআলার উপর অপবাদও আরোপ করে এবং বলে যে, আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে রাসূল বানিয়েছেন।

যে ইহুদী নিজেকে নবী বলে দাবি করবে এবং এই দাবি করবে যে, 'আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাখলূকের নিকট তাঁর হুকুম-আহকাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি', অথবা এই দাবি করে যে, 'তোমাদের নবীর পর আরও একজন নবী শরীয়ত নিয়ে আগমন করবেন', হযরত আশহাব রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই ইহুদী যদি এই দাবি প্রকাশ্যে করে এবং সকলের সামনে খোলাখুলি বলে থাকে, তা হলে মুরতাদের ন্যায় তাকেও তাওবা করানো হবে।

(যদি সে গোপন রাখে, তা হলে নয়।) অতএব, যদি সে তাওবা করে নেয় এবং ফিরে আসে, তা হলে ভালো কথা। অন্যথায় তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। কারণ, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ (আমার পর কোনো নবী আসবে না)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নবুওয়ত ও রিসালাতের দাবি করে আল্লাহ তাআলার উপর অপবাদ আরোপ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি ও চরিত্রে ক্রটি ও দোষ খোঁজা কুফরির কারণ

আল্লামা শিহাব খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে শিফা'র ৪/৪৩১ পৃষ্ঠায় فصل الوجه الثالث এর অধীনে বলেন–

সুহনূন এর বন্ধু আহমাদ ইবনে আবু সুলাইমান, যাঁর অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের [গায়ের] রং কালো ছিল, তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। কেননা, সে (একে তো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা বলে, (দ্বিতীয়ত) কালো রং দূষণীয়ও বটে। (আর এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছ ও হেয়ও করে।) কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো বর্ণের ছিলেন না। বরং তাঁর রং ছিল গোলাপের মতো লাল-সাদা ও প্রস্ফুটিত। যেমনটি ইতিপূর্বে তাঁর দেহাবয়বের বর্ণনা সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি ও হুলিয়া মুবারক সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনাও কুফরির কারণ

আল্লামা খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, পরবর্তী যামানার কোনো কোনো আলেম বলেন যে, ইবনে আবি সুলাইমান রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলির মধ্য থেকে যে কোনো গুণের ব্যাপারে মিথ্যা বর্ণনা কুফরির কারণ ও হত্যার উপযুক্ত করে দেয়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। বরং

মিথ্যা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বিষয়টি থাকাও জরুরি। যেমন উপরোল্লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। কেননা, কালো রং অপছন্দনীয় ও দূষণীয়।

আল্লামা খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, অথচ তোমরা জান যে, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (মানহানিকর বিষয় ও দোষ থাকুক কিংবা না থাকুক।) কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র গুণাবলি ও হুলিয়া মুবারকের যে কোনো গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে (মিথ্যা এবং) বাস্তবতাপরিপন্থী কোনো গুণকে তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য থেকে খালি হতে পারে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পরিপূর্ণ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর চেয়ে পরিপূর্ণ কোনো গুণের কল্পনাও করা যায় না। বরং তাঁর বিপরীতে যে কোনো গুণই তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করা হবে, অবশ্যই অবশ্যই তাতে তাঁর গুণাবলির ঘাটতি হবে। (এজন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র গুণাবলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ভুল ও মিথ্যা বর্ণনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মুক্ত হতে পারে না।) অতএব, এ ক্ষেত্রে পরবর্তী যামানার উলামায়ে কেরামের ওজর-আপত্তি যথাযোগ্য ও স্থানোপযুক্ত নয়।

আল্লাহ্ তাআলার সিফাতকে নশ্বর কিংবা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা কুফরি

মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ পাকিস্তানের সাঈদ কোম্পানি থেকে প্রকাশিত 'শরহে ফিকহে আকবার' এর ২৯ পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ তাআলার সিফাত তথা গুণাবলি সম্পর্কে বলেন,

> আল্লাহ তাআলার মৌলিক সমস্ত সিফাত অনাদি। সেগুলো নশ্বরও নয়, সৃষ্টও নয়। সুতরাং যে-ই সেগুলোকে মাখলূক কিংবা নশ্বর বলে, অথবা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে, (অনাদিও বলে না, নশ্বরও বলে না) অথবা সেগুলোর ব্যাপারে শক-সন্দেহ পোষণ করে, সে আল্লাহ তাআলার (সিফাত এর) অস্বীকারকারী এবং কাফের।

আল্লাহ তাআলার কালামকে মাখলূক বলে বিশ্বাস করা কুফরির কারণ

'কিতাবুল ওসিয়্যাহ'তে বলেন–

> যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কালামকে মাখলূক বলে, সে আল্লাহ তাআলার সিফাতে কালামের অস্বীকারকারী এবং কাফের।

সিফাতে কালাম সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে ফিকহে আকবার' এর ৩০ পৃষ্ঠায় বলেন–

> ইমাম ফখরুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর সঙ্গে (দীর্ঘদিন যাবৎ) খলকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছি। অবশেষে আমরা উভয়েই এ কথার উপর একমত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলূক বলে, সে কাফের। এ অভিমতই ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে (সহীহ সনদে) বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিদাতা, তাঁকে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী কাফের; যে তার কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের

কাযী আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'কিতাবুল খারাজ'[৪৬]-এ বলেন–

> যে মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) গালি দিবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে কিংবা তাঁর দোষ বের করবে অথবা যে কোনোভাবে তাঁকে হেয় কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, সে কাফের এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে।

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শিফা'য় বলেন–

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিদাতা কাফের। এমন ব্যক্তির কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিংবা সে জাহান্নামের

---

[৪৬]. ইসলাম ধর্মত্যাগী মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত অধ্যায় : ১৮২

আযাবে পাকড়াও হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে, সে-ও কাফের। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিদাতার তাওবা-ও গ্রহণযোগ্য নয়

'মাজমাউল আনহার' 'আদ্দুররুল মুখতার' 'বায্যাযিয়া' 'দুরার' এবং 'খাইরিয়া'য় বর্ণিত আছে–

> নবী-রাসূলগণের মধ্যে যে কোনো নবী-রাসূলকে গালিদাতা (কাফের) এর তাওবা সাধারণভাবে গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের কাফের হয়ে যাওয়া এবং জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সে-ও কাফের।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

দুনিয়াবী হুকুম-আহকামের দিক বিবেচনায় তার তাওবা কবুল ও গ্রহণযোগ্য হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে তো মতভিন্নতা আছে। (কেউ বলেন, রাসূলকে গালিদাতার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়েছে। আবার কেউ বলেন, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য। আবার কারও কারও নিকট এ ব্যাপারে কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে।) তবে তার মাঝে এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য। (অর্থাৎ যদি সে খাঁটি দিলে তাওবা করে এবং সারা জীবন ওই তাওবার উপর অটল থাকে, তা হলে আখেরাতে সে রাসূলকে গালি দেওয়ার আযাব ও কুফরি থেকে বেঁচে যাবে।) এ ব্যাপারে 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'য় উদ্ধৃত 'মুহীত' এর ভাষ্যের দিকে লক্ষ্য করা উচিত। তাতে হানাফী মাশায়েখের অভিমত এই বর্ণিত আছে যে, 'রাসূলকে গালিদাতার তাওবা আল্লাহ তাআলার নিকটও গ্রহণযোগ্য হবে না।' এ অভিমত আমি একমাত্র 'মুহীত' এর ভাষ্য ছাড়া আর কোথাও পাইনি। হতে পারে এটা লিখার ভুল।

দীনের জরুরি ও অকাট্য বিষয়কে অস্বীকারকারী আহলে কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত হলেও কাফের : আহলে কিবলার অর্থ ও উদ্দেশ্য

মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে ফিকহে আকবার' (এর ১৯৫ পৃষ্ঠা)-এ বলেন–

মাওয়াকিফ-এ লিখেছেন, কোনো আহলে কিবলাকে কেবল ওই সকল কথা ও কাজের উপর ভিত্তি করে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে, যে সকল কথা কিংবা কাজে এমন বিষয়কে অস্বীকার করা হবে, যার সুবূত (প্রতিষ্ঠা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একীনী ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত থাকবে অথবা তা 'মুজমা আলাইহি' হবে (অর্থাৎ তার উপর উম্মতের ইজমা সংঘটিত থাকবে।) উদাহরণস্বরূপ, মাহরামদেরকে (অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তাদেকে) হালাল মনে করা ও দাবি করা।

এরপর কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সকলেরই জানা যে, হানাফী উলামায়ে কেরামের উক্তি– لَا يَجُوْزُ تَكْفِيْرُ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ (কোনো গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলা'কে কাফের সাব্যস্ত করা জায়েয নেই) এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, যে-ই নামাযে তার চেহারাকে কিবলামুখী করবে, তাকেই আর কখনও কাফের বলা জায়েয হবে না। [বিষয়টি এমন নয়] কেননা, যে সকল কট্টরপন্থী রাফেযীর আকীদা হচ্ছে এই যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী পৌছানোর ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো মূলত হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু'র নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন। তিনি (জিবারাঈল আলাইহিস সালাম ভুল করে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে দিয়েছেন। [এ আকীদা যারা পোষণ করে, তারা] অথবা যারা এ আকীদা পোষণ করে যে, হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু (নাউযুবিল্লাহ) খোদা ছিলেন, এ ধরনের লোক কখনোই মুমিন নয়। যদিও তারা আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস– (যা থেকে আলোচিত উক্তিটি গ্রহণ করা হয়েছে)– مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ ('যে ব্যক্তি আমাদের [মতো] নামায পড়বে, আমাদের কিবলাকে সামনে রাখবে এবং আমাদের জবাইকৃত পশুকে (হালাল

মনে করবে এবং) খাবে, সে মুসলমান।')– এর উদ্দেশ্যও এ-ই যে, (সম্পূর্ণ দীন-শরীয়ত মানবে ও পালন করবে এবং কোনো ধরনের কুফরি আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করবে না এবং কোনো ধরনের কুফরি কথা ও কাজে লিপ্ত হবে না। এ হাদীসের উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, যে কেউ-ই এ তিন কাজ করবে, সে-ই মুসলমান; যদিও সে কুফরি আকীদা পোষণ করে কিংবা কুফরি কোনো কথা কিংবা কুফরি কোনো কাজে লিপ্ত থাকে।)

রাফেযী ও কট্টরপন্থী শিয়া

'গুনইয়াতুত্ তালিবীন'– এ বলেন–

রাফেযীরা এ-ও দাবি করে যে, হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু নবী ছিলেন। (সমস্ত কুফরি আকীদাসমূহ বর্ণনা করার পর বলেন) আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ সমস্ত সৃষ্টিজীব কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর লা'নত করবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের আবাদ বসতিগুলো বিরান করে দিন; অস্তিত্বের পাতা থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিন; পৃথিবীতে তাদের কাউকেই জীবিত না রাখুন। কারণ, এসব লোক তাদের বাড়াবাড়িতে শেষ চূড়ায় পৌঁছে গেছে এবং নিজেদের কুফরি আকীদার উপর জিদ ধরে বসে আছে। ইসলামকে তারা একেবারেই 'বিদায়' জানিয়ে দিয়েছে। ঈমানের সাথে তাদের আর কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকেনি। আল্লাহ্ তাআলা(র সত্তা ও গুণাবলি)কে, নবীগণ(এর শিক্ষা) ও কুরআন(এর নস সমূহ)কে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাদের অকল্যাণ থেকে স্বীয় আশ্রয়ে রাখুন।

তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে নবীর নামকে 'তাছগীর' (সংক্ষিপ্ত/ছোট) করাও কুফরী

'তোহ্ফা' শরহে 'মিনহাজ'– এ বলেন–

... কিংবা কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করলে, অথবা কোনো না কোনো ভাবে তাঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় করলে, উদাহরণস্বরূপ, তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে 'তাছগীর' (সংক্ষিপ্ত/ছোট) করে নাম উচ্চারণ করা, অথবা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কারও নবুওয়তকে জায়েয বললে এমন ব্যক্তি কাফের।

মনে রাখবেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। (তাঁর পরে নয়।) অতএব, কেয়ামতের পূর্বে শেষ যামানায় আকাশ থেকে তাঁর অবরতণ করায় কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

রাফেযীরা নিঃসন্দেহে কাফের

আরিফ বিল্লাহ আল্লামা আব্দুল গনী নাবলিসী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে ফারায়েদ'-এ বলেন–

ওই সকল রাফেযীদের ধর্মমত ভ্রষ্ট ও বাতিল হওয়ার বিষয়টি এমনই পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, তার জন্য কোনো বর্ণনা কিংবা কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। (তাদের আকীদা-বিশ্বাসসমূহ) কীভাবে (সহীহ ও সঠিক হতে পারে)? যখন সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অথবা তাঁর পরে অন্য কারও নবী হওয়ার বৈধতা বেরিয়ে আসে; এবং এর দ্বারা কুরআনে করীমকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, কুরআনে করীম তো স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী ও রাসূল। অপরদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করছেন, أَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ (আমি [সকলের] পরে আগমনকারী; আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।) আর এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা যে, কুরআন ও হাদীসের এ সকল ভাষ্যের ওই প্রকাশ্য অর্থই উদ্দেশ্য, যা সকলেই জানে ও বোঝে। এ বিষয়টিও (কুরআন ও হাদীস অস্বীকার করাও) ওই সকল প্রসিদ্ধ বিষয়ের একটি, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ফালসাফীদেরকে কাফের বলেছি। (তা হলে রাফেযীদেরকেন কাফের বলব না?) আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

কাফের ও মুবতাদী' এর পার্থক্য : কোন বিষয়ে আহলে কিবলাকে কাফের সাব্যস্ত করা হয়

'আকায়েদে ইযুদিয়া'য় বলেন–

আহলে কিবলাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা কেবল ওই সকল আকীদা-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই কাফের বলে থাকি, যেগুলোর দ্বারা সর্বময়

ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধিকারী স্রষ্টাকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয় কিংবা যেগুলোতে শিরক পাওয়া যায় অথবা যেগুলোতে নবুওয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করার বিষয় পাওয়া যায় কিংবা 'মুজমা আলাইহি' [সর্বসম্মত] কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার বিষয় পাওয়া যায় অথবা কোনো হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য ফাসেদ ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারীরা মুবতাদী' (তথা গোমরাহ)।

যে ব্যক্তি কোনো নবুওয়তের দাবিদারের কাছ থেকে মু'জিযা তলব করবে, সে-ও কাফের

আবু শাকুর সালেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'তামহীদ'-এ বলেন–

রাফেযীদের আকীদা হচ্ছে, এ পৃথিবী কখনোই নবীর উপস্থিতি থেকে খালি হয় না। এ আকীদা পরিষ্কার কুফরি। কেননা, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' [সর্বশেষ নবী] উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর পর যে কেউই নবুওয়তের দাবি করবে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি (তাকে সত্যায়ন করার মানসে) তার কাছ থেকে মু'জিযা তলব করবে, সে-ও কাফের। কারণ, তার কাছ থেকে মু'জিযা তলব করা 'খতমে নবুওয়ত' এর আকীদায় সন্দেহ পোষণ করার দলীল। (এবং নবুওয়ত বাকি থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।) রাফেযীদের বিপরীতে এই আকীদা পোষণ করাও ফরয যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও কেউ নবুওয়তে শরীক ছিল না। কেননা, রাফেযীরা বলে যে, হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নবুওয়তে অংশীদার ছিল। এ আকীদা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট কুফরি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়তের দাবিদারদেরকে হত্যা করে শূলিতে চড়ানো হয়েছে

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শিফা'য় বলেন–

খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান হারিছ নামক এক নবুওয়তের দাবিদারকে কতল করে (শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য) শূলিতে লটকিয়ে রেখেছিলেন। তেমনিভাবে আরও অনেক খলীফা ও শাসকগণও এ জাতীয় নবুওয়তের দাবিদারদের কতল করেছেন এবং উলামায়ে উম্মত ওই কতলকে

সত্যায়ন ও সমর্থন করেছেন। যারাই ওই সকল সত্যায়নকারী ও সমর্থক উলামায়ে কেরামের বিরোধী, তারাও কাফের।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'আল বাহরুল মুহীত'-এ সূরা আহ্যাবের তাফসীরের অধীনে এ ব্যাপারে উম্মতের আমলী ইজমার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'মুতাওয়াতির' ও 'মুজমা আলাইহি' বিষয়ের অস্বীকারকারী কাফের এবং নামাযের রুকন, শর্ত কিংবা তার স্বরূপ-প্রকৃতি অস্বীকারকারীও কাফের

কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শিফা'য় বলেন—

এমনিভাবে ওই ব্যক্তিকেও সুনিশ্চিতভাবে কাফের বলা হবে, যে শরীয়তের কোনোও না কোনো মূলনীতি এবং ওই সকল আকীদা-বিশ্বাস ও আমলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কিংবা অস্বীকার করবে, যা মুতাওয়াতিরভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে এবং প্রত্যেক যুগেই যার উপর উম্মতের ইজমা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরয হওয়া কিংবা সেগুলোর রাকাতসংখ্যা ও রুকু-সেজদার সংখ্যা অস্বীকার করবে এবং এ কথা বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তো আমাদের উপর সাধারণভাবে নামায ফরয করেছেন; তা যে পাঁচ ওয়াক্তের এবং এই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শর্তসমূহের.সাথে ফরয করা হয়েছে (যেমন, ইলমহীন পশ্চাদমুখী. কাঠমোল্লারা বলে থাকে) তা আমি মানি না; কেননা, কুরআনে তো এর কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস তো 'খবরে ওয়াহেদ' (প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়) এমন ব্যক্তি সুনিশ্চিতভাবে কাফের।

কাদের কাফের বলা হবে?

'শিফা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'খাফাজী'র ৪র্থ খণ্ডের ৫৪২-৫৪৭ পৃষ্ঠায় فصل فى بيان ما هو من المقالات كفر এর এবং 'শরহে শিফা' মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নির্বাচিত অংশ (যেখানে ওই সমস্ত লোককে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদেরকে কাফের বলা হবে।)

১. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে নবী মানে

খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

তেমনিভাবে আমরা ওই ব্যক্তিকেও কাফের বলব, যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অন্য কারও নবী হওয়ার দাবি করে। যেমন, মুসাইলামা কায্যাব অথবা আসওয়াদে আনাসী কিংবা অন্য কাউকে নবী বলে মানে। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কারও নবুওয়তের দাবি করে। (যেমন, মির্যায়ীরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়তের দাবিদার) কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হাদীসের নস ও স্পষ্ট ভাষ্য মোতাবেক 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' এবং সর্বশেষ রাসূল। তাদের এ সকল আকীদা ও দাবিসমূহের দ্বারা সে সকল নসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকার করা আবশ্যক হয়; যা পরিষ্কার কুফরি। যেমন, ঈসায়ী ফেরকা।[৪৭]

২. যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে

অথবা যে ব্যক্তি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নিজেকে নবী বলে দাবি করে। যেমন, মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকাফীসহ আরও কেউ কেউ নবুওয়তের দাবি করেছে। (অথবা যেমন, আমাদের যামানার মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ও

---

[৪৭]. ইহুদী ঈসা ইবনে ইসহাক এর প্রতি সম্বন্ধিত ইহুদীদের একটি ফেরকা। যারা ঈসা ইবনে ইসহাককে নবী মানত। মারওয়ানীদের আমলে ঈসা ইবনে ইসহাক নবুওয়তের দাবি করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু আরব জাতিসমূহের নবী বলে দাবি করত। আব্বাসীয় খেলাফত আমলের শুরুতে তাকে কতল করে দেওয়া হয়েছিল। –[উর্দূ] অনুবাদক

তার কাছে ওহী আসে বলে দাবি করেছে।) খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, প্রত্যেক ওই ব্যক্তির কাফের হওয়ার বিষয়টি একেবারেই পরিষ্কার, যে এ জাতীয় নবী দাবিদারদেরকে সত্যায়ন করার মানসে তাদের কাছে মু'জিযা তলব করবে। কেননা, এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কেউ নবী হওয়ার বিষয়টিকে জায়েয মনে করে তার কাছ থেকে মু'জিযা তলব করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কারও নবী হওয়া শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত অসম্ভব বিষয়। (যে ব্যক্তি একে জায়েয ও সম্ভব মনে করবে, সে কাফের।) তবে হাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা নবী দাবিদারকে মূর্খ ও বোকা সাব্যস্ত করা এবং তার মিথ্যা দাবিকে সকলের সামনে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে তার থেকে মু'জিযা তলব করে, তা হলে সেটা ভিন্ন কথা। (এমন ব্যক্তি মু'জিযা তলব করার দ্বারা কাফের হবে না।)

৩. যে ব্যক্তি নবুওয়তকে 'ইকতিসাবী' বলে দাবি করে

খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

তেমনিভাবে ওই ব্যক্তিও কাফের, যে নবুওয়তকে 'ইকতিসাবী' ও অন্তরের পরিশুদ্ধতার দ্বারা নবুওয়তের স্তরে পৌঁছা সম্ভব বলে দাবি করে এবং নবুওয়তকে [মানুষের চেষ্টা-মুজাহাদার দ্বারা] অর্জন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে। যেমন, দার্শনিক ও কট্টরপন্থী সূফীরা (এর দাবিদার)।

৪. যে ব্যক্তি নিজের কাছে ওহী আসে বলে দাবি করে

তিনি বলেন–

তেমনিভাবে ওই ব্যক্তিও কাফের, যে এই দাবি করে যে, 'আমার কাছে ওহী আসে।' যদিও সে নবী হওয়ার দাবি না করে। তিনি বলেন, উপরোল্লিখিত সকল ব্যক্তিবর্গ (এবং যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে, তারা সবাই) কাফের। কেননা, তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর স্পষ্ট বাণী ও দলিলের বিপরীত দাবি করে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে উম্মতকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, 'আমি খাতিমুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবী) এবং আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।

কুরআনে করীমও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' হওয়ার ব্যাপারে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানবজাতির রাসূল ও প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করে। সমস্ত উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা যে, এ আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা তাদের প্রকাশ্য অর্থই উদ্দেশ্য (এতে কোনো রূপকতা, ইঙ্গিত, বিশিষ্টতা কিংবা শর্ত বা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবে না এবং তিনি সমগ্র মানবজাতি [ও জিন জাতির]র জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ওই সকল আয়াত ও হাদীসের সেই অর্থই উদ্দেশ্য, যা তাদের শব্দ থেকে বোঝা যায়। এখানে না কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ আছে, আর না কোনো শর্তের সঙ্গে শর্তায়িত করার অবকাশ আছে। এজন্য উম্মতের সুবিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের নিকট কিতাবুল্লাহ, সুনানে রাসূল ও উজমায়ে উম্মতের আলোকে সে সমস্ত লোকের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই এবং ওই গোমরাহ ফেরকাসমূহের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, যারা এগুলোর বিরোধী কিংবা ইজমা শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে যাদের আপত্তি আছে। অচিরেই এ সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসছে।

৫. যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত ও হাদীসের নসকে তাদের প্রকাশ্য ও মুজমা আলাইহি অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়

তিনি বলেন–

তেমনিভাবে প্রত্যেক ওই ব্যক্তি কাফের হওয়ার ব্যাপারেও উলামায়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ তথা পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতকে রদ করবে অর্থাৎ তার জাহেরী ও প্রকাশ্য অর্থকে অস্বীকার করবে এবং তা না মানবে। যেমন, কিছু কিছু বাতেনী ফেরকা আছে, যারা কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট ও পরিষ্কার অর্থকে বাদ দিয়ে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, যা স্পষ্টরূপে ও অকাট্যভাবে জাহের এর খেলাফ (এবং তাহরীফ তথা বিকৃতির সমার্থক)। অথবা এমন কোনো হাদীসের অর্থকে খাছ করবে, যার অর্থ আম তথা ব্যাপক এবং তা সহীহ হওয়া ও তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। পাশাপাশি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের উপর ওই হাদীসের নির্দেশনা অকাট্য ও

সুনিশ্চিত। (অর্থাৎ সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে হাদীসটির জাহেরী ও প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য) না তার মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা-তাবীলের অবকাশ আছে, না তার অর্থকে খাছ করার সুযোগ আছে আর না হাদীসটি মনসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে। (এমন লোক) এ জন্য কাফের যে, কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসে এ জাতীয় তাবীল-ব্যাখ্যা ও তাখসীস কুরআন-হাদীসকে খেল-তামাশার বস্তু বানানোর নামান্তর। যেমন, উম্মতের উলামায়ে কেরাম 'রজম' তথা বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিষয়টি অস্বীকার করার কারণে খারেজীদেরকে কাফের বলেছেন। কেননা, 'রজম' এর ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত আছে এবং সুনিশ্চিতরূপে 'রজম' জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সাহিবে শরীয়ত থেকে এর প্রামাণ্যতা অকাট্য ও সুনিশ্চিত।

৬. যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলে না

তিনি বলেন–

এ জন্য (অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও মুজমা' আলাইহি তথা সর্বসম্মত নসসমূহে তাবীল-ব্যাখ্যা ও বিকৃতকারীদের কাফের হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে) আমরা প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকেও কাফের বলি, যারা ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলে না কিংবা তাদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন (ও দ্বিধা) করে অথবা তাদের কুফরির ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ পোষণ করে কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে; যদিও এ ব্যক্তি নিজে মুসলমান হওয়ার দাবিও করে এবং ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ধর্মকে বাতিলও বলে, তবুও এ ব্যক্তি [যে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলে না, সে] কাফের। কেননা, এ ব্যক্তি একজন সর্বজনস্বীকৃত কাফেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে নিজেই ইসলামের বিরোধিতা করে এবং এটি দীনের উপর স্পষ্ট অভিযোগ ও দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। (সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম ধর্ম মানে না এমন যে কাউকে কাফের না বলা ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা ও তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। অতএব, এ ব্যক্তি কাফের।)

৭. যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করে এমন কথা বলে, যার দ্বারা উম্মতের গোমরাহী কিংবা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি কুফরির অপবাদ আরোপিত হয়

তিনি বলেন–

এমনিভাবে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির কাফের হওয়ার বিষয়টিও অকাট্য ও সুনিশ্চিত, যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা মুখে উচ্চারণ করে বলবে, যার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে পথচ্যুত ও গোমরাহ প্রমাণ করা এবং তার কথা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের কাফের সাব্যস্ত হওয়াকে আবশ্যক করে। যেমন, রাফেযীদের মধ্যে 'কামিলিয়্যা' ফেরকা; যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সমস্ত উম্মতকে শুধুমাত্র এজন্য কাফের বলে যে, তারা হযরত আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুকে খলীফা বানায়নি। এমনকি স্বয়ং আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুকেও তারা কাফের মনে করে। কারণ, তিনি নিজে (খেলাফত লাভ করার জন্য) অগ্রসর হননি এবং নিজের হক তলব করেননি। (নাউযুবিল্লাহ) এ সকল বিভিন্ন কারণে কাফের। কারণ, সমস্ত ধর্ম ও জাতিকেই তারা অস্বীকার করে বসেছে।

৮. যে মুসলমান এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয়, যা নির্দিষ্টভাবে কুফরের প্রতীক

তিনি বলেন–

এমনিভাবে (অর্থাৎ উল্লিখিত লোকদের ন্যায়) আমরা প্রত্যেক ওই মুসলমানকেও কাফের বলি, যে এমন কোনো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়, যার ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, তা কাফেরদের কাজ। এ কাজ ওই ব্যক্তিকে কাফেরই বানিয়ে দেয়। যদিও ওই ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং ওই কুফরি কাজ করার পাশাপাশি বড় আওয়াজে নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করে।

কুফরি কথা বলনেওয়ালার সমর্থনকারী ও প্রশংসাকারীও কাফের

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ আল্লামা খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর শেষ কথাকে সমর্থন করে বলেন, 'আল বাহরুর রায়েক' গ্রন্থের ৫/১৩৪ পৃষ্ঠায় এবং এ ছাড়াও অন্যান্য ফিকহের কিতাবে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি গোমরাহ আকীদাওয়ালা কোনো ব্যক্তির কথার প্রশংসা [সমর্থন] করে অথবা

এ কথা বলে যে, এটি (সাধারণ মানুষের বোধ-বুদ্ধির উর্ধ্বে) বাতেনী কথা (সকলে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম নয়), কিংবা এ কথা বলে যে, এ কথার সঠিক অর্থও হতে পারে (এবং ওই কথার বাস্তবতাবিরোধী কোনো ব্যাখ্যা করে), এমতাবস্থায় ওই বক্তার কথা যদি কুফরি হয় (কুফরিকে আবশ্যক করে) তা হলে এ কথার প্রশংসাকারী [সমর্থনকারী] (অথবা ওই কথাকে সঠিক বলে দাবিকারী কিংবা তার ব্যাখ্যাকারী)ও কাফের হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও 'আল আ'লাম' গ্রন্থের الكفر المتفق عليه অধ্যায়ের অধীনে হানাফীগণের কিতাবসমূহের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন–

> 'যে ব্যক্তি মুখে কোনো কুফরি কথা বলবে, তাকে কাফের বলা হবে। যে ব্যক্তি ওই কথার প্রশংসা [সমর্থন] করবে কিংবা পছন্দ করবে, তাকেও কাফের বলা হবে।'

যে ইচ্ছাকৃত কুফরি কথা বলে তার কথার কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়

'রদ্দুল মুহতার' (শামী)র ৩/৩৯৩ পৃষ্ঠায় 'আল বাহরুর রায়েক' এর বরাতে 'বায্যাযিয়্যা' থেকে উদ্ধৃত করেন–

> কিন্তু যখন (মুখে কুফরি কথা উচ্চারণকারী) স্পষ্ট করে দিবে যে, আমার উদ্দেশ্য সেটাই, যা কুফরিকে আবশ্যক করে, তা হলে (সে কাফের হয়ে যাবে এবং) কোনো ব্যাখ্যা তার জন্য উপকারী হবে না। (অর্থাৎ তাকে কুফরি থেকে বাঁচাতে পারবে না।)

কুফরি কথা উচ্চারণকারীর নিয়তের ধর্তব্য কোন অবস্থায় এবং কোথায়?

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (আলমগীরী)-তে 'মুহীত' প্রভৃতি কিতাবের বরাতে উদ্ধৃত করেন–

> যদি কোনো মাসআলার বিভিন্ন সুরত থাকে এবং সেগুলোর সবগুলো সুরতই কুফরকে আবশ্যককারী হয় আর মাত্র একটি সুরত এমন হয়, যা কুফরি থেকে রক্ষা করে, তা হলে মুফতী সাহেবের জন্য সেই সুরতটিই গ্রহণ করা উচিত। (এবং কুফরির হুকুম না লাগানো উচিত) তবে যদি বক্তা নিজেই স্পষ্টভাবে এ কথা বলে যে, এই (কুফরি আবশ্যককারী) সুরতই আমার উদ্দেশ্য, তা হলে (সে

কাফের হয়ে যাবে এবং) কোনো ধরনের তাবীল বা ব্যাখ্যা তার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে না। (কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না) আরও বলেন : অতঃপর যদি (কুফরি কথা) উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্য ওই সুরত হয়, যা কুফরি থেকে রক্ষা করে, তা হলে সে মুসলমান। (এবং তার তাবীল-ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে।) আর যদি তার উদ্দেশ্য সেই সুরতই হয়, যা কুফরিকে আবশ্যক করে, (তা হলে সে কাফের) কোনো মুফতীর ফতোয়া তার জন্য উপকারী নয়। (কুফরি থেকে বাঁচাতে পারে না। সারকথা হচ্ছে এই যে, কোনো কথার সঠিক তাবীল ও ব্যাখ্যা সত্তাগতভাবে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু [কাফের হওয়া না-হওয়ার ভিত্তি] তার উপর নয়, বরং বক্তা বা উচ্চারণকারীর নিয়তের উপর। কুফরির ইচ্ছা করলে নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে; যদিও তার সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে। জেনে রাখা দরকার যে, এ সকল আলোচনা ওই তাবীল-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রজোয্য, যা আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন ও মূলনীতির দিক থেকে সহীহ হবে এবং শরীয়তের উসূলের পরিপন্থী না হবে। যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হামুভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কিতাব 'আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' এর টীকায়ও 'ইমাদিয়া'র বরাতে এ কথাই লিখেছেন এবং 'দুররে মুখতার'-এও 'দুরার' প্রভৃতি কিতাবের বরাতে এ কথাই বর্ণিত আছে।

কুফরি কথা হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ারছলে বললেও বক্তা নিশ্চিতরূপে কাফের হয়ে যাবে; এ ক্ষেত্রে না তার নিয়তের ধর্তব্য আছে না আকীদা-বিশ্বাসের

'রদ্দুল মুহতার' (শামী) ৩/৩৯৩ পৃষ্ঠায় আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'বাহ্র' এর বরাতে বলেন–

মোটকথা, যে ব্যক্তি যবানে কুফরি কথা উচ্চারণ করে, চাই তা হাসি-মজাক করে হোক কিংবা ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে হোক, ওই ব্যক্তি সকলের নিকটই কাফের। এ ক্ষেত্রে তার নিয়ত কিংবা আকীদার কোনো ধর্তব্য নেই। (কেননা, এটা দীনের সাথে উপহাস; যা স্বতন্ত্রভাবে নিজেই কুফরিকে

আবশ্যক করে।) যেমন, 'ফাতাওয়ায়ে খানিয়া'য় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। (এ থেকে বোঝা গেল, নিয়তের ধর্তব্য কেবল তখনই হবে, যখন কুফরি কথা হাসি-মজাক ও ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে না বলবে। অন্যথায় দীনকে উপহাস ও বিদ্রুপ করার ভিত্তিতে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হবে। আর তখন নিয়ত ও আকীদার কোনো ধর্তব্য হবে না।)

'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া'র ২/২৩ পৃষ্ঠায় এবং 'জামিউল ফুসূলাইন'-এ লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় কুফরি কথা যবানে উচ্চারণ করে, সে কাফের; যদিও তার অন্তরে ঈমান থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকটও সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। 'ফাতাওয়ায়ে কাযীখান'-এও এমটিই লিখেছেন।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'য় এই স্থানে নাসেখ (কাতেব তথা লিপিকার) থেকে ভুল হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

আরও বলেন, 'ইমাদিয়া'য় এই মাসআলাকে 'মুহীত' এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই বাণী থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়[৪৮]–

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

নিঃসন্দেহে তারা কুফরি কথা বলেছে এবং (সে কারণে) তারা মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে গেছে।[৪৯]

---

[৪৮]. অথচ তারা এই হাসি-মজাক ও কৌতুকেরই ওজর পেশ করেছিল। كنا نخوض ونلعب কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন– أبالله و واياته ورسوله كنتم تستهزءون এবং উল্লিখিত আয়াতে কাফের হওয়ার হুকুম আরোপ করে দিয়েছেন। আর তা এ কারণেই যে, দ্বীনকে উপহাস ও বিদ্রুপ করা কুফরকে আবশ্যককারী স্বতন্ত্র বিষয়। –[উর্দু] অনুবাদক

[৪৯]. সূরা তাওবা : ৭৪

যে ব্যক্তি ওহী, নবুওয়ত, সশরীরে হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারে আহলে ইসলামের ন্যায় প্রবক্তা না হবে, সে কাফের

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রদ্দুল মুহতার' এর ৩/৩৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন–

ওই (ফালাসাফাহ–দর্শন) ওহী ফেরেশতার মাধ্যমে আসমান থেকে নাযিল হওয়াকে অস্বীকার করে এবং (তেমনিভাবে আরও) বহু আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, যেগুলোর সুবূত ও প্রামাণ্যতা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম থেকে অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, সশরীরে হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি। সারকথা হচ্ছে এই যে, যদিও ওই (ফালাসাফাহ–দর্শন) আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রসূলগণকে মানে, কিন্তু ঠিক ওইভাবে মানে না, যেভাবে আহলে ইসলামগণ মানেন। এ জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাদের মানা না-মানার মতোই।

যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'সূম তথা নিষ্পাপ হওয়ার প্রবক্তা নয়, সে কাফের

'আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' এর ২৬৬ পৃষ্ঠায় 'রিদ্দাত' অধ্যায়ে বলেন–

নবী সত্য হওয়ার ব্যাপারে যার সন্দেহ হবে অথবা নবীকে গালি দিবে কিংবা নবীর দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে, অথবা নবীকে অশ্রদ্ধা কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করবে, সে কাফের। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি নবী-রসূলগণের দিকে ব্যভিচারের সম্বন্ধ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি যিনার ইচ্ছার সম্বন্ধ করে, তাকেও কাফের বলা হবে। কেননা, এটা নবী-রসূলগণকে হেয় করা। আর যদি কেউ এ কথা বলে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়তের যামানায় এবং তার পূর্বেও (গুনাহ থেকে) নিষ্পাপ নন, তা হলে তাকেও কাফের বলা হবে। কেননা, একথা ও আকীদা শরীয়তের স্পষ্ট নসূসকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর।

শরীয়তের অকাট্য হারামসমূহকে যে ব্যক্তি নিজের জন্য হালাল মনে করে, সে কাফের : এ ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা ওজর নয়

'আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' এর 'আল জামউ ওয়াল ফারকু' অধ্যায়ে এবং 'আল ইয়াতিমিয়া'র শেষ দিকে বর্ণিত আছে–

যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতাবশত এমন ধারণা করে নেয় যে, যে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ আমি করেছি, তা আমার জন্য জায়েয ও হালাল, তা হলে ওই (কর্মকাণ্ড ও আমল) যদি এমনসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের অংশ হওয়ার বিষয়টি অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, (অর্থাৎ জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত) তা হলে ওই ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে; অন্যথায় নয়।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীস এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের আকীদা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব

'অজ্ঞতা শরীয়তের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর কি না'– এ আলোচনার অধীনে গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'বুখারী'র নিম্নবর্ণিত হাদীসের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফাতহুল বারী'র ১/৪৯৫ পৃষ্ঠায় পূর্ববর্তী উম্মতের ওই ব্যক্তি সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে বলেন, যে ব্যক্তি ওসিয়ত করেছিল যে, মৃত্যুর পর আমার লাশকে জ্বালিয়ে দিয়ো এবং বলেছিল–

فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ اَحَداً.

আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়ে যান, তা হলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যে শাস্তি অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।

হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফাতহুল বারী'র ৬/৪০৭ পৃষ্ঠায় باب ما ذكر من بني اسرائيل حديث أبي هريرة من طريق معمر عن الزهري . এর অধীনে বলেন–

وَرَدَّهُ اِبْنُ الْجَوْزِيْ وَقَالَ جَحْدَهُ صِفَةَ الْقُدْرَةِ كُفْرٌ اِتِّفَاقاً.

ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ওই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন (যয়ীফ অথবা মওজু বলেছেন) এবং বলেছেন যে, ওই ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহ তাআলার 'সিফাতে কুদরাত' এর অস্বীকার সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি। (এ জন্য এ হাদীস সহীহ হতে পারে না।)

কিন্তু 'বুখারী'র ২/৯৫৯ পৃষ্ঠায় بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ এর অধীনে (উল্লিখিত ওই ব্যক্তি-সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে) হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ আরিফ ইবনে আবী জামরাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন–

وأما ما اوصى به فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة فقد ثبت في شرع بني اسرائيل قتلهم انفسهم لتصحيح التوبة.

বাকি রইল তার ওসিয়তের বিষয়টি। তো হতে পারে তার শরীয়তে তাওবা সহীহ হওয়ার জন্য এটি (অর্থাৎ লাশকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া) জায়েয ছিল, যেমন বনী ইসরাঈলের শরীয়তে তাওবা সহীহ হওয়ার জন্য প্রাণদণ্ড (অপরাধীদেরকে হত্যা করা) প্রমাণিত আছে।[৫০]

(যেন হাফেয রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিকট যদি হাদীস সহীহ বলে মেনে নেওয়া হয়, তা হলে লাশকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার এ ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিযোগ 'আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করা'র জওয়াব বাকি থেকে যায়। গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ لَئِنْ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ [যদি আল্লাহ তাআলা আমার উপর সক্ষম হয়ে যান] এর এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার পর না ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিযোগ বাকি থাকে আর না আরিফ ইবনে আবী জামরা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ব্যাখ্যা (যা কেবলই অনুমাননির্ভর) এর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে। আর এ হাদীসটি আলোচিত মাসআলা তথা 'অজ্ঞতা শরীয়তের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো ওজর কি না' –এর আলোচনার অধীনে এসে যায়।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

আমার নিকট لَئِنْ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ দ্বারা ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে আযাব দেওয়ার ফায়সালা করে নেন এবং আমাকে তাওবার পূর্বেই সহীহ-সুস্থ পেয়ে যান, তা হলে তিনি আমাকে এমন আযাব দিবেন, যে আযাব আর কাউকে দেওয়া হয়নি। (এ

---

৫০. ফাতহুল বারী : ১১/২৬৪

জন্য তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে, ছাইকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে এবং মাটিকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে অস্তিত্বহীন করে দিবে, যাতে আমার নাম-নিশানাও বাকি না থাকে। অতএব, বোঝা গেল তার এই কথা ও ওসিয়তের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রচণ্ড ভয় এবং আল্লাহ তাআলার মৃতকে জীবিত করার কুদরত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার উপর। সে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতাকে মানবীয় ক্ষমতার অনুরূপ ধারণা করে আযাব থেকে বাঁচার জন্য এ পন্থা বের করেছে। আর ওই অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।) এমন নয় যে, আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার ব্যাপারে তার কোনো সংশয়-সন্দেহ আছে। (যেমনটা ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মনে করেছেন।)

বলেন, আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কে এই অজ্ঞতার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে ইহুদীদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপারে আফসোস করা হয়েছে–

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

আল্লাহ তাআলাকে যেমন কদর করা উচিত ছিল, ইহুদীরা তেমন কদর করেনি।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, এই আয়াতের শানে নুযূল এই ঘটনাই। এমতাবস্থায় আয়াতে কারিমার শেষে سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তা থেকে উর্ধ্বে) এ আয়াতে ইহুদীদের এ কাজকেই শিরক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার কুদরতকে নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির পাল্লায় পরিমাপ করেছিল এবং নিজেদের চিন্তাপ্রসূত ও খেয়াল-খুশি মতো ধারণা করে রেখেছিল। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতাকে মানবীয় ক্ষমতার অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। যেমন, ওই ব্যক্তি লাশ জ্বালিয়ে মাটি করে দেওয়াকে আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়ার প্রচেষ্টা জ্ঞান করে উল্লিখিত ওসিয়ত করেছিল।)

অজ্ঞতাবশত হারামকে হালাল মনে করা কখন এবং কাদের জন্য ওজর?

(গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা' ওজর হওয়া সংক্রান্ত 'সহীহ বুখারী'র ১/৩০৫ পৃষ্ঠায় باب الكفالة-র একটি হাদীস পেশ করেন।)

বাকি 'সহীহ বুখারী'তে এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মালিকানাধীন বাঁদির সাথে সঙ্গম করে ফেলার যে ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হামযা ইবনে উমর আসলামী (হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর আমিল) ওই ব্যক্তির কাছ থেকে (খেলাফতের দরবারে পেশ হওয়ার ব্যাপারে) জামিন গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেদমতে হাজির হয়েছেন (এবং ওই ব্যক্তি ও জামিনদেরকে পেশ করেছেন) হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিপূর্বে ওই ব্যক্তিকে একশ' দোর্‌রা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি ওই জামিনদের বর্ণনাকে সত্যায়ন করেছেন এবং ওই ব্যক্তিকে (শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে) অনবহিত হওয়ার উপর ভিত্তি করে মা'জুর তথা অপারগ সাব্যস্ত করেছেন। (ফাতহুল বারী : ৪/৩৭০)

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে এই যে, এ (অজ্ঞতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (যার উপর ভিত্তি করে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করেননি) কেবল شبه في الفعل (অর্থাৎ ওই ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর বাঁদির সঙ্গে সঙ্গম করাকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করার মতো হালাল মনে করে নিয়েছিল) যা 'রজম অধ্যায়'-এ (হানাফীদের নিকটও) গ্রহণযোগ্য। (অর্থাৎ হানাফীরাও شبه في الفعل কে দণ্ডবিধি রহিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর মনে করে। বাকি তা সত্ত্বেও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ওই ব্যক্তিকে একশ' দোর্‌রা তা'যীর তথা শাস্তি ও শাসন হিসেবে লাগিয়েছেন। যাতে মানুষ একে হীলা বানিয়ে না নেয়।

বলেন, এই মাসআলায় (নিজের স্ত্রীর বাঁদিকে নিজের জন্য হালাল মনে করে সঙ্গম করা দণ্ড রহিত হওয়ার কারণ) 'সুনানে আবী দাউদ'-এ (بَابُ جِمَاعِ الرَّجُلِ جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ এর অধীনে) এবং 'ত্বহাবী' ইত্যাদি কিতাবে একটি (মারফূ) রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে। (এ জন্য ওই ঘটনায় যিনার হদ তথা

দণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই شبه তথা সন্দেহ।) এ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের অজ্ঞতা নয়। (অর্থাৎ এটা 'হদ তথা দণ্ড' এর বিষয়; যা সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায়। এ থেকে এমনটা বোঝা উচিত হবে না যে, শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অনবহিত হওয়ার উপর ভিত্তি করে সত্তাগত কোনো হারাম বিষয় কারও জন্য হালাল হতে পারে।)

বলেন, কোনো ব্যক্তির নওমুসলিম (এবং শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ) হওয়া আমাদের ফুকাহায়ে কেরামের নিকটও গ্রহণযোগ্য ওজর।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ' এর ৫১ পৃষ্ঠায় বলেন–

নিঃসন্দেহে ওই সমস্ত অঞ্চল ও যামানা, যেখানে নবুওয়ত (এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম পৌছা)র ধারাবাহিকতা বন্ধ আছে, সেখানে ওই ব্যক্তির হুকুম যার উপর নবুওয়তের আসরসমূহ (এবং আহকামে শরইয়্যাহ) অপ্রকাশিত রয়েছে, এমনকি সে (অজ্ঞতাবশত) নবুওয়তের আসরসমূহ (এবং আহকামে শরইয়্যাহ)র মধ্য থেকে কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে বসেছে, তার উপর ভুল (এবং গোমরাহী)র হুকুম ঠিক সেভাবে প্রয়োগ করা যায় না, যেভাবে প্রয়োগ করা যায় এই যামানা ও অঞ্চলসমূহের লোকদের উপর; যাদের উপর নবুওয়তের আসরসমূহ (এবং আহকামে শরইয়্যাহ) প্রকাশিত হয়েছে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে অথবা যে দেশে নতুন নতুন ইসলাম পৌছেছে, কেবল ওই ব্যক্তি এবং ওই দেশের জন্য আহকামে শরইয়্যার ব্যাপারে অজ্ঞতা ওজর।)

এতমামে হুজ্জত [দলীলের পরিপূর্ণতা] দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় রচনাবলিতে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে (অস্বীকারকারীদের সামনে) দলীল-প্রমাণ কায়েম করার ব্যাপারে যে কথা বলেছেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু 'দলীল-প্রমাণ' এবং আহকামে শরইয়্যাহ তাবলীগ তথা সেগুলো তাদের নিকট পৌছে দেওয়া। (এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদেরকে মানাতে এবং লা-জওয়াব

করে দিতে হবে।) যেমন, হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর হাদীসে (যা সামনে আসছে) فادعه শব্দ দ্বারা স্পষ্ট। (যে, মুরতাদকে শুধু ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই যথেষ্ট। যদি তা কবুল না করে তা হলে তাকে হত্যা করে দাও।) আর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু খাইবারের ইহুদীদেরকে শুধু ইসলামের দাওয়াত দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।[৫১] অতঃপর ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ সেই দাওয়াত পৌঁছানোর উপর যথেষ্টকরণের বিষয়ে 'আখবারুল আহাদ' এর অধীনে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন। গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, সূরা আনআমের আয়াত وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ দ্বারাও এ ব্যাপারে দলীল পেশ করা যায়।

জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও অনবগত থাকা ওজর নয়

'আল আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর'-এ বলেন–

যে ব্যক্তি এ কথা জানে না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী,[৫২] সে মুসলমান নয়। কেননা, খতমে নবুওয়ত জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

হামুভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ তার 'শরহ' এর ২৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন–

অর্থাৎ কুফরিকে আবশ্যককারী বিষয়ের অধ্যায়ে জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে (অনবগত থাকা ও) অজ্ঞতা ওজর নয়। তবে জরুরিয়াতে দীন ছাড়া অন্যান্য দীনী বিষয়ের ব্যাপার ভিন্ন। 'মুফতা বিহী' তথা ফতোয়াপ্রাপ্ত অভিমত হচ্ছে এ জাতীয় বিষয়ে অনবগত থাকা ওজর। যেমনটা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। والله أعلم

---

[৫১]. দেখুন, সহীহ বুখারী : ২/৬০৬ بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

[৫২]. ইবনে আসাকের রহ. এর 'তারীখ'-এ তামীমে দারী রাযি. এর 'তরজমা' (অবস্থা)র অধীনে তো কবরেও 'খাতামুল আম্বিয়া' তথা সর্বশেষ নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রমাণিত। –লেখক।

'উলামায়ে কেরাম কেবল ধমকি ও ভয় দেখানোর জন্য কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কোনো মুসলমান কাফের হয় না'– এ কথা বলা সম্পূর্ণ মূর্খতা

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

হামুভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ (এ স্থানে) [কাউকে] কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া সংক্রান্ত মাসআলার ব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যার মধ্যে একটি হচ্ছে এই– যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, 'ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক কাউকে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া কেবল ধমকি ও ভয় দেখানোর জন্যই হয়ে থাকে; এমন নয় যে, সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও কাফের হয়ে যায়' (অর্থাৎ ফুকাহায়ে কেরাম কর্তৃক কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ কাফের হয় না) এ কথা স্পষ্টরূপে ওইসব লোকের মূর্খতা ও অজ্ঞতার প্রমাণ। 'ফাতাওয়ায়ে বায্‌যাযিয়া' থেকে এ কথার খণ্ডন উদ্ধৃত করা হয়। আর 'ফাতাওয়ায়ে বায্‌যাযিয়া' ফিকহ ও ফতোয়া প্রদানের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের একটি। ফুকাহায়ে কেরাম 'মাওলা আবীস সাউদ' থেকে –যিনি 'দিয়ার রূমিয়া'র মুফতীও এবং বহু কিতাবের রচয়িতাও, যেগুলোর মধ্যে তার তাফসীর (বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) ওই 'ফাতাওয়ায়ে বায্‌যাযিয়া'র গুণাগুণ ও প্রশংসা উদ্ধৃত করেছেন। হামুভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, বায্‌যাযিয়ার ভাষ্য এমন–

> ইলমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই– এমন কোনো কোনো লোক থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলে, ফতোয়ার কিতাবসমূহে লেখা হয় যে, 'অমুক কথা কিংবা কাজের কারণে [মানুষ] কাফের হয়ে যায়, এগুলো কেবল ধমকি প্রদান ও ভয় দেখানোর জন্য হয়ে থাকে; এমন নয় যে, প্রকৃতপক্ষেই [কোনো মুসলমান] কাফের হয়ে যায়।'– একথা নিঃসন্দেহে বাতিল। বাস্তবতা হচ্ছে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন থেকে সহীহ রেওয়ায়েতে (যে সকল কথা ও কাজের ব্যাপারে) কুফরির ফতোয়া বর্ণিত আছে, তা দ্বারা প্রকৃত কুফরিই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ ওই সকল কথা-কাজে লিপ্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই কাফের হয়ে যায়) তবে মুজতাহিদ ইমামগণ ব্যতীত অন্যান্য উলামায়ে কেরাম থেকে কুফরির যে অভিমত বর্ণিত আছে, কাউকে কাফের সাব্যস্ত

> করার বিষয়ে তার উপর (ভরসা করা যাবে না এবং) কুফরির ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'আল বাহরুর রায়েক'-এও একথাই বর্ণিত আছে। 'আল ইয়াওয়াকীত' এবং 'সফহাতুল খালেক'-এও 'বায্যাযিয়া'র এই ভাষ্যই পরিপূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'আল ইয়াওয়াকীত'-এ এ স্থানে খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ-এর বক্তব্যও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন–

> যদি কোনো যামানায় এমন কোনো মুজতাহিদ পাওয়া যায়, যাঁর মধ্যে চার ইমামের মতো ইজতিহাদের শর্তসমূহ পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যাবে এবং তাঁর কাছে কোনো অকাট্য দলীলের মাধ্যমে এ হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাবীল বা ব্যাখ্যায় ভুল করা কাফের হয়ে যাওয়ার কারণ, (অর্থাৎ জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা-তাবীলকারী কাফের) তা হলে আমরা এমন মুজতাহিদের কথার ভিত্তিতে তাদেরকে কাফের বলব।

খতমে নবুওয়তের উপর ঈমান

আল্লামা তাফ্তাযানী রহ. 'শরহে আকায়েদে নাসাফী'তে বলেন–

আর সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নবুওয়ত কিতাবুল্লাহর ওই সমস্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ঐশী আদেশ-নিষেধের মুকাল্লাফ (এবং পাবন্দ) বানানো হয়েছিল। আর এ কথা সুনিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, তাঁর যামানায় তিনি ছাড়া আর কোনো নবী ছিলেন না। অতএব, এ সকল বিধি-বিধান তাঁকে নিশ্চিতরূপে ওহীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। (অতএব, তিনি ইলহাম ও ওহীর অধিকারী নবী ছিলেন।) এমনিভাবে সহীহ হাদীসসমূহেও হযরত আদম আলাইহিস সালামের নবুওয়ত প্রমাণিত এবং এর উপর উম্মতের ইজমাও রয়েছে (যে আদম আলাইহিস সালাম নবী) অতএব, তাঁর নবুওয়তকে অস্বীকার করা –যেমনটা কোনো

কোনো উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে– সুনিশ্চিতরূপে কুফরির কারণ। (আর অস্বীকারকারী কাফের।)[৫৩]

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এমনিভাবে ২/৫০ পৃষ্ঠায় المواهب اللدنية للقسطلاني ، النوع الأول ، المقصد السادس এর অধীনে বর্ণিত আছে এবং 'আল বাহরুর রায়েক'-এও এমনই লিখেছেন।

তাওহীদ ও রিসালাত এর মতো খতমে নবুওয়তের উপর ঈমান আনাও জরুরি

বলেন, হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসতাদরাক'-এ যায়েদের পিতা হারেসা ইবনে শুরাহবীলের স্বীয় পুত্র যায়েদকে চাইতে আসার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারেসাকে বলেছেন–

أَسْئَلُكُمْ أَنْ تَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ أَنِّيْ خَاتَمُ أَنْبِيَاءِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَأَرْسَلَهُ مَعَكُمْ ...الخ

আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি যে, তোমরা لا اله إلا الله এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এবং এ কথার ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিবে যে আমি সর্বশেষ নবী ও রসূল (এবং তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে) তা হলে আমি যায়েদকে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিব।...

(এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, তাওহীদ ও রিসালাতের সঙ্গে সঙ্গেই খতমে নবুওয়তের উপর ঈমান আনাও জরুরি।)

খতমে নবুওয়তের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে সমস্ত নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘোষণা করানো হয়েছে

গ্রন্থকার রহ. বলেন–

আল্লামা মাহমূদ আলূসী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রূহুল মাআনী'তে এই আয়াত وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ এর তাফসীরে বলেন–

---

[৫৩] শরহে আকায়েদ নাসাফী : ১২৫

হযরত কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদের থেকে একে অপরকে সত্যায়ন করার ব্যাপারে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রসূল হওয়ার ব্যাপারে (নিজ নিজ উম্মতদের মাঝে) ঘোষণা করার উপর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ঘোষণা যে, 'আমার পর আর কোনো নবী আসবে না' এ ব্যাপারে ওয়াদা ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। (এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মতো খতমে নবুওয়তের উপরও ঈমান আনার ব্যাপারে সমস্ত নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।)

জরুরিয়াতে দীনের মধ্য থেকে কোনো বিষয়কে অস্বীকারকারীর তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে ওই বিশেষ আকীদা থেকে তাওবা করে

বলেন, 'রদ্দুল মুহতার' এর ৩/৩৯৭ পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ باب المرتد এর অধীনে বলেন–

অতঃপর মনে রেখো, ঈসায়ী মাসআলা[৫৪] থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনের মধ্য থেকে কোনো বিষয়কে উদাহরনস্বরূপ মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার কারণে কাফের ও মুরতাদ হয়ে থাকে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জরুরি হচ্ছে, সে তার ওই আকীদা (উদাহরণস্বরূপ মদ হালাল হওয়ার বিশ্বাস) থেকে সম্পর্কহীনতা (ও তাওবা)রও ঘোষণা করবে। কেবলমাত্র কালিমায়ে শাহাদাত দ্বিতীয়বার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট হবে না। কেননা, এ ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত বলা সত্ত্বেও মদকে হালাল বলত। (এ জন্য তার কুফর ও ইরতিদাদ ওই আকীদা থেকে

---

[৫৪] ঈসায়ী ফেরকা : ঈসা আস্ফাহানী ইহুদীর দিকে সম্বন্ধিত ইহুদীদের একটি ফেরকা। যারা মোটামুটি তাওহীদ ও রিসালাতের প্রবক্তা। কিন্তু আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক ওই দলে কিছু খ্রিস্টানও আছে। এ ফেরকা ইরাকে এ নামেই প্রসিদ্ধ। দেখুন, 'রদ্দুল মুহতার' ৩/৩৯৬ পৃষ্ঠা।–[উর্দু] অনুবাদক

তাওবা করা ব্যতীত দূর করা যাবে না।) যেমন, শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ তা স্পষ্ট করেছেন এবং (আমাদের নিকটও) এটিই প্রকাশ্য।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, 'জামিউল ফুসূলাইন' এর ২/২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

অতঃপর যদি ওই (তাওবাকারী) নিয়ম অনুযায়ী কালিমায়ে শাহাদাত যবানে উচ্চারণ করে পড়ে নেয়, তা হলে এতে কোনো ফায়দা হবে না; যতক্ষণ না সে ওই বিশেষ কুফরি কথা থেকে তাওবা করবে, যা সে বলেছিল (এবং যার উপর ভিত্তি করে সে কাফের হয়েছিল।) কেননা, ওই ব্যক্তির কুফরি শুধুমাত্র কালিমায়ে শাহাদাত দ্বারা দূর হবে না।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোনো নবী আসবে– এ কথার প্রবক্তা হওয়া তেমনই কুফরিকে আবশ্যক করে, যেমন আবশ্যক করে বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে খোদা কিংবা খোদার অবতার বলা

ইবনে হায্ম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আল-ফস্ল'-এর ৩/৩৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন–

যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে বলবে যে, সে আল্লাহ; অথবা যে আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে কারও দেহে আল্লাহ তাআলা প্রবেশ করেছেন বলে বিশ্বাস করে; কিংবা একমাত্র ঈসা আলাইহিস সালাম ছাড়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর অন্য কোনো নবী আসবে বলে বিশ্বাস করে, এমন ব্যক্তিকে কাফের বলার ব্যাপারে কোনো দু'জন মুসলমানও মতানৈক্য করে না। কেননা, উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাসসমূহের মধ্য থেকে প্রতিটিই বাতিল এবং কুফরি হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল-প্রমাণ কায়েম আছে।

'আল-ফস্ল' এর ৪/১৮০ পৃষ্ঠায় বলেন–

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলার বাণী وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এবং সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ শোনার পর কোনও মুসলমান কীভাবে দুঃসাহস করতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে নবী মানবে? একমাত্র ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যতীত; যাঁর কথা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম নিজেই শেষ যামানায় ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ সম্পর্কে সহীহ্ এবং মারফূ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।[৫৫]

খতমে নবুওয়তের আকীদা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত : একে অস্বীকার করা কুফরিকে তেমনই আবশ্যক করে, যেমন আবশ্যক করে আল্লাহ্, রসূল এবং দীনের সাথে উপহাস করা

ওই কিতাবেরই ২৫৫ এবং ২৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন–

এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা আছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে, যার সুবূত ও প্রামাণ্যতা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত 'মুজমা আলাইহি', সে কাফের। আর নসূসে শরইয়্যা দ্বারা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর কোনো ফেরেশতা কিংবা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্য থেকে কোনো নবী, অথবা কুরআনে করীমের কোনো আয়াত কিংবা দীনের ফরযসমূহের মধ্য থেকে কোনো ফরয –এ জন্য যে, এ সকল ফরযসমূহ আল্লাহর নিদর্শন– এর ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জেনে-বুঝে উপহাস করবে, সে কাফের। আর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে নবী মানবে অথবা এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে, যার ব্যাপারে তার একীন আছে যে, এটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, সে-ও কাফের।

উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেওয়া কিংবা তাঁর সত্তায় দোষ-ত্রুটি তালাশ করা কুফর, ইরতিদাদ ও হত্যাকে আবশ্যক করে

মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'শরহে শিফা'র ২/৩৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

সমস্ত উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার উপর গালি দিবে (সে মুরতাদ) তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। বলেন, তবারী রহমাতুল্লাহি

---

[৫৫]. এখানে মনে রাখা দরকার যে, শেষ যামানায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নতুন কোনো নবী হয়ে আসবেন না। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হিসেবে আসবেন। –অনুবাদক

আলাইহও এমনিভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক ওই ব্যক্তির মুরতাদ হয়ে যাওয়াকে ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং সাহেবাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে দোষ-ক্রটি তালাশ করবে অথবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা (এবং অসন্তুষ্টি) প্রকাশ করবে কিংবা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, (সে মুরতাদ) আরও বলেন, সুহনূন (মালেকী) রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত হচ্ছে, সমস্ত উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিদাতা এবং তাঁর পবিত্র সত্তায় দোষ-ক্রটি অনুসন্ধানকারী কাফের। আর যে তার কাফের ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সে-ও কাফের।

৫৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন—

আল্লাহ তাআলাকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, নবীদেরকে যে কেউই গালি দিবে, তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। (কেননা, সে মুরতাদ)

৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন—

সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সমস্ত ফেরেশতাদের মানহানি ও অবজ্ঞাকারী এবং গালিদাতা, কিংবা যে দীন-ধর্ম তাঁরা নিয়ে এসেছেন, তা মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী অথবা একেবারে সেগুলোর অস্তিত্ব কিংবা নবুওয়তকে অস্বীকারকারীর হুকুম তা-ই, যা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারী অথবা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কিংবা মানহানি ও অবজ্ঞাকারী অথবা তাঁকে গালিদাতার। (অর্থাৎ সে মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করে দেওয়া ওয়াজিব।)

মুতাওয়াতির বিষয়সমূহকে অস্বীকার করা কুফরি

'তাওয়াতুর' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আমলী তাওয়াতুর'

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'শরহে ফিকহে আকবর'-এ 'মুহীত' এর বরাতে লিখেন—

যে কোনো ব্যক্তি শরীয়তের মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতসমূহকে অস্বীকার করবে সে কাফের। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা হারাম হওয়াকে অস্বীকার করবে।

বলেন, মনে রাখবেন! এ ক্ষেত্রে তাওয়াতুর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থগত তাওয়াতুর, শব্দগত তাওয়াতুর উদ্দেশ্য নয়। (যেমন, উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট। অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা মোতাবেক যাকে 'হাদীসে মুতাওয়াতির' বলা হয়, সেটা পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়, বরং শরীয়তে যে হুকুমকে মুতাওয়াতির মনে করা হয়, তার অস্বীকারকারী কাফের; যদিও মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা অনুযায়ী সেটি মুতাওয়াতির না হয়। যেমন, রেশম পরিধান করা হারাম সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির নয়, কিন্তু শরীয়তে পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করার নিষিদ্ধতা মুতাওয়াতির। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত উম্মত একে হারামই বলে আসছে। একে অর্থগত তাওয়াতুর বা তাওয়াতুরে আমলী বলে।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া' (আলমগীরী)তেও 'ফাতাওয়ায়ে জহীরিয়া'র বরাতে এ কথাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা ছাড়া উসূলে ফিকহের সমস্ত উলামায়ে কেরাম 'সুন্নাহ' এর অধ্যায়ে এ কথার উপর একমত যে, (কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার বিষয়ে তাওয়াতুরে মা'নবী তথা অর্থগত তাওয়াতুর গ্রহণযোগ্য এবং তার প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে) ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি বলেছেন–

أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

> যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয মনে করবে না, সে কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হয়।

অতএব, এ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে যে কোনোও মুতাওয়াতির হুকুমের বিরোধিতা ও অস্বীকারকারী কাফের।

গ্রন্থাকার রহ. বলেন, এ হুকুমই 'উসূলে বাযদবী'র ২/৩৬৭ পৃষ্ঠায় এবং 'কাশ্‌ফ' এর ৩৬৩ পৃষ্ঠায় এবং ৪/৩৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়ের অস্বীকারকারী কাফের; যে মু'তাযিলা অকাট্য বিষয়সমূহকে অস্বীকার করবে না, তাকে কাফের না বলা উচিত

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রদ্দুল মুহতার' (শামী)র ২/৩৯৮ পৃষ্ঠায় باب المحرمات এর অধীনে লেখেন–

এ হুকুম ফাতহুল কদীর থেকে সংগৃহীত। আল্লামা শায়খ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, বাকি থাকল মু'তাযিলা। তো দলীল-প্রমাণের দাবি হচ্ছে এই যে, তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদী হালাল হওয়া উচিত। কেননা, হক হচ্ছে এই যে, আহলে কেবলাকে কাফের না বলা উচিত; যদিও আহলে হক তাদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কুফর আরোপ করে দিয়ে থাকেন। তবে এর বিপরীত হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে দীনের অকাট্য ও সুনিশ্চিত আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের বিরোধিতা করে। যেমন, পৃথিবী অবিনশ্বর হওয়ার প্রবক্তা হওয়া, আল্লাহ তাআলার ইলমে জুযইয়্যাত (প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে জ্ঞানী হওয়া)কে অস্বীকার করা, এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। যেমন মুহাক্কিকীনে কেরাম স্পষ্ট করেছেন। আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, আমি বলি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফায়েলে মুখতার [সর্ব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী] হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করবে এবং সৃষ্টিজগতের আত্মপ্রকাশকে তাঁর সত্তার অস্থিরতার দাবি সাব্যস্ত করবে, সে-ও নিশ্চিতরূপে কাফের।

কুফরির হুকুম আরোপ করার জন্য 'খবরে ওয়াহেদ'ও যথেষ্ট

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, শায়খ ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ صواعق محرقة র ২৫২ পৃষ্ঠায় শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর বরাতে উদ্ধৃত করেন যে–

এ হাদীস যদিও 'খবরে ওয়াহেদ' কিন্তু কুফরের হুকুম আরোপ করার জন্য খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা হয়। (কেননা, খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা ওয়াজিব।) যদিও স্বয়ং কোনো খবরে ওয়াহেদকে অস্বীকার করা কুফরি নয়। কেননা, খবরে ওয়াহেদ ظني الثبوت। আর ظني الثبوت বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরি নয়। قطعي الثبوت তথা অকাট্যরূপে প্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরকে আবশ্যক করে।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, শায়খ ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর ইঙ্গিত 'সহীহ্ ইবনে হিব্বান' এর আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়েতের দিকে। যেমন মুনযিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' এর ৪/২৪২ পৃষ্ঠায় আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু

আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বলল, তাদের দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজন অবশ্যই কাফের হয়ে গেছে। (অর্থাৎ যাকে কাফের বলেছে, যদি সে বাস্তবেও কাফের হয়ে থাকে, তা হলে তো ভালো কথা। অন্যথায় তাকে কাফের বলে সম্বোধনকারী একজন মুসলমানকে কাফের বলার কারণে নিজেই কাফের হয়ে গেছে।) এই হাদীসের এক রেওয়ায়েতের ভাষ্য এমন,

فَقَدْ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى اَحَدِهِمَا .

> তাদের দু'জনের মধ্যে যে কোনো একজনের উপর অবশ্যই কুফর আবশ্যক হয়ে গেছে।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কাযী শাওকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই হাদীসের ভিত্তিতে রাফেযীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। যেমন رياض المرتاض এর ২০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। (আর এ কথা স্পষ্ট যে, এ হাদীস খবরে ওয়াহেদ। অতএব, বোঝা গেল খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা জায়েয।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে দকীক আল-ঈদ 'শরহে উমদা'য় باب اللعان এ ওই সকল লোকদের কথাকে সমর্থন করেছেন, যারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুর প্রবক্তা (যে, কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যাদানকারী নিজেই কাফের।) এবং এই হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করেছেন।

আরও বলেন, বড় বড় উলামায়ে কেরামের এক জামাআতের অভিমতও এটিই। যেমন ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিজের অপর কিতাব الاعلام بقوطع الاسلام এ বর্ণনা করেছেন। এ-ও বলেন যে, 'জামিউল ফুসূলাইন' এর ২/৩১১ পৃষ্ঠায়ও এ-ই লেখা আছে।

مختصر مشكل الاثار এর-ও ১/৩৭০ পৃষ্ঠায় ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ স্থানে (অর্থাৎ কোনো মুসলমানকে কাফের বলার সুরতে) কাফের বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওই ধর্ম কুফরি, সে যাতে বিশ্বাসী। (অন্য কথায় বললে, কোনো মুসলমানকে কাফের বলা ইসলামকে কুফর বলার

নামান্তর ।) তো যদি ওই ব্যক্তি মুমিন হয় (এবং তার দীন প্রকৃত ঈমান হয়) তা হলে তাকে কাফের বলার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, বক্তা ঈমানকে কুফর বলছে । এ জন্য সে নিজেই কাফের হয়ে গেছে । কেননা, যে ব্যক্তি ঈমানকে কুফর বলবে, মহা মহিয়ান আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

যে ঈমানকে অস্বীকার করল, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল ।[৫৬]

গ্রন্থকার রহ. বলেন, ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ كتاب الأسماء والصفات এ-ও খাত্তাবী'র বরাতে এ কথাই উদ্ধৃত করেছেন । (যে, মুসলমানকে কাফের আখ্যাদানকারী নিজেই কাফের ।)

আরও বলেন, বিয়ের অধ্যায়ে যাইলায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর যে অভিমত 'শরহে কান্য' এর ২/১২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'অতঃপর যদি সংবাদদাতা নিজেই অলী হয়,....' এখানে 'উকূবাত'[৫৭] দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে

---

[৫৬]. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৫

[৫৭]. ইমাম যাইলায়ী রহ. কুমারী মেয়েকে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সংবাদ প্রদানের অধীনে 'খবরে ওয়াহেদ' সম্পর্কে একটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন এবং প্রয়োগক্ষেত্রের বিবেচনায় খবরে ওয়াহেদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন এবং বলেছেন, খবরে ওয়াহেদ যদি আল্লাহর হক সম্পর্কিত হয়, তা হলে তা হুজ্জত হবে । আর যদি খবরে ওয়াহেদ উকূবাত তথা কোনো শাস্তিকে আবশ্যক করে, তা হলে তাতে ইখতিলাফ আছে । কেউ কেউ বলেন, খবরে ওয়াহেদ তাতে মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য হবে । আবার কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন যে, সে ক্ষেত্রে হুকুম ছাবেত করার জন্য খবরে ওয়াহেদ যথেষ্ট নয় । গ্রন্থকার রহ. সংশয় নিরসনকল্পে বলেন যে, যাইলায়ী রহ. এর এই বয়ানে উকূবাত দ্বারা দুনয়াবী শাস্তি অর্থাৎ 'দণ্ড' ইত্যাদি উদ্দেশ্য । আর মতলব হচ্ছে এই, যে খবরে ওয়াহেদকে গ্রহণ করার দ্বারা কোনো ব্যক্তি উকূবাতে শরয়ী (তথা শরয়ী শাস্তি)র উপযুক্ত হয়, এমন বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ (এক ব্যক্তির বর্ণনা) যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না সাক্ষ্য প্রদানের নির্দিষ্ট নেসাব পুরা হবে । কেননা, الحدود تندرئ بالشبهات হদ তথা দণ্ডসমূহ সামান্যতমও সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যায় ।

দুনিয়াবী শাস্তি। ফাতহুল কদীরেরও ২/৪০০ পৃষ্ঠায় باب القضاء এর অধীনে এ অভিমতকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত সেখানে দেখুন।

গ্রন্থকার রহ. বলেন, 'কান্‌য' এর মতনে باب شتى القضاء এর অধীনেও এ অভিমতকে উদ্ধৃত করেছেন এবং সেখানে প্রথম ইঙ্গিত 'কারাহাত' এর। (অর্থাৎ 'কিতাবুল কারাহিয়্যা'র শুরুতেও ৪/২০৫ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিতে তার কথা উল্লেখ করেছেন।

একটি সংশয়ের নিরসন

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর পক্ষ থেকে সতর্ক[৫৮] করা হচ্ছে–

যারা 'তাকফীর' তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার মাসআলায় খবরে ওয়াহেদকে আমলযোগ্য মনে করেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হাদীস যদি খবরে ওয়াহেদও হয়, তবুও সেটি মুফতীর জন্য তাকফীরের মাসআলায় হুকুমের উৎসস্থল ও তাকফীরের ভিত্তি হতে পারে। (অর্থাৎ মুফতী তার উপর ভিত্তি করে কাফের হওয়ার হুকুম আরোপ করতে পারেন।) তবে ওই ব্যক্তি, যাকে কাফের সাব্যস্ত করা হল, সে মূলত কাফের হয়েছে কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে; যন্নী কোনো বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে নয়। এই পার্থক্য (অর্থাৎ কতয়ী তথা অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে কাফের হবে আর যন্নী তথা ধারণানির্ভর বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে কাফের হবে না) ওই ব্যক্তির ব্যাপারে। বাকি মুফতীর জন্য

---

[৫৮]. আলোচ্য মাসআলা অর্থাৎ 'খবরে ওয়াহেদের উপর ভিত্তি করে কাউকে কাফের হওয়ার ফতোয়া প্রদান করা' যেহেতু বাহ্যদৃষ্টিতে দ্বীনের সর্বজনবিধিত উসূলের খেলাফ মনে হয়, কেননা খবরে ওয়াহেদ সর্বসম্মতিক্রমে 'যন্নী', আর তাকফীর তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা কেবল 'কতয়ী' তথা অকাট্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, অথচ এটি অস্পষ্ট ধারণা, ধোঁকা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিণাম, সেহেতু গ্রন্থকার রহ. এই দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতার পর্দা দূর করার জন্য تَنْبِيْهٌ مِنَ الرَّاقِمِ অর্থাৎ 'লেখকের পক্ষ থেকে সতর্কীকরণ' শিরোনামে অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে আলোচিত মাসআলার হাকীকত বর্ণনা করে পাঠককে ওই ধোঁকা থেকে বাঁচার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগী করতে চান।–[উর্দু] অনুবাদক

(কুফরির হুকুম আরোপ করার জন্য) এ 'যন্'ই যথেষ্ট যে, অমুক ব্যক্তি অমুক অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেছে। তার [মুফতীর] জন্য অকাট্য একীন হাসিল হওয়া জরুরি নয়।[৫৯] বিষয়টি বিলকুলই এমন, যেমন 'রজম' এর মাসআলায় খবরে ওয়াহেদ এর উপর আমল করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির উপর রজম এর হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাবে না, যতক্ষণ না চারজন পুরুষ যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। তেমনই এই 'মাসাআলায়ে তাকফীর'এর বিষয়টিও।

সারকথা হচ্ছে এই যে, তাকফীরের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কুফরকে আবশ্যককারী বিষয় তো কেবল অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করাই হয়, কিন্তু মুফতী সাহেবকে 'ওয়াজহে কুফর' (অর্থাৎ অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা)র দিকে মনোযোগী ও সতর্ককারী খবরে ওয়াহেদও হতে পারে।[৬০] অর্থাৎ তাকে বলতে পারেন যে, অমুক অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরি। কিন্তু ওই

---

[৫৯]. মোটকথা হচ্ছে এই যে, একটা বিষয় হচ্ছে 'ওয়াজহে কুফর' তথা কুফরির কারণ– এটা কেবল কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করাই হতে পারে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে 'ওয়াজহে কুফরের ইরতিকাব' তথা কুফরির কারণে লিপ্ত হওয়া– এর জন্য যন্ ও প্রবল ধারণাই যথেষ্ট; ইয়াকীন জরুরি নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুফতী সাহেবের 'কুফরির কারণে লিপ্ত হওয়ার ইলম' অকাট্য ও ইয়াকীনীরূপে হাসিল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুফরির ফতোয়া প্রদান করতে পারবেন না। কারণ, খবরে ওয়াহেদ যদিও যন্নী, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে 'ওয়াজিবুল আমল' তথা সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এ জন্য মুফতী সাহেবের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, কুফরির কারণে লিপ্ত হওয়ার প্রবল ধারণা হলেই তিনি কুফরির ফতোয়া প্রদান করে দিবেন। এর জন্য তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত ও দায়বদ্ধ। –[উর্দু] অনুবাদক

[৬০]. যেমন, ইসলামকে কুফর বলা হককে বাতিল বলার নামান্তর এবং অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা। এ জন্য যে ব্যক্তি ইসলামকে কুফর বলবে, সে অকাট্য একটি বিষয়কে অস্বীকার করার কারণে সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু একজন মুসলমানকে কাফের আখ্যাদানকারী ব্যক্তি এর মুরতাকিব অর্থাৎ সে ইসলামকে কুফর বলেছে– এর ইলম আমাদের হাসিল হয়েছে ওই হাদীসের দ্বারা, যা খবরে ওয়াহেদ। এ জন্য আমাদের উপর ওয়াজিব যে, কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যাদানকারীর উপর আমরা কুফরের হুকুম আরোপ করব। কেননা, খবরে ওয়াহেদ সর্বসম্মতিক্রমে আমলকে ওয়াজিব করার ফায়দা দেয়। –[উর্দু] অনুবাদক

বিষয় (যা অস্বীকার করার কারণে কাউকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়) মূলত শুধুমাত্র অকাট্য বিষয়ই হতে পারে। (কেননা, যন্নী কোনো বিষয়কে অস্বীকার করার দ্বারা কোনো মানুষ কাফের হয় না।)

বলেন, এর উদাহরণ হচ্ছে এমন, যেমন কোনো আলেম (ওই সকল) মুতাওয়াতির ও অকাট্য বিষয়সমূহকে একত্র করেন এবং তার একটি তালিকা তৈরি করেন (যেগুলোকে অস্বীকার করা কুফরি।) ওই একত্রকরণ ও তালিকায় কিছু কিছু মুতাওয়াতির ও অকাট্য বিষয় ভুলবশত বাদ পড়ে যায় এবং ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় না। পরবর্তীতে অন্য কোনো আলেম তাকে বলেন যে, অমুক অমুক অকাট্য বিষয়গুলো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন এবং ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। এতে ওই আলেম সেই একক ব্যক্তির সতর্কীকরণ ও দৃষ্টি আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে ওই সকল অকাট্য বিষয়গুলোকেও তালিকাভুক্ত করেন। এমতাবস্থায় ওই আলেম সেই একক ব্যক্তির সতর্ক করার দ্বারা একটি অকাট্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলেন (যা তার মাথায় ছিল না কিংবা ভুলবশত রয়ে গিয়েছিল।) এখানে লক্ষ করুন, ওই [অকাট্য] বিষয়টি নিজে নিজেই অকাট্য; একক ব্যক্তির বলার কারণে অকাট্য হয়নি। হাঁ, ওই ব্যক্তি ওই আলেমকে তার দিকে মনোযোগী করে দিয়েছেন।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের আলোচিত মাসআলায় ওই ব্যক্তি কাফের তো হবে কেবলমাত্র অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার দ্বারা, কিন্তু তার কুফরের উপর ফতোয়া প্রদানকারী মুফতী সাহেব খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকেন এবং কুফরের ফতোয়া প্রদান করে থাকেন। এ পার্থক্য খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। والله ولى التوفيق

আরও একটি সংশয় নিরসন

বলেন, 'শরহে ফিকহে আকবর' এর বর্ণনা থেকে এমন সংশয় সৃষ্টি হয় যে, 'মাসআলায়ে তাকফীর' এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিমীনে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ আছে। যেমন, ফুকাহায়ে কেরাম যন্নী বিষয়কে অস্বীকার করার দ্বারাও কুফরির হুকুম লাগিয়ে দেন। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমীনে কেরাম এর বিপরীত (কেননা, তাঁরা কেবল অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করলেই কুফরির হুকুম লাগিয়ে থাকেন।)

এটা কেবলই একটা অমূলক সন্দেহ। প্রকৃতপক্ষে 'মাসআলায়ে তাকফীর' এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিমীনে কেরামের মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই। বরং এটি কেবল তাদের আলোচনার বিষয় ও আলোচ্যবিষয়গত ইখতিলাফ। যেমন, ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'ফেয়েলে মুকাল্লাফ' তথা যাদের উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য, তাদের ক্রিয়া-কর্ম। আর তাদের অধিকাংশ মাসআলা-মাসায়েলই যন্নী। (এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম যন্নী দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই কুফরির হুকুম প্রয়োগ করে থাকেন।) আর মুতাকাল্লিমীনে কেরামের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'আকায়েদে কৃতয়িয়্যাহ' তথা অকাট্য আকীদা-বিশ্বাসসমূহ। আর এসব কিছুই অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। (এ জন্য মুতাকাল্লিমীনে কেরাম অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই কুফরির হুকুম আরোপ করে থাকেন।) এটিই সেই সূক্ষ্ম বিষয়, যার উপর ভিত্তি করে উভয় পক্ষের আলোচনার সীমারেখা এবং কর্মপন্থা পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অন্যথায় মূল 'মাসআলায়ে তাকফীর'-এ কোনো ইখতিলাফ নেই এবং কোনো রকমের সংশয়-সন্দেহ ব্যতিরেকে তাকফীরের ভিত্তি 'যন' এর উপর কায়েম করা জায়েয আছে। কেননা, এ 'যন' প্রকৃতপক্ষে কুফরের হুকুমের ইলম হাসিল করার মধ্যে, ওই বিষয়ে নয়, যা কারও কুফরকে আবশ্যক করে। (কেননা, সেটা তো নিঃসন্দেহে সকলের নিকট অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়ই হয়ে থাকে।)

আরও একটি পার্থক্য

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

এ ছাড়াও আলোচনাধীন মাসআলায় তাকফীর [কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা] হয় খবরে ওয়াহেদের মর্ম ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে, তার প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করার উপর ভিত্তি করে নয়। (অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খবরে ওয়াহেদের সুবূত [প্রামাণ্যতা]কে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমার নিকট এই হাদীসটি প্রমাণিত নয়, কেননা এটি খবরে ওয়াহেদ, তা হলে তাকে কাফের বলা হবে না।) আবার কখনও কখনও সুবূতের পদ্ধতি এবং মর্ম ও বিষয়বস্তুর দালালতের [নির্দেশের] ইখতিলাফের কারণে হুকুম-আহকাম পরিবর্তন হয়ে যায়। দেখুন, শাফেয়ীগণ শুধু খবরে ওয়াহেদের বিষয়বস্তুকে

বিবেচনা করে (ফরয ও সুন্নাতের বিভক্তির সময়) শুধু ফরযকে (সুন্নাতের বিপরীতে) রেখেছেন এবং ওয়াজিবকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ জন্য তারা খবরে ওয়াহেদের দ্বারা ফরযকে সাবেত করেন। এর বিপরীতে হানাফীগণ 'কাইফিয়াতে সুবূত' তথা প্রামাণ্যতার ধরণকে সামনে রেখেছেন।[৬১] (এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন– ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত। আর খবরে ওয়াহেদের দ্বারা শুধু ওয়াজিবকে সাবেত করেছেন। ফরযকে সাবেত করার জন্য খবরে ওয়াহেদকে যথেষ্ট মনে করেননি। ইখতিলাফের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, শাফেয়ীদের নিকট খবরে ওয়াহেদের দ্বারা ফরয সাবেত হতে পারে, হানাফীদের নিকট খবরে ওয়াহেদের দ্বারা ফরয সাবেত হতে পারে না।)

বলেন, এই আলোচনাটুকু গভীর দৃষ্টিতে ভালোভাবে বোঝা উচিত। তাওফীক দাতা তো আল্লাহ তাআলা।

কুফরি কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়, যদিও অন্তরে ঈমান থাকে

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি দ্বিতীয় সতর্কীকরণ[৬২] শিরোনামে বলেন–

---

[৬১] এটিই আলোচনাধীন ইখতিলাফের সারাংশ যে, ফুকাহায়ে কেরাম খবরে ওয়াহেদের বিষয়বস্তু ও মর্মকে সামনে রাখেন এবং তা অস্বীকারের উপর ভিত্তি করে তাকফীর [তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত] করে থাকেন। আর মুতাকাল্লিমীনে কেরাম 'কাইফিয়াতে সুবূত' [তথা প্রামাণ্যতার ধরণ]কে সামনে রাখেন এবং খবরে ওয়াহেদের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকারের উপর ভিত্তি করে তাকফীর [তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত] করেন না। অতএব, বোঝা গেল, উভয় পক্ষের মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই। যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম কাফের সাব্যস্ত করেন, তা একটি ভিন্ন বিষয় অথাৎ খবরে ওয়াহেদের বিষয়বস্তু; আর যে বস্তুর উপর ভিত্তি করে মুতাকাল্লিমীনে কেরাম কাফের সাব্যস্ত করেন না, তা ভিন্ন আরেক বিষয় অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করা। والله أعلم

[৬২] সাধারণত কুফরি কথা ও কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে যখন কাফের সাব্যস্ত করা হয়, তখন তারা নিজেরাও এবং তাদের সমমনারাও এ কথা বলে থাকে যে, 'ঈমান ও কুফরের কেন্দ্র ও ভিত্তি তো হল অন্তর। যতক্ষণ পর্যন্ত কারও অন্তরে আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কীভাবে কাফের বলা যায়?' তেমনিভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক আলেমও এ কথা বলে থাকে যে, 'ঈমান তো

উলামায়ে কেরাম কিছু কিছু আমল ও কাজ কুফরকে আবশ্যকাকারী হওয়ার ব্যাপারে একমত। অথচ সেসবে লিপ্ত হওয়ার সময় তাসদীকে কলবী [তথা অন্তরের সত্যায়ন] বিদ্যমান থাকা সম্ভব। কেননা, ওই সকল আমল ও কাজের সম্পর্ক হাত, পা, যবান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে, অন্তরের সাথে নয়। যেমন, হাসি-তামাশা ও মজা করে মুখে কুফরি কথা বলে ফেলা, যদিও অন্তরে বিলকুল তার আকীদা না থাকে, অথবা মূর্তি (ইত্যাদি গাইরুল্লাহ)কে সেজদা করে ফেলা, কিংবা কোনো নবীকে হত্যা করে ফেলা, অথবা নবী, কুরআন কিংবা কাবার সাথে বিদ্রুপ-উপহাস করা (কেননা, এ সমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে মানুষ কাফের হয়ে যায়, যদিও এটা সম্ভব যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান থাকবে।) বলেন, (ওই সকল আমল ও কাজে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তো সবাই একমত, কিন্তু) কুফরের কারণ কী? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

১. কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুমের দিক বিবেচনায় এ ধরনের তাসদীক ও ঈমানকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেননি। (এবং অস্তিত্বহীন সাব্যস্ত করেছেন) যদিও তা বাস্তবে বিদ্যমান থাকে। (এ জন্য এ জাতীয় লোক শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের।) হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'কিতাবুল ঈমান' এর ১৩২৫ হিজরীর পুরনো সংস্করণের ৬০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে কুফরির এই কারণই উদ্ধৃত করেছেন।

২. আবার কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন, যে কথা ও কাজ হেয় প্রতিপন্ন ও অবজ্ঞাকে আবশ্যক করে, ওই কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের বলা হবে; যদিও অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়ত

হল 'তাসদীকে কলবী' তথা অন্তরের সত্যায়নের নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তাসদীকে কলবী বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে কোনো কথা বা কাজের উপর ভিত্তি করে কাফের বলা যাবে না; এবং এ কথা বলা যাবে না যে, সে ঈমান ও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।'

এ ভুল ধারণা দূর করার জন্যই গ্রন্থকার রহ. 'সতর্কীকরণ' শিরোনামে উলামায়ে উম্মতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

না থাকে। (যেন এ কথা ও কাজ ঈমান না থাকার দলীল। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির ঈমানের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।) আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রদ্দুল মুহতার'-এ কুফরির এই কারণই বর্ণনা করেছেন।

৩. কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন যে, ঈমান (শুধু 'তাসদীকে কলবী'র নাম নয়, বরং তাতে) আরও কিছু বিষয়ও ধর্তব্য। (যার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও অন্তর্ভুক্ত।) অতএব, উপর্যুক্ত আমল ও কাজে লিপ্ত ব্যক্তির 'তাসদীক'কে ঈমান বলা হবে না।

৪. আর কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে মুমিনের জন্য যে 'তাসদীক' গ্রহণযোগ্য, এ আমল ও কাজ নিঃসন্দেহে তার বিরোধী। (এ জন্য এমন ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মুমিন নয়।) আল্লামা কাসেম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মুসায়ারাহ' এর টীকায় এবং হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ কুফরির এই কারণই বর্ণনা করেছেন।

সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ কিছু কিছু কথা, কাজ ও আমলে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়, যদিও সে শাব্দিক 'তাসদীকে কলবী' ও 'ঈমান' থেকে বের না হয়ে থাকে।

কাফেরদের মতো কাজ করার দ্বারা মুসলমান ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফের হয়ে যায়

'শিফা' এবং 'মুসায়ারাহ'তে কাযী আবু বকর বাকিল্লানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিম্নবর্ণিত অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন—

যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কথা কিংবা কাজে লিপ্ত হয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন অথবা তার উপর উম্মতের ইজমা থাকে যে, 'এ কথা ও কাজ কেবলমাত্র কোনো কাফেরের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে', অথবা অন্য কোনো অকাট্য (দলীল) এ ব্যাপারে কায়েম থাকে (যে, এ কাজ কেবল কোনো কাফেরই করতে পারে) তা হলে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

কুফরি কথা ও কাজ

আবুল বাকা রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'কুল্লিয়্যাত'-এ বলেন–

কখনও মানুষ কথার দ্বারা কাফের হয়, আবার কখনও কাজের দ্বারা। কুফরকে আবশ্যককারী সুরত হচ্ছে এই যে, মানুষ এমন কোনো শরয়ী বিষয়কে অস্বীকার করবে, যা মুজমা আলাইহি এবং যার ব্যাপারে স্পষ্ট নস বিদ্যমান। চাই তার আকীদাও তা-ই হোক, কিংবা তা না হোক; বরং শুধু গোঁয়ারতুমি অথবা উপহাসস্বরূপ অস্বীকার করে থাকুক– তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। (সর্বাবস্থায়ই) কাফের হয়ে যাবে। আর কুফরকে আবশ্যককারী কাজ হচ্ছে ওই 'কুফরী আমল', যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং সেটা দীনের সাথে পরিষ্কার বিদ্রূপ-উপহাস হয়। উদাহরণস্বরূপ, মূর্তিকে সেজদা করা।

কোনো জোর-জবরদস্তি ছাড়া মুখে কুফরি কথা উচ্চারণকারী কাফের, যদিও তার আকীদা তেমন না হয়

'শরহে ফিকহে আকবর' এর ১৯৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা কওনবী রহমাতুল্লাহি আলাইহএর অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন–

যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় (কারও জোর-জবরদস্তি ছাড়া) মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি কথা বলে, তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে; যদিও তার আকীদা তেমন না হয়ে থাকে। কেননা, (এমতাবস্থায়) মুখে কুফরি কথা বলার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টি পাওয়া গেছে। (আর কুফরির উপর সন্তুষ্ট থাকা কুফরি।) যদিও সে তার হুকুম তথা কাফের হওয়ার ব্যাপারে রাজি না-ও হয়। আর এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অবগত না হওয়ার ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না। আম উলামায়ে কেরামের ফায়সালা এমনই। যদিও কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম তার বিরোধিতা করেন (এবং অবগত না হওয়াকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করেন।) তিনি আরও বলেন, 'খেলাফতে শাইখাইন' তথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকে অস্বীকারকারী কাফের।

সেই 'শরহে ফিকহে আকবর'-এ মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন–

অতঃপর স্মরণ রেখো, যদি কোনো ব্যক্তি যবানে কুফরি কথা বলে, এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, তার হুকুম এই (যে, মানুষ কাফের হয়ে যায়) যদিও সে তাতে বিশ্বাসী না হয়, কিন্তু নিজ উচ্ছায় ও সাগ্রহে বলে (কারও কোনো

জোর-জবরদস্তি ছাড়া) তা হলে তার উপর কাফের হয়ে যাওয়ার হুকুম আরোপ করা হবে। কেননা, কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের নিকট পছন্দনীয় অভিমত হচ্ছে এই যে, 'তাসদীকে কলবী' এবং 'ইকরারে লিসানী' তথা মৌখিক স্বীকারোক্তি উভয়ের সমষ্টির নাম ঈমান। বিধায় এ কুফরি কথা বলার পর ওই 'স্বীকারোক্তি' 'অস্বীকারে' পরিবর্তিত হয়ে গেছে (এবং ঈমান অবশিষ্ট থাকেনি।)

মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর 'শরহে শিফা'র ২/৪২৯ পৃষ্ঠায় আর কিছু অংশ ২/৪২৮ পৃষ্ঠায় এই বিশ্লেষণই বর্ণিত আছে।

অনবহিত থাকার ওজর কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য আর কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়

'শরহে ফিকহে আকবর' এর শেষ দিকে বলেন–

আমি বলি প্রথম কথা (যে, অজ্ঞতা ও অনবহিত থাকা ওজর) বেশি সঠিক মনে হয়। তবে যদি এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে, যা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে বিধিত, তা হলে এমতাবস্থায় ওই অস্বীকারকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা হবে এবং অজ্ঞতা ও অনবহিত থাকার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

যবানে কুফরি কথা বলা কুরআনের নস দ্বারা [প্রমাণিত] কুফরি

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আস সারেমুল মাসলুল' এর ৫১৯ পৃষ্ঠায় বলেন–

এ জন্য (যে, কুফরি কথা যবানে আনার দ্বারাই মানুষ কাফের হয়ে যায়) আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

তোমরা কোনো ওজর পেশ করো না, কেননা, নিঃসন্দেহে তোমরা ঈমান আনার পর (কুফরি কথা বলার কারণে) কাফের হয়ে গেছ।[৬৩]

---

[৬৩] সূরা তাওবা : ৬৬

বলেন–

এখানে আল্লাহ তাআলা (قَدْ كَفَرْتُمْ এর পরিবর্তে) এ কথা বলেননি যে, তোমরা তোমাদের কথা إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ –এ 'মিথ্যাবাদী'। অর্থাৎ তাদেরকে তাদের ওই ওজরের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, তোমরা হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক হিসেবে কুফরি কথা বলার কারণেই ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। (অতএব, কুরআনে নসের দ্বারা জানা গেল যে, হাসি-মশকরা হিসেবে কুফরি কথা বলাও কুফরির কারণ। যদিও কোনো কিছুর ইচ্ছা না-ও থাকে।)

৫২৪ পৃষ্ঠায় এ কথা আরও অধিক স্পষ্ট করেছেন। এমনিভাবে ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আহকামুল কুরআন' এ এ বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

কুফরি কথা শুধু যবান দিয়ে উচ্চারণ করাকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফরির কারণ সাব্যস্ত করেছেন

গ্রন্থাকর রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

এ সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে রেখে এ কথা বলা তেমন দূরের কোনো বিষয় নয় যে, নবী আলাইহিস সালাম পূর্বোল্লেখিত হাদীসে (আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন মুসলমানকে কাফের বলাকেই কুফরি সাব্যস্ত করেছেন, যার ইসলাম সম্পর্কে সকলেই অবগত। কেননা, নবী আলাইহিস সালামের এই এখতিয়ার আছে (যে, তিনি যে কোনো কথা বা কাজকে কুফরি সাব্যস্ত করবেন।) এ জন্য নয় যে, কোনো মুসলমানকে কাফের বলার মধ্য দিয়ে ইসলামকে কুফর বলা আবশ্যক হয় (যে, এটা বিনা কারণে তাকাল্লুফ) আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

অতএব, আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আপনাকে তাদের পরস্পরের ঝগড়-বিবাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী বিচারক হিসেবে

মেনে নেয়; অতঃপর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব করবে না এবং সর্বান্তকরণে (আপনাকে পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী বিচারকরূপে) মেনে নিবে।[৬৪]

(এই আয়াতে করীমা থেকে জানা গেল যে, নবী আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা উম্মতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও মুআমালার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও এখতিয়ারের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। আর সেই এখতিয়ারের ক্ষমতাবলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেওয়া'কে কুফরি সাব্যস্ত করেছেন।) আর আল্লাহ তাআলা তো সমস্ত বিষয়-আশয়ের মালিক ও এখতিয়ারের অধিকারী বটেনই। (এ জন্য তিনি তাঁর রসূলকে উম্মতের হুকুম-আহকাম ও মুআমালার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন।)

কুফরকে খেল-তামাশা বানিয়ে নেওয়া কুফরি

'ঈসারুল হক' গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠায় ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বরাতে (এই তাকফীরের) কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে–

কোনো মুসলমান ভাইকে কাফের আখ্যাদানকারী –যখন তার ইসলামকে বিশ্বাস করে, তা সত্ত্বেও তাকে কাফের বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে যে ধর্মের অনুসারী তা কুফরি; অথচ সে ইসলামের অনুসারী। যেন বক্তা ইসলামকে কুফর বলেছে। আর যে কেউ-ই ইসলামকে কুফর বলবে, সে নিজেই কাফের; যদিও তার সে আকীদা না থাকে।

গ্রন্থাকর রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, তো দেখুন, ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ কুফরির সঙ্গে হাসি-তামাশা (অর্থাৎ কুফরকে খেল-তামাশা বানিয়ে নেওয়ার সমার্থক) সাব্যস্ত করেছেন। (এবং তাকে কুফরি কারণ বলেছেন।)

---

[৬৪]. সূরা নিসা : ৬৫

মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারী সকল মির্যায়ী [কাদিয়ানীরা] কাফের

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

এ মরদূদ (মির্যা গোলাম আহমদ) ও তার অনুসারীরা নিঃসন্দেহে ওই হাদীসের মিসদাক তথা উদ্দেশ্য। কেননা, এরা বর্তমান যামানার সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে (প্রকাশ্যভাবে) কাফের বলে থাকে। এ জন্য জরুরি হচ্ছে স্বয়ং তাদেরকে (কুরআন ও হাদীসের নস দ্বারা) কাফের সাব্যস্ত করা; সমগ্র আলমে ইসলামীকে নয়। কারণ, উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যমতে উম্মতে মুসলিমাকে কাফের আখ্যা দেওয়ার পরিণাম স্বয়ং তাদেরই উপর এসে পড়েছে। (এবং হাদীসের নসের দ্বারা দুনিয়ার সকল মুসলমানকে কাফের বলার কারণে তারা সবাই কাফের হয়ে গেছে। এটা আল্লাহর মার) আর আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই করেন; এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন, তার হুকুম দিয়ে দেন। (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খোদ তাদেরই যবানে কাফের বানিয়ে দিয়েছেন।) কবির ভাষায়,

فقد كان هذا لهم لا لهم

فأولى لهم ثم أولى لهم

এ তো তাদের দলীল, এদের নয়

অতএব, তারা ধ্বংস হোক, অতঃপর আবার ধ্বংস হোক।

যেমন, হাফেয ইবনুল কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'যাদুল মাআদ'-এ بَابُ اَحْكَامِ الْفَتْحِ এর অধীনে বলেন–

...পক্ষান্তরে মুবতাদিয়ীন ও আহলে হাওয়া (গোমরাহ ফেরকাসমূহ) এর বিপরীত। কেননা, এরা তো নিজেদের বাতিল আকীদার বিরোধিতা এবং খোদ নিজেদের মূর্খতার উপর ভিত্তি করে সমস্ত মুসলমানদেরকে কাফের ও মুবতাদি' (গোমরাহ) বলে; অথচ খোদ তারা নিজেরাই ওই সকল মুসলমানদের তুলনায় কাফের ও মুবতাদি' (গোমরাহ) আখ্যায়িত হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত, যাদেরকে তারা কাফের ও মুবতাদি' বলে। (কেননা, তারা মুসলমানদেরকে কাফের বলার কারণে হাদীসের নস দ্বারা স্বয়ং নিজেরাই কাফের হয়ে গেছে।)

মাসআলায়ে তাকফীরের আরও বরাত

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে বলেন– তাকফীরের [কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার] মাসআলা 'তাহরীর' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাকরীর'-এ নিম্নবর্ণিত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। (সেখানে দেখুন)

১. مَسْئَلَةُ الْعَقْلِيَّاتِ إِلَى آخِرِهِ ৩/৩০৩ ও ৩১৮ পৃষ্ঠা।

২. ثُمَّ قَالَ السُّبْكِيْ إِلَى آخِرِهِ ব্যাখ্যাগ্রন্থের শেষ দিকে।

৩. وَالْفَصْلُ الثَّانِيْ فِي الْحَاكِمِ ২/৯০

৪. وَالْبَابُ الثَّانِيْ أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ ২/২১৫ পৃষ্ঠা।

৫. وَمَسْئَلَةُ إِنْكَارِ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِي ৩/১১৩ ও ৩০৫ পৃষ্ঠা।

৬. وَإِنَّمَا لَهُمُ الْقَطْعُ بِالْعُمُوْمَاتِ الخ ৩/৪০ ও ১১০ পৃষ্ঠা।

৭. اجيب بأن فائدته التحول الخ ৩/২৫ পৃষ্ঠা।

৮. وَمِنْ اَقْسَامِ الْجَهْلِ الخ ৩/৩১৭ পৃষ্ঠা।

৯. والْهَزْلُ ২/২০০ পৃষ্ঠা।

বলেন, তাবলীগ সংক্রান্ত 'মুস্তাস্ফা' এবং 'তাকরীর'-এ নিম্নবর্ণিত পৃষ্ঠায় আছে।

المستصفى ১/১৩৩, ১৪৭ ও ১৫১ পৃষ্ঠা।

التقرير ৩/৩১৬ ও ৩২৭ পৃষ্ঠা।

জরুরিয়াতে দীনের বিরোধিতায় কোনো তাবীল-ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেক্ষেত্রে তাবীলকারী কাফের

জরুরিয়াতে দীন অকাট্য বিষয়সমূহ ব্যতীত উমূরে হাক্কাহ'য় তাবীল গ্রহণযোগ্য; জরুরিয়াতে দীন এবং অকাট্য বিষয়সমূহে কোনও তাবীল গ্রহণযোগ্য[৬৫] নয়; তাবীলকারী তাবীল করা সত্ত্বেও কাফের

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'কুল্লিয়াতে আবুল বাকা'র ৫৫৩ ও ৫৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

'যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান থাকবে না, সে কাফের।'

এখন যদি সে শুধু যবানে ঈমান প্রকাশ করে (এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করে), তা হলে সে মুনাফিক। আর যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করে, তা হলে সে মুরতাদ। আর যদি একের অধিক মাবুদ মানে, তা হলে সে মুশরিক। আর যদি সে কোনো রহিত হয়ে যাওয়া ধর্ম ও কিতাবের অনুসারী হয়, তা হলে সে কিতাবী। আর যদি যামানাকে 'কদীম' তথা অবিনশ্বর মানে এবং নশ্বর পৃথিবীকে তার দিকে সম্বন্ধিত করে, (অর্থাৎ 'যামানা'কেই সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা ও তাতে হস্তক্ষেপকারী মনে করে) তা হলে সে 'মুআত্তাল'। আর যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে স্বীকার করে, কিন্তু তার সাথে সাথে বাতেনীভাবে এমন আকীদা পোষণ করে, যা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি, তা হলে সে যিন্দীক।

---

[৬৫]. স্পষ্ট কুফরি আকীদা পোষণকারী এবং কুফরি কথা ও কাজে লিপ্ত ব্যক্তি 'নামধারী' মুসলমান ব্যক্তি কিংবা ফেরকার উপর যখন উলামায়ে হক কুফরের হুকুম ও ফতোয়া আরোপ করেন, তখন সতর্কতাবলম্বী ও সহজীকরণ পছন্দকারী উলামায়ে কেরাম এই বলে তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকেন যে, 'তাবীলকারীর তাকফীর তথা তাবীলকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই'। খোদ ওইসব লোকও উলামায়ে হকের মোকাবিলায় এ ধরণের আলেমদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এ জন্যই গ্রন্থকার রহ. 'তাকফীরে আহলে কেবলা'র মাসআলার ন্যায় এই 'তাবীল' এর মাসআলায়ও স্বতন্ত্র একটি শিরোনাম ও অধ্যায় কায়েম করে উলামায়ে মুহাক্কিকীনের অভিমত ও রায় তুলে ধরেছেন এবং এই মাসআলার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। –[উর্দু] অনুবাদক।

'আহলে কেবলাকে কাফের বলার নিষেধাজ্ঞা' কার কথা? এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা কী?

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন—

আহলে কেবলাকে কাফের বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র শায়খ আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত। কিন্তু যখন আমরা ওইসব (নামসর্বস্ব) মুসলমান ফেরকাসমূহের আকীদা-বিশ্বাসের সমীক্ষা নিই, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব আকীদা বিদ্যমান পাই, যা সুনিশ্চিতভাবে কুফরি। এ জন্য আমরা (এই মাসআলার শিরোনাম এইভাবে বলি যে,) 'আমরা আহলে কেবলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের সাব্যস্ত করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরকে আবশ্যককারী কোনো কথা কিংবা কাজে লিপ্ত না হয়।'

আর এ কথা (لَا نُكَفِّرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ 'আমরা কোনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না' যদিও বাহ্যত ব্যাপক অর্থবোধক, কিন্তু এটি) এমনই একটি বিষয়, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।) অথচ কুফর ও শিরক (এমন গুনাহ যা কারও নিকটই তাওবা ছাড়া) মাফ হবে না।[৬৬]

---

[৬৬] কেননা, আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।] অতএব, বোঝা গেল, প্রথম আয়াতে ذنوب [তথা গুনাহ] দ্বারা কুফর ও শিরক ব্যতীত অন্যসব গুনাহ উদ্দেশ্য। ঠিক তদ্রূপভাবে এই সকল উলামায়ে কেরাম একদিকে বলেন, 'আমরা কোনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না', অন্যদিকে সেই আহলে কেবলাদের মধ্য থেকে গোমরাহ ফেরকাসমূহের কোনো কোনো আকীদা ও আমলকে স্পষ্ট কুফরি বলে আখ্যা দেন। অতএব, বোঝা গেল, উল্লিখিত কথা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে কেবলা কুফরকে আবশ্যককারী কোনো কথা কিংবা কাজে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে কাফের বলব না। কেননা, কুফরি আকীদা ও আমল গ্রহণ করার পর তো তারা কাফের হয়েই গেছে; আহলে কেবলা থাকেনি। অতএব,=

বলেন, আহলে সুন্নাতের জমহুর ফুকাহা এবং মুতাকাল্লিমীন 'আহলে কেবলা'র মধ্য থেকে ওই সকল মুবতাদি' (গোমরাহ ফেরকাসমূহকে কাফের আখ্যা দিতে নিষেধ করেন, যারা (জরুরিয়াতে দীন নয় বরং) জরুরিয়াতে দীন ব্যতীত 'আকায়েদে উমূরে হাক্কা'য় বাতিল তাবীল করে। কেননা, তাদের এ তাবীলও এক ধরনের 'শুবাহ' [সংশয়-সন্দেহ]। (এ জন্য তাদের কুফরি সুনিশ্চিত হল না)

বলেন, এই মাসআলা অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

'ইজমা' জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত

ওই 'কুল্লিয়াত'-এর ৫৫৪ ও ৫৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত অকাট্য ও সুনিশ্চিত ইজমার (বিরোধিতা ও অস্বীকার) করা নিঃসন্দেহে কুফরি। আর জরুরিয়াতে দীনের মধ্য থেকে যে কোনো বিষয়ের অস্বীকারকারীকে কাফের বলার ক্ষেত্রে নিশ্চিত কোনো মতবিরোধ নেই। মতভেদ শুধু ওই অস্বীকারকারীকে কাফের বলার ক্ষেত্রে, যে তাবীলের ভিত্তিতে (এমন কোনো) অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করে (যা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না।)

আহলে সুন্নাতের ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমীনের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত এবং জমহুরে আহলে সুন্নাতের পছন্দনীয় অভিমত হচ্ছে এই যে, 'আহলে কেবলা'দের মধ্য থেকে ওই মুবতাদি' ও গোমরাহ ফেরকাসমূহকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না, যারা জরুরিয়াতে দীন ব্যতীত অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েলে তাবীল করে। (এবং ওই তাবীলের ভিত্তিতে বিরোধিতা করে।) কেননা, তাবীলও এক ধরনের 'শুবাহ' [সংশয়-সন্দেহ]। যেমন 'খাযানায়ে জুরজানী', 'মুহীতে বুরহানী', 'আহকামে রাযী' এবং 'উসূলে বাযদাবি'তে উল্লেখ আছে। আর ইমাম কারখী ও হাকেম শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকেও এ-ই বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া জুরজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমাম হাসান ইবনে

=তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া কোনো আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যা দেওয়া নয়। –[উর্দু] অনুবাদক

যিয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকেও এ-ই রেওয়ায়েত করেন। 'মাকাসেদ' এর ব্যাখ্যাকারী, 'শরহে মাওয়াকেফ' এবং আমদী ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকেও এ-ই রেওয়ায়েত করেছেন। মুতলাকভাবে নয় (অর্থাৎ এমনটা কেউ-ই বলেন না যে, আহলে কেবলার কোনোও 'তাবীলকারী'কে কাফের আখ্যা দেওয়া কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। [এমনটা কেউ-ই বলেন না।] বরং জরুরিয়াতে দীনের বিষয়টি সকলেই পৃথক রাখেন। অতএব, জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকারকারী সকলের নিকটই কাফের; এবং সে ক্ষেত্রে কোনোও তাবীল বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।)

অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা সর্বাবস্থায়ই কুফরি

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফাতহুল মুগীছ'-এ 'মুবতাদিয়ীন'-এর রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হওয়া ও না-হওয়া সংক্রান্ত আলোচনার অধীনে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন–

এই সমস্ত মতবিরোধ ওই সকল 'বিদআত' (গোমরাহীর) ব্যাপারে, যেগুলি কুফরকে আবশ্যক করে না। বাকি রইল কুফরকে আবশ্যককারী বিদআতসমূহের কথা। সে ব্যাপারে কথা হচ্ছে, ওগুলির মধ্যে কিছু তো আছে এমন, যেগুলি কুফরকে আবশ্যক করার ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহই করা যায় না। (সেগুলিকে যারা মানে, তারা নিঃসন্দেহে কাফের। তাদের রেওয়ায়েত কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।) যেমন, ওই সমস্ত লোক, যারা 'অস্তিত্বহীন বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অবগত থাকা'র বিষয়টি অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আল্লাহ্ তাআলা যে কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করার পরই কেবল সে ব্যাপারে জানেন।' অথবা ওই সমস্ত লোক, যারা 'জুযইয়্যাতের ইলম'কে একেবারেই অস্বীকার করে। অথবা ওই সমস্ত লোক, যারা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর সত্তায় আল্লাহ তাআলা প্রবেশ করেছেন বলে দাবি বা বিশ্বাস করে। অথবা ওই সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ তাআলা জন্য স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে 'দেহ' আছে বলে সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে [আল্লাহকে] 'দেহবিশিষ্ট' (ও আরশের উপর আসন পেতে বসে আছেন বলে) মানে বা বিশ্বাস করে।

বলেন, অতএব সঠিক ফায়সালা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ওই রেওয়ায়েতকারীর রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যান করা হবে, যে শরীয়তের এমন

কোনো মুতাওয়াতির বিষয়কে অস্বীকার করবে, যার 'সুবূত কিংবা নফী' তথা যা প্রমাণিত হওয়া কিংবা প্রমাণিত না হওয়া 'দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া' সুনিশ্চিতভাবে জানা ও প্রসিদ্ধ হবে। কিন্তু যে রাবী এমন হবে না, (অর্থাৎ অকাট্য বিষয়াদি ও জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকারকারী না হবে) পাশাপাশি রেওয়ায়েত মুখস্থ ও সুসংরক্ষণ করা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণে গুণান্বিত হবে, সাথে সাথে ছেকা রাবীর অন্যান্য সমস্ত গুণাবলি ও রেওয়ায়েত সহীহ্ হওয়ার যাবতীয় শর্ত-শারায়েত তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তা হলে এমন বিদআতীর রেওয়ায়েত গ্রহণ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

'লুযূমে কুফর' এবং 'ইলতিযামে কুফর' এর পার্থক্য

'ফাতহুল মুগীছ'-এর গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ সামনে গিয়ে বলেন–

দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, কুফরের হুকুম ওই ব্যক্তির উপর আরোপ করা হবে, যার কথা পরিষ্কার কুফরি হয়, অথবা পরিষ্কার কুফরি তার কথা থেকে আবশ্যক হয় এবং তাকে বলে দেওয়া হয় (যে, তোমার এই কথার কারণে কুফরি আবশ্যক হয়) তথাপিও সে তার উপর অটল থাকে। কিন্তু যদি সে তা মেনে না নেয় (যে, আমার কথার কারণে কুফরি আবশ্যক হয়) এবং সে ওই কুফরিকে প্রত্যাখ্যান করে (এবং জওয়াব দেয়) তা হলে সে কাফের হবে না। যদিও (আহলে হকদের নিকট) [তার কথায়] যা আবশ্যক হয়, তা কুফরি।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফাতহুল মুগীছ' রচয়িতার এই (দ্বিতীয়) বর্ণনাকে 'আমরে গাইরে কতয়ী' [অকাট্য বিষয় নয়– এমন বিষয়ের] (এর অস্বীকারের উপর প্রয়োগ করা উচিত। যাতে তার এ বর্ণনা পূর্বের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। (এবং বৈপরিত্য সৃষ্টি না হয়। কেননা, পূর্বের বর্ণনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা সর্বাবস্থায়ই কুফরকে আবশ্যক করে। তা মেনে নেওয়া এবং না-নেওয়ার উপর কুফরের ভিত্তি নয়। অপরদিকে দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, কুফরি আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যদি তার উপর অটল থাকে, তা হলে কাফের হবে, অন্যথায় নয়। অতএব, প্রথম বর্ণনা অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর দ্বিতীয় বর্ণনা অকাট্য বিষয় নয়– এমন বিষয়কে অস্বীকার করার সাথে সম্পর্কিত।)

আরও বলেন, 'ফাতহুল মুগীছ' প্রণেতার আগে ইবনে দকীদ আল-ঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই তাহকীক বর্ণনা করে ফেলেছেন। তিনি বলেন–

আমাদের নিকট প্রমাণিত হচ্ছে এই যে, আমরা রেওয়ায়েতের ব্যাপারে রাবীদের মাযহাব (ও আকীদা-বিশ্বাসের) ই'তিবার করি না। কেননা, আমরা কোনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না। তবে যদি শরীয়তের অকাট্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে, (তা হলে নিঃসন্দেহে তাকে কাফের বলি এবং তার রেওয়ায়েতও গ্রহণ করি না।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফাতহুল মুগীছ' প্রণেতার প্রথম কথা হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। যেমন, হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বিশিষ্ট শাগরিদ মুহাক্কিক ইবনে আমীর হাজ্জ রহ-ও 'তাহরীর' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে নিজের শায়খ হাফেয ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই রায়ই উদ্ধৃত করেছেন।

'লুযূমে কুফর' ও 'ইলতিযামে কুফর' এর ব্যাপারে 'কওলে ফয়সাল'

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

'লুযূমে কুফর' এবং 'ইলতিযামে কুফর' এর মাসআলা(য় মুহাক্কিকীনের তাহকীক)এর সারাংশ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তির কোনো আকীদার কারণে কুফর আবশ্যক হয় এবং ওই ব্যক্তির সে ব্যাপারে কোনো অবগতি না থাকে এবং যখন তাকে বলা হয় (যে, তোমার কথায় এ কুফরি আবশ্যক হয়) তখন সে কুফর আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করে এবং ওই (বিরোধপূর্ণ বিষয়টি) জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না হয়, পাশাপাশি ওই কুফর আবশ্যক হওয়ার বিষয়টিও স্পষ্ট ও পরিষ্কার না হয়, (বরং তা আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হয়) তা হলে এমন ব্যক্তি কাফের নয়। আর যদি কুফরি আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি সে মেনে নেয়, কিন্তু সে বলে যে, এটা (যা আমার কথায় আবশ্যক হয়) কুফর নয়; অথচ মুহাক্কিকীনের নিকট তা কুফরি হওয়া স্বীকৃত বিষয়, তা হলে এ সুরতেও সে কাফের।

বলেন, এই (তাহকীক ও বিশ্লেষণই কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ কাযী আবু বকর বাকিল্লানী ও শায়খ আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন।) যেমন, তিনি কাযী আবু বকর বাকিল্লানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিম্নবর্ণিত কথা উদ্ধৃত করেন–

মুবতাদিয়ীনের [বিদআতীদের] কথায় আবশ্যক হওয়া কুফরির ব্যাপারে পাকড়াও করার বিষয়টি যে সকল উলামায়ে কেরাম জায়েয মনে করেন না, এবং (আহলে তাহকীকের নিকট) তাদের আকীদা-বিশ্বাসের যে দাবি (কুফর), তা তাদের উপর লাযেম (আরোপ) করেন না; তারা তাদেরকে কাফের বলাও সহীহ মনে করেন না। এর কারণ এই বর্ণনা করেন যে, যখন ওই বিদআতীদেরকে ওই (লুযূমে কুফর) সম্পর্কে অবগত করা হয়, তখন তারা তৎক্ষণাৎ বলে উঠে যে, আমরা তো কখনওই এ কথা বলি না যে, (উদাহরণস্বরূপ) আল্লাহ তাআলা আলেম [জ্ঞানী] নন। আর আপনারা আমাদের কথা থেকে এই যে ফলাফল বের করেছেন, (এবং আমাদের উপর ইলযাম আরোপ করেছেন) তা তো আমরাও তেমনইভাবে অস্বীকার করি যেমনিভাবে আপনারা অস্বীকার করেন। আর আপনাদের মতো আমাদেরও আকীদা এই-ই যে, এটা (আল্লাহর ইলমের গুণকে অস্বীকার করা) কুফরি। বরং আমরা তো এ কথা বলি যে, আমাদের কথা দ্বারা এটা (আল্লাহর ইলমের গুণকে অস্বীকার করা) আবশ্যকই হয় না; যেমনটা আমরা প্রমাণ করে দিলাম। (এ জন্য এ ধরনের লোকদেরকে কেন কাফের বলা হবে?)

আরও বলেন, আর কাযী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ শায়খ আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যে আল্লাহ তাআলার কোনোও গুণের ব্যাপারে অজ্ঞ, 'সে কাফের নয়'; আর তার কারণ শায়খ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই বর্ণনা করেছেন যে,

এই কারণে যে, ওই মূর্খ ব্যক্তি তেমনিভাবে এ (কথা)য় বিশ্বাসী নয় যে, তা হক হওয়ার ব্যাপারে তার সুনিশ্চিত ও অকাট্য বিশ্বাস আছে এবং তাকে দীন ও ধর্ম মনে করে। আর কাফের তো শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যার সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আমার কথাই হক।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই) ইবনে হায্‌ম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বর্ণনা থেকেও স্পষ্ট হয়।

পরিশিষ্ট

যে কোনোও 'মুজমা আলাইহি' বিষয়ের অস্বীকারকারী কাফের; 'মুজমা আলাইহি' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'শরহে জামউল জাওয়ামে' গ্রন্থের ২/১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন–

১. এমন প্রত্যেক 'মুজমা আলাইহি' বিষয়ের অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের, যা উমূরে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। অর্থাৎ এমন বিষয়, যাকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের শক-সন্দেহ ও দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই 'দীন' বলে জানে ও মানে। আর এতে করে বিষয়টি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং উদাহারণস্বরূপ নামায-রোযার আবশ্যকীয়তা ও মদ-যিনার নিষিদ্ধতার পর্যায়ে পৌছে গেছে। (অর্থাৎ নামায-রোযার ফরযিয়্যত ও মদ-যিনার হুরমতের ন্যায় তাকেও উম্মত 'দীন' মনে করে।) কেননা, এ ধরনের বিষয়কে অস্বীকার করার দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর ইবনে হাজেব ও আমদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বর্ণনা থেকে যা অনুমেয় হয় যে, এই মাসআলায় ইখতিলাফ আছে, (এটা নিঃসন্দেহে ভুল।) ওই দুই মুহাক্কিকের উদ্দেশ্য[৬৭] এমন নয়, (যা অনুমেয় হয়)। যেমন, মুহাক্কিক বুনানী 'শরহে জামেউল জাওয়ামে' এর টীকায় বলেন,

বরং ওই দুই হযরতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যে মুজমা আলাইহি বিষয়ের 'দীন' হওয়ার বিষয়টি অকাট্য ও সুনিশ্চিত জানা না যাবে, তাতে মতভেদ আছে। (যে, তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে, না বলা হবে না।) এ ছাড়া যে মুজমা আলাইহি বিষয়ের 'দীন' হওয়ার বিষয়টি অকাট্য ও

---

৬৭. উভয় বুযুর্গের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মতবিরোধপূর্ণ বিষয় জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতেই এতসব কথাবার্তা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। অন্যথায় জরুরিয়াতে দ্বীন এবং অকাট্য বিষয়সমূহকে অস্বীকার করা তো একদম খোলাখুলি কুফরি। তাতে এতো আলোচনা ও বিতর্কের কোনো সুযোগই নেই। –[উর্দু] অনুবাদক

সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত, তার অস্বীকারকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

এরপর 'শরহে জামউল জাওয়ামে'তে বলেন–

২. এমনিভাবে ওই সকল সর্বসম্মত ও (মুসলমানদের মাঝে) জানাকোনা ও প্রসিদ্ধ বিষয় (যদিও সেগুলো জরুরিয়াতে দীনের পর্যায়ে পৌঁছেনি কিন্তু) সেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নস (বিদ্যমান) আছে, উদাহরণস্বরূপ বেচা-কেনা হালাল (এবং সুদ হারাম) হওয়ার বিষয়। এগুলোকে অস্বীকারকারী অধিকতর সহীহ অভিমত অনুযায়ী কাফের। কেননা, এতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এই সুরতে অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা, এটা সম্ভব যে, ওই ব্যক্তির কুরআন-হাদীসের নস জানা নাও থাকতে পারে।

৩. ওই সকল মুজমা আলাইহি, প্রসিদ্ধ ও জানাকোনা বিষয়কে অস্বীকারকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে সংশয় আছে, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই। কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ জাতীয় মুজমা আলাইহি বিষয়সমূহের অস্বীকারকারীকেও কাফের বলা হবে। কেননা, (যদিও স্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই, কিন্তু) সেগুলো 'দীন' হওয়া বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও সকলের জানাকোনা। তবে কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, এ জাতীয় মুজমা আলাইহি বিষয়ের অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে না। কেননা, হতে পারে ওই ব্যক্তির এ বিষয়ের প্রসিদ্ধির ইলম নেই।

৪. যে সকল মুজমা আলাইহি বিষয় 'মুখফী' তথা অপ্রকাশ্য থাকবে, যেগুলো কেবল মাত্র বিশেষ আহলে ইলমগণই জানেন, (সাধারণ মানুষ যেগুলোর ব্যাপারে অবগত নয়) উদাহরণস্বরূপ হজের মধ্যে উকূফে আরাফার আগে সহবাস করে ফেললে হজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া (এ জাতীয় মুজমা আলাইহি বিষয়ের অস্বীকারকারী কাফের হয় না।) যদিও এই মাসআলায় শরয়ী নস বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ঔরসজাত কন্যা বিদ্যমান থাকাবস্থায় পৌত্রী এক-ষষ্ঠাংশ মীরাসের হকদার হওয়া। যেমন, 'বুখারী'র সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত পৌত্রী

ওয়ারিস হওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন। (কিন্তু যেহেতু বিষয়টি অপ্রকাশ্য, এজন্য মুজমা আলাইহি হওয়া সত্ত্বেও তার অস্বীকারকারী কাফের হবে না।)

৫. এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি (দীনী বিষয়াদি ছাড়া) অন্যকোনো দুনিয়াবী সর্বস্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করে, উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীতে 'বাগদাদ' [নামক একটি শহর] এর অস্তিত্ব আছে। তো এর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীও কাফের হবে না।[৬৮]

বড় বড় মুহাক্কিকীনের অভিমত ও বরাত

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, (ইজমা'র প্রামাণ্যতা সংক্রান্ত) এই বিশ্লেষণই উসূলের সাধারণ কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, আমদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর 'কিতাবুল আহকাম'-এ اَلْمَسْئَلَةُ السَّادِسَةُ مِنَ الْإِجْمَاعِ এর অধীনে এবং وَمِنْ شَرَائِطِ الرَّاوِىْ এর অধীনে; এমনিভাবে 'মুখতাসারে ইবনে হাজেব'-এ এবং 'আত-তাহরীর' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তাকরীর'-এ; এমনিভাবে মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে।

---

৬৮. 'জামউল জাওয়ামে' গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক 'মুজমা আলাইহি' (সর্বসম্মত) বিষয় পাঁচ প্রকার। ১. ওই সকল বিষয়-আশয়, যা দ্বীন হওয়ার বিষয়টি এমনই প্রসিদ্ধ, সকলের জানাশোনা ও সুনিশ্চিত যে, তা জরুরিয়াতে দ্বীনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ২. ওই সকল প্রসিদ্ধ ও জানাশোনা বিষয়াদি, যা যদিও জরুরিয়াতে দ্বীনের পর্যায়ে পৌঁছেনি, কিন্তু 'মানসূস' তথা যারা ব্যাপারে নস আছে। ৩. ওই সকল প্রসিদ্ধ ও জানাশোনা বিষয়, যা কেবলই প্রসিদ্ধ; মানসূস না। [অর্থাৎ তার ব্যাপারে কোনো নস নেই।] ৪. ওই সকল 'খফী' তথা অপ্রকাশ্য বিষয়-আশয়, যেগুলোকে শুধুমাত্র আহলে ইলমগণই জানেন; যদিও তা মানসূস হয়। ৫. দ্বীনী বিষয়-আশয়। ১ম প্রকারের অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। ২য় প্রকারের অস্বীকারকারীর ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হল, সে কাফের। কারণ তা মশহুরও আবার মানসূসও। ৩য় প্রকারের অস্বীকারকারী কাফের হওয়া এবং না-হওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। 'খফী' হওয়ার দাবি হচ্ছে, অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না। আর মানসূস হওয়ার দাবি হচ্ছে, তাকে কাফের বলা হবে। ৪র্থ প্রকারের অস্বীকারকারী নিশ্চিত কাফের নয়। তেমনিভাবে ৫ম প্রকারের অস্বীকারকারীও কাফের নয়।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আর হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া'য় اَلْإِخْتِيَارَاتُ الْعِلْمِيَّةُ এর অধীনে এবং 'কিতাবুল ঈমান' এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, মুমিনদের ইজমা [শরীয়তের] হুজ্জত তথা দলীল। কেননা, উম্মতের ইজমার বিরোধিতা করার দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা আবশ্যক হয়। (আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা কুফরি।) তা ছাড়া এই আয়াত এ বিষয়েরও দলীল যে, প্রত্যেক মুজমা আলাইহি বিষয়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নস (স্পষ্ট হাদীস) থাকা জরুরি। অতএব, যে সকল মাসআলার ব্যাপারে সুনিশ্চিত একীন হাসিল হবে যে, উম্মত এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ এবং কোনো মুসলমান এর বিরোধী নয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার বাণী (আয়াতে করীমা) মোতাবেক সেটিই হেদায়েত এবং তার অস্বীকারকারী তেমনই কাফের, যেমন কোনো স্পষ্ট নসকে অস্বীকারকারী (কাফের।)

কিন্তু যে মাসআলার ব্যাপারে উম্মতের ইজমার ধারণা থাকবে, সুনিশ্চিত একীন হাসিল হবে না; তো সে সুরতে তো কোনো কোনো সময় এ কথারই একীনও হাসিল হয় না যে, এটি কি ওই সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো হক হওয়ার বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের. নস দ্বারা প্রমাণিত। এ জন্য এ ধরনের ইজমার বিরোধিতাকারীকে কাফের বলা যাবে না। বরং (এমতাবস্থায় তো) কোনো কোনো সময় ইজমার ধারণাই ভুল হয় এবং তার বিরোধিতা করাই সঠিক হয়।[৬৯]

বলেন–

এটি এই মাসআলার (ইজমা [শরীয়তের] হুজ্জত হওয়ার] স্পষ্ট ও সবচে' বিস্তারিত বর্ণনা যে, কোন ধরনের ইজমা হুজ্জত ও তার অস্বীকারকারী কাফের, আর কোন ধরনের ইজমার বিরোধিতাকারী কাফের নয়।

---

[৬৯]. মোটকথা, 'ইজমায়ে কতয়ী' তথা সুনিশ্চিত ইজমা [শরীয়তের] হুজ্জত তথা দলীল এবং তার অস্বীকারকারী কাফের। এর বিপরীতে 'ইজমায়ে যন্নী' তথা ধারণানির্ভর ইজমাতে এ দু'টি বিষয় নেই। এ জন্য তার বিরোধিতাকারী ও অস্বীকারকারী কাফেরও নয়।

যুরকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ৬/১৬৮ পৃষ্ঠায় نوع ثالث এর مقصد سادس এর অধীনে বলেন—

যদি তোমরা এ প্রশ্ন কর যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কি এটা জানাও শর্ত যে, তিনি 'বাশার' তথা মানুষ ছিলেন অথবা عَرَبِيُّ النَّسَلِ তথা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন? অথচ এটি (বলা) উদাহরণস্বরূপ মা-বাবা প্রমুখের উপর 'ফরযে কেফায়া'। অতএব, পিতা-মাতার কেউ যদি নিজের বুদ্ধিমান সন্তানদের এটি বলে দেন, (যে, তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] 'বাশার' তথা মানুষ ছিলেন অথবা عَرَبِيُّ النَّسَلِ তথা আরবী বংশোদ্ভূত ছিলেন) তা হলে অন্যদের থেকে এই দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। (এটাই ফরযে কেফায়া হওয়ার দলীল। তো এ বিষয়টি ফরযে কেফায়া হওয়া সত্ত্বেও কি ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত?)

বলেন—

শায়খ ওলীউদ্দীন হাফেযে হাদীস আহমাদ ইবনে হাফেযে হাদীস আবদুর রহীম ইরাকী এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে এটি জানা ঈমান সহীহ হওয়ার শর্ত। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা বলে যে, এ বিষয়ে তো আমার ঈমান আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্য রসূল, কিন্তু আমি এটি জানি না যে, তিনি কি 'বাশার' তথা মানুষ ছিলেন, না ফেরেশ্তা না জিন ছিলেন। অথবা যদি এ কথা বলে যে, আমি এটা জানি না যে, তিনি আরবী ছিলেন না অনারবী? তা হলে ওই ব্যক্তি কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, এটা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ [তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে।[৭০]] অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ [আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমি ফেরেশ্তা।[৭১]]

---

[৭০]. সূরা জুমআ : ২

[৭১]. সূরা আনআম : ৫০, সূরা হুদ : ৩১

প্রথম আয়াতে আরবী বংশোদ্ভূত হওয়া এবং দ্বিতীয় আয়াতে মানুষ হওয়ার বিষয়টি মানসূস তথা নস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, ওই ব্যক্তি কর্তৃক আরবী বংশোদ্ভূত কিংবা মানুষ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা পবিত্র কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করার নামান্তর। তা ছাড়া ওই ব্যক্তি এমন এক সুনিশ্চিত ও মুজমা আলাইহি বিষয়কে অস্বীকার করছে, যা উম্মত প্রথম দিন থেকেই বংশানুক্রমে জেনে আসছে এবং প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষও অকাট্য ও সুনিশ্চিতরূপে (অর্ধ দিবসের সূর্যের ন্যায়) জানে এবং মানে। অতএব, এই (ইজমায়ে উম্মত) জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। (যা অস্বীকার করা কুফরি।) আর আমাদের জানা মতে (উম্মতের মধ্যে) তার বিরোধিতাকারীও কেউ নেই। (এ জন্য তা ইজমায়ে কতয়ী তথা অকাট্য ইজমা হয়ে গেছে।) সুতরাং, যদি এমন কোনো মূর্খ ও নির্বোধ থাকে যে, এই (দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট) বিষয়কেও না জানে, তা হলে তাকে বলে দেওয়া এবং অবগত করা (প্রত্যেক মুসলমানের জন্য) ফরয। তারপরও যদি সে এই জরুরি (স্পষ্ট ও পরিষ্কার) বিষয়কে অস্বীকার করে, তা হলে তাকে আমরা অবশ্যই কাফের আখ্যা দিব। কেননা, যে কোনো জরুরি (বদীহী) বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরি। তবে যে সকল বিষয় জরুরি ও একীনী না, সেগুলোকে অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরি না। যদিও বলে দেওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করে থাকে। (যুরকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 'ইজমায়ে কতয়ী' তথা অকাট্য ইজমাকে অস্বীকার করা কুফরি।) যুরকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কিতাব البهجة এর ব্যাখ্যাতাগণের আলোচনার সারমর্মও এই-ই।

খতমে নবুওয়তের আকীদা ইজমায়ী, তা অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের এবং তাতে কোনো ধরনের তাবীল ও নির্দিষ্টকরণ গ্রহণযোগ্য নয়

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'কিতাবুল ইকতিসাদ'-এ বলেন–

উম্মতে মুসলিমা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভাষ্য (اِنْقَطَعَتِ النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ فَلَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَلَا رَسُوْلَ) এর উদ্দেশ্য এটিই বুঝেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (স্বীয় উম্মতকে)

বলেছেন যে, আমার পর কেয়ামত পর্যন্ত না কোনো নবী আসবে আর না কোনো রসূল আসবে। এ বর্ণনায় না কোনো তাবীল-ব্যাখ্যা আছে আর না তাতে কোনো তাখসীস তথা নির্দিষ্টকরণ আছে। এখন যে কেউ-ই তাতে কোনো তাবীল কিংবা তাখসীস করবে, তার কথা বেহুদা ও প্রলাপ বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তিকে কাফের বলার ক্ষেত্রে কোনোই প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা, এ ব্যক্তি ওই স্পষ্ট নসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, তার মধ্যে না কোনো ধরনের তাবীলের অবকাশ আছে আর না কোনো ধরনের তাখসীসের সুযোগ আছে।

মূলনীতি : কোন বিদআত (গোমরাহী) কুফরির কারণ আর কোন বিদআত কুফরির কারণ নয়

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'রাসায়েলে ইবনে আবিদীন'-এ ৩৬০ পৃষ্ঠায় বলেন–

এর উপরও ইজমা আছে যে, প্রত্যেক ওই বিদআত (গোমরাহী) যা এমন অকাট্য দলীলের পরিপন্থী ও বিরোধী হয়, যা ইলমে একীনী তথা ই'তিকাদ ও আমলকে ওয়াজিব করে, এমন আকীদায় বিশ্বাসী বিদআতীকে কাফের আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শক-সন্দেহকেই প্রতিবন্ধক মনে করা হবে না। যেমন, الإختيار -এ স্পষ্ট করেছেন যে, প্রত্যেক ওই বিদআত (গোমরাহী) যা এমন অকাট্য দলীলের বিরোধী হয়, যা ইলম ও তার উপর আমলকে সুনিশ্চিতভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দেয়, তা কুফরি। আর যে বিদআত এমন দলীলের পরিপন্থী না হয়, বরং শুধু এমন দলীলের পরিপন্থী হয়, যা শুধু প্রকাশ্য আমলকে ওয়াজিব করে, ওই বিদআত (গোমরাহী) কুফরি নয়।

'রাসায়েলে ইবনে আবিদীন'-এর ২৬২ পৃষ্ঠায় বলেন,

দ্বিতীয় অভিমত, যা 'মুহীত'-এ উল্লেখ আছে, তা সেটিই যা আমরা شرح الإختيار এবং شرح عقائد থেকে এর পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। ওই অভিমত ও ইবনুল মুনযির এর বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, যাদেরকে কাফের বলা হয়েছে, তাদের দ্বারা ইবনুল মুনযির এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সমস্ত লোক, যারা অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করে।

জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকারকারী কাফের; অকাট্য বিষয়সমূহের অস্বীকারকারীকে বলা সত্ত্বেও যদি অস্বীকারের উপর অটল থাকে, তা হলে সে-ও কাফের

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'বেনায়া'র যে কপি পাওয়া যায়, তার بَابُ الْبُغَاتِ এর অধীনে লিখেছেন–

'মুহীত'-এ বর্ণিত আছে যে, আহলে বিদআত (গোমরাহ ফেরকাসমূহ)কে কাফের বলার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম কোনও বিদআতী ফেরকাকেই কাফের বলেন না। আবার কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম তাদেরকোনো কোনো ফেরকাকে কাফের বলেন। (কোনো কোনোটিকে বলেন না।) এ পক্ষের উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক ওই বিদআত (গোমরাহী) যা কোনো অকাট্য দলীলের পরিপন্থী হবে, তা কুফরি। (এবং তা মান্যকারী কাফের) আর যে বিদআত কোনো অকাট্য এবং ইলম ও একীনকে ওয়াজিবকারীর পরিপন্থী না হবে, ওই বিদআত গোমরাহী (এবং তা মান্যকারী গোমরাহ; কাফের নয়।) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামায়ে কেরামের এর উপরই ভরসা।

বলেন, বাকি 'ফাতহুল কদীর'-এ এই (পার্থক্য) সম্পর্কে যে কালাম করা হয়েছে যে, 'মুহীত' প্রণেতার উদ্দেশ্য (মতভেদপূর্ণ বিষয় দ্বারা) ওই সকল বিষয়, যেগুলো জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না। (অর্থাৎ এই বিশ্লেষণ ও পার্থক্য শুধু জরুরিয়াতে দীন নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।। আর জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকারকারী সর্বাবস্থায়ই কাফের।) আল্লামা ইবনে আবিদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উপরই যথেষ্ট করেছেন (যে, এই পার্থক্য শুধু জরুরিয়াতে দীন নয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।) তো মুহাক্কিক ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ফাতহুল কদীর' এর بَابُ الْإِمَامَةِ-এ এ ব্যাপারে সংশয়ের প্রকাশ করেছেন (যে, জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে এই পার্থক্য গ্রহণযোগ্য কি না) যেমন فواتح الرحموت-এ এ বিষয়ে সতর্কও করা হয়েছে।

বলেন, এ জন্য 'মুহীত' এর আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। বিশেষ করে যখন তিনি তাকে আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত

বলেন। ইবনে আবিদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহও بَابُ الْبُغَاتِ-এ ওই 'ফাতহুল কদীর' এর বর্ণনার উপর ইসতেদরাক করেছেন। উপরন্তু যখন জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে কাফের আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতভেদই নেই। যেমন 'তাহরীর'-এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং এমন অকাট্য বিষয়ের ব্যাপারে তাকফীর তথা কাউকে কাফের সাব্যস্ত করা, যা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত না, শুধুমাত্র ওই সুরতে প্রয়োগ করেছেন, যখন স্বয়ং অস্বীকারকারীরই বিষয়টি অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে জানা থাকবে অথবা আহলে ইলমগণ তাকে বলবে, আর তা সত্ত্বেও সে অস্বীকারের উপর অটল ও অবিচল থাকবে। যেমন, 'মুসায়ারা'র ২০৮ পৃষ্ঠায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। এতে মাসআলা একেবারেই স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আলোচনার কোনো অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না।[৭২]

কুফরকে আবশ্যককারী বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির পিছনে নামায জায়েয নেই

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'বাদায়েউস সানায়ে'র –যা ফিকহে হানাফীর উঁচু স্তরের ও নির্ভরযোগ্য কিতাব– ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

মুবতাদি' (গোমরাহ) এবং ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহ। ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'আমালী'তে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, আমি একে মাকরূহ মনে করি যে, ইমাম বিদআতী ও ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হবে। কেননা, সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী মুসলমান

---

[৭২]. সারকথা, জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করার কারণে কাফের সাব্যস্ত করা সর্বসম্মত বিষয়। এতে কোনো মতবিরোধ নেই। তেমনিভাবে অন্যান্য অকাট্য বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার কারণে কাফের সাব্যস্ত করাও সর্বসম্মত; তবে এই শর্তে যে, হয়তো অস্বীকারকারী নিজেই বিষয়টি অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে অবগত থাকবে এবং তা অস্বীকার করবে অথবা তাকে বলে দেওয়ার পরও সে ফিরে আসবে না এবং অস্বীকারের উপর অটল থাকবে। কেবলমাত্র ওই ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না, যে এমন অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করবে, যা জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না এবং অস্বীকারকারী বিষয়টি অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে অবগত নয়। অবশ্য এ ধরণের অস্বীকারকরীকে ওই সকল বিষয় অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে অবহিত করা হবে। যদি সে ফিরে আসে তা হলে তো ভালো, অন্যথায় তাকেও কাফের সাব্যস্ত করা হবে। والله إعلم

এমন ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় করাকে পছন্দ করে না। বাকি রইল এ মাসআলা যে, এমন ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে হানাফীদেরকোনো কোনো মাশায়েখ তো বলেন যে, মুবতাদি' তথা বিদআতীর পিছনে নামায সহীহই হয় না। 'মুন্তাকা' নামক গ্রন্থে তো ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে একটি বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন যে, ইমাম সাহেব [আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ] বিদআতীর পিছনে নামায আদায় করাকে জায়েয মনে করতেন না। কিন্তু সহীহ কথা হচ্ছে, যদি ওই বিদআত কুফরকে আবশ্যককারী হয়, তা হলে এমন বিদআতীর পিছনে নামায আদায় করা না-জায়েয। আর যদি কুফরকে আবশ্যককারী না হয়, তা হলে জায়েয আছে, তবে মাকরূহ।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর প্রসিদ্ধ উক্তি 'আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যা দিতে নিষেধাজ্ঞা'র হাকীকত

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই 'মুন্তাকা' –যার রেওয়ায়েতের বরাত দিয়েছেন 'বাদায়েউস সানায়ে' প্রণেতা– সেই 'মুন্তাকা', যার বরাতে 'মুসায়ারা'র ২১৪ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে 'আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা'র প্রসিদ্ধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। (যার আলোচনা হয়ে গেছে) অতএব, 'মুন্তাকা'র এ বর্ণনা ওই বর্ণনাকে স্পষ্ট করে (যে, ইমাম সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিকট শুধু ওই সুরতেই আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ, যাতে জরুরিয়াতে দীনের অস্বীকার কিংবা অকাট্য বিষয়ের বিরোধিতা না হবে। অন্যথায় যদি কোনো আহলে কেবলা জরুরিয়াতে দীন কিংবা অকাট্য কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে, তা হলে তাকে অবশ্যই কাফের বলা হবে। এ জন্যই তার পিছনে নামায আদায় করা জায়েয নেই। যেমনটা ওই রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হল।)

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, بَابُ الشَّهَادَةِ এর অধীনেও এই বিশ্লেষণই বর্ণনা করেছেন। আর 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'য় তো স্পষ্ট করেছেন যে, (ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ) 'আসল' (মাবসূত)-এ এ (নামায না হওয়ার) বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। 'আল বাহরুর রায়েক' প্রণেতাও 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' থেকে এই-ই উদ্ধৃত করেছেন।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফাতহুল কদীর' এর ওই বর্ণনার দিকেও প্রত্যাবর্তন করা উচিত, যা 'তিন তালাক প্রাপ্তা নারীকে হালাল করার হীলা'র সাথে সংশ্লিষ্ট।

জরুরিয়াতে দীন এবং দীনের অকাট্য বিষয়সমূহের অস্বীকারকারী পাক্কা কাফের; এতে কোনো ধরনের তাবীলের কোনো সুযোগ নেই

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আল্লামা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটী 'হাশিয়ায়ে খায়ালী'তে বলেন,

وَالتَّاوِيْلُ فِيْ ضَرُوْرِيَاتِ الدِّيْنِ لَا يُدْفَعُ الْكُفْرَ.

জরুরিয়াতে দীনের ব্যাপারে তাবীল কুফর থেকে বাঁচাতে পারে না।

বলেন, 'খায়ালী'তেও এটিই বর্ণনা করা হয়েছে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী'র ৩/৩৮ ও ৮/৯০ পৃষ্ঠায় বলেন–

যেহেতু এ বিদআতী (গোমরাহ) ফেরকা আহলে কেবলার অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের আখ্যা না দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তারা জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করে এবং শরয়ী মুতাওয়াতির বিষয়সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ওই সকল বিষয়কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত (ও বদীহী)-ভাবে জ্ঞাত।

বাতিল তাবীল নিজেই কুফরি

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'ফুতুহাতে ইলাহিয়্যা' গ্রন্থের ২/৮৫৭ পৃষ্ঠায় বলেন, ফাসেদ (বাতিল) তাবীল কুফরির মতো। অধ্যায় ২৮৯ দ্রষ্টব্য।

'লুযূমে কুফর' কুফর কি না?

'কুল্লিয়াতে আবুল বাকা'য় 'কুফর' শব্দের অধীনে লেখেন–

প্রত্যেক ওই কথা কুফরকে আবশ্যককারী, যাতে কোনো 'মুজমা আলাইহি' ও 'মানসূস' বিষয়ে অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। চাই [বক্তা] তাতে বিশ্বাসী হোক কিংবা বিদ্বেষবশত বলে থাকুক (এতে কোনো পার্থক্য হয় না।)

ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'ইয়াওয়াকীত'-এ বলেন–

কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন যে, সঠিক কথা হচ্ছে কারও মাযহাব তথা মতাদর্শ দ্বারা যে বিষয় আবশ্যক হয়, তা তার মাযহাব নয় এবং কেবলমাত্র কুফর আবশ্যক হওয়ার দ্বারা কোনো ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না। কেননা, আবশ্যক হওয়া এক জিনিস আর তার 'ইলতিযাম' (তথা গ্রহণ) করা আরেক জিনিস। কিন্তু 'মাওয়াকেফ' এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি ('লুযূমে কুফর' কুফর না হওয়া) এই শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত যে, ওই মাযহাব তথা মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তির বিষয়টি আবশ্যক হওয়া ও সেটি কুফরি হওয়ার বিষয়টি জানা না থাকতে হবে। (আর যদি সে জানে যে, আমার মতাদর্শের উপর এই বিষয়টি আবশ্যক হয় এবং এটি কুফরি, তা সত্ত্বেও সে তার উপর অটল থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা কুফরি।) কারণ, 'মাওয়াকেফ' প্রণেতার ভাষ্য এই–

مَنْ يَلْزَمُ الْكُفْرَ لَا يَعْلَمُ بِهِ لَيْسَ كُفْرٌ.

যার উপর কুফরি[র হুকুম] আবশ্যক হয়ে যাবে, কিন্তু ওই বিষয়ে সে অবগত না, তা হলে সে কাফের নয়।

এই মর্ম থেকে একেবারে স্পষ্ট যে, যদি সে জানে তা হলে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, সে জেনে-বুঝে কুফরিকে গ্রহণ করেছে। والله أعلم

'কুল্লিয়াতে আবুল বাকা'য় বলেন–

(কারও কথা দ্বারা) এমন কুফর আবশ্যক হওয়াও কুফরি, যা কুফরি হওয়ার বিষয়টি (সকলেরই) জানা। কেননা, যখন (লাযেম এবং তার) লুযূম প্রকাশ ও স্পষ্ট হবে, তখন সেটা ইলতিযাম (জেনে-বুঝে গ্রহণ করা) এর হুকুমে; অনবগত থাকাবস্থায় আবশ্যক হওয়ার হুকুমে নয়।

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, 'মাওয়াকেফ' এর (উপরোল্লিখিত) ভাষ্যে 'লাযেম' কুফরি হওয়ার বিষয়টি জানার সঙ্গে শর্তযুক্ত না। এ ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই আছে যে, 'আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি' জ্ঞাত হবে। (অর্থাৎ ইমাম শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ 'লাযেম কুফরি হওয়ার ইলম' নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেছেন। 'মাওয়াকেফ' প্রণেতার ভাষ্য থেকে তো শুধু

এতটুকু বোঝা যায় যে, অনবগত থাকাবস্থায় যে কুফর আবশ্যক হয়, তা কুফরি নয়।)

জরুরিয়াতে দীনে তাবীলও কুফরি, বরং 'তাবীল' 'অস্বীকার' থেকেও জঘন্য

প্রসিদ্ধ মুহাক্কিক হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় কিতাব 'ইছারুল হক আলাল খাল্ক'-এর ২৪১ পৃষ্ঠায় বলেন–

> এ জন্য যে, জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করা কিংবা তাতে তাবীল করা কুফরি।

ওই কিতাবেরই ৪৩০ পৃষ্ঠায় বলেন–

এ ছাড়া তাদের উপর[৭৩] এই অভিযোগও আরোপিত হয় যে, কখনও কোনো হারাম বিষয়ের হুরমতকে স্বীকার করে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় ওই হারাম বিষয়কে তাবীল করে হালাল বানিয়ে নেওয়া অধিকতর জঘন্য (গোমরাহীর কারণ) হয়। আর এটা তখন হয়, যখন ওই তাবীলের মাধ্যমে হালাল বানিয়ে নেওয়া বিষয়টি এমন হয় যে, তার হুরমত [তথা নিষিদ্ধতার বিষয়টি] অকাট্যভাবে সকলেরই জানা। উদাহরণস্বরূপ, নামায ছেড়ে দেওয়া (অর্থাৎ কোনো তাবীলের ভিত্তিতে নামাযকে ছেড়ে দেওয়া অথবা এ কথা বলা যে, নামায মূলত মূর্খ ও অবাধ্য আরবদের মাঝে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং আমীরের আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য ছিল; আর অযু ছিল তাদেরকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্থ করে তোলার জন্য, আমাদের এ সবের প্রয়োজন নেই) সুতরাং, যে ব্যক্তি (এ ধরনের কোনো) তাবীল করে নামায ছেড়ে দেয়, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়ে না, কিন্তু তা ফরয হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে, তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে। (অধিকাংশ ইমাম ও ফুকাহাগণ তাকে গুনাহগার ও ফাসেক বলেন। কোনো কোনো উলামায়ে যাহের তাকে কাফের বলেন।) তো দেখুন, উল্লিখিত উদাহরণে তাবীল (এর হুকুম ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়ার বিপরীতে) হারাম হওয়ার

---

[৭৩]. অর্থাৎ ওই সকল লোকের উপর, যারা 'ভুল তাবীল' এর উপর ভিত্তি করে কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যাদানকারীকেও কাফের বলে দেয়।

দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা জঘন্য। (যে, তাবীল করে নামায ছেড়ে দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি, আর কোনো ধরনের তাবীল করা ছাড়া ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেওয়া কুফরি হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। কেউ কাফের বলেন, আর কেউ বলেন না।)

যে তাবীল জরুরিয়াতে দীনের পরিপন্থী ও বিরোধী, তা কুফরি

উল্লিখিত কিতাবেরই ১২১ পৃষ্ঠায় বলেন–

মানুষ কখনও এমন বিষয়ে তাবীল করার দ্বারাও কাফের হয়ে যায়, যাতে তাবীলের 'মতলক' তথা সাধারণ অবকাশ নেই। যেমন, 'ক্বারামিতিয়া' সম্প্রদায়ের তাবীলসমূহ (যে, আল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সমকালীন যামানার ইমাম বা নেতা।) আবার কিছু কিছু তাবীলের দ্বারা জরুরিয়াতে দীনের বিরোধিতা আবশ্যক হয় কিন্তু তাবীলকারীদের খবরই থাকে না (এবং তারা কাফের হয়ে যায়।) এটি এমন এক মাকাম, যেখানে মানুষ ইলমে ইলাহী এবং আহকামে আখেরাতের বিচারে কুফরের আশঙ্কা থেকে কখনোই নিরাপদ থাকতে পারে না; যদিও আমরা জানি না।

১২১ পৃষ্ঠায় বলেন–

তেমনিভাবে উলামায়ে উম্মতের এর উপরও ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, যে কোনো অকাট্য শ্রুত বিষয় (অর্থাৎ এমন বিষয় যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'মাসমু' তথা শ্রুত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত) এর বিরোধিতা কুফরি এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমার্থক।

ইসলাম অনুসরণীয়, কারও অনুগামী নয়

১৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন–

এটিও একটি প্রমাণিত বাস্তবতা যে, ইসলাম (এক পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত) 'ওয়াজিবুল ইত্তিবা' মাযহাব তথা এমন এক ধর্ম, যার অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়। (মানবীয় চিন্তা-ভাবনা কর্তৃক) উদ্ভাবিত নয়। (সুবিন্যস্ত কর্মপন্থা। বিধায় এতে কোনো মানবীয় বিবেক-বিবেচনা ও যুক্তিকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া যায় না।) আর এ জন্যই যে ব্যক্তি (যে কোনো কারণে) তার যে কোনোও রুকনকে অস্বীকার করবে, সে কাফের। কারণ, তার যাবতীয় রুকন অকাট্য ও সুনিশ্চিতরূপে প্রসিদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট। এমতাবস্থায় শরীয়ত কোনো বাতিল বিষয়কে তার ভ্রান্ততার উপর সতর্ক করা ছাড়া

খোলাখুলি ও প্রকাশ্যভাবে এবং বারবার উল্লেখ করতে পারে না। বিশেষ করে ওই বিষয়, যাকে এরা (অস্বীকারকারীরা) বাতিল নাম রাখছে। সেই বিষয় কিতাবুল্লাহর সমস্ত আয়াত এবং অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবে বর্ণিত ও প্রসিদ্ধ। কিতাবুল্লাহর কোনো আয়াত তার বিরোধী ও পরিপন্থীও নয় যে, সামঞ্জস্যবিধান ও সমন্বয়সাধন (এবং বিরোধনিষ্পত্তি) এর উদ্দেশ্যে তাতে তাবীলের অবকাশ সৃষ্টি করা হবে।

'ফেরকায়ে বাতেনিয়া'র তাবীলসমূহ

উপরোল্লিখিত মুহাক্কিক 'তাবীলাতে বাতেলাহ' এর অধীনে ১২৯ ও ১৩০ পৃষ্ঠায় বলেন–

তাবীলের বিচারে ভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গর্হিত এবং সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় হচ্ছে 'ফেরকায়ে বাতেনিয়া' (ক্বারামতিয়া) এর মতাদর্শ। যারা 'তাওহীদ' 'তাকদীস' ও 'তানযীহ' এর নামে সমস্ত (সিফাতে ইলাহিয়্যা এবং) আসমায়ে হুসনার আজব আজব (হাস্যকর) তাবীল করে আল্লাহ তাআলার সকল নামের গুণাবলিকে অস্বীকার করে বসেছে এবং দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলার উপর এ সকল নামের গুণাবলি প্রয়োগ করার দ্বারা 'তাশবীহ' তথা [সৃষ্টিজীবের সাথে] সাদৃশ্য আবশ্যক হয়। (আর আল্লাহ তাআলাকে কোনো মাখলুকের সাথে উপমা দেওয়া শিরক।) আর এ ক্ষেত্রে তারা এত বেশি সীমা অতিক্রম করেছে এবং এত বেশি বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা বলতে শুরু করেছে, 'আল্লাহ তাআলাকে না বিদ্যমান বলা যায়, না অস্তিত্বহীন বলা যায়'। বরং তারা এ-ও বলে দিয়েছে যে, 'আল্লাহ তাআলা শব্দ ও বর্ণের মাধ্যমে বিশ্লেষণও করা যাবে না'। আর যে সকল আসমায়ে হুসনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর তাবীল তারা এই করেছে যে, ওগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য (আল্লাহ তাআলা নন, বরং) তাদের 'সমকালীন ইমাম'। আর তার নামই তাদের নিকট 'আল্লাহ'। আর لا إله إلا الله (কালিমায়ে তাওহীদেও) 'আল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য 'যামানার ইমাম'। (নাউযুবিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা)[৭৪]

---

[৭৪] আমাদের যামানায়ও এক যিন্দীক খুব জোরোশোরে তার লেখা ও রচনাবলিতে লিখে যাচ্ছে যে, أطيعوا الله [তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে= ='মারকাযে মিল্লাত' তথা সমকালীন শাসক। বড় সত্য কথা– 'যার নুন খায়, তার গুণ গায়'।

বলেন–

তাদের এ আকীদা 'তাওয়াতুর'-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি আমার নিজের চোখে তাদের এ আকীদা তাদের অসংখ্য কিতাবে দেখেছি; যে সকল কিতাব তাদের মাঝে প্রচলিত ও পাওয়া যায়; অথবা তাদের গ্রন্থাগার, ভাণ্ডার এবং ওইসব দুর্গে পাওয়া গেছে, যেগুলোকে তলোয়ারের জোরে দখল করা হয়েছে কিংবা দীর্ঘ অবরোধের পর জয় করা হয়েছে; অথবা যা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কারও হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে কিংবা গোপন স্থানে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে; যেগুলোকে তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশিত হয়ে পড়ার ভয়ে গোপন করে ফেলেছিল। অতএব, যেমনটা প্রত্যেক মুসলমান জানে যে, এই আকীদা ও তাবীলে প্রকাশ্য কুফরি রয়েছে। আর এ তাবীল এমন তাবীল নয়, যেমন আয়াতে করীমা 'وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا'-এ আছে যে, قرية [জনপদ] দ্বারা উদ্দেশ্য أهل قرية তথা জনপদবাসী এবং عير [কাফেলা] দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে أهل عير তথা কাফেলার যাত্রী। যাকে 'ইলমে মাআনী'র উলামাগণ ايصال بالحذف নামে উল্লেখ করেন। কিন্তু তার যথাযথ ও সঠিক জ্ঞান ওই ব্যক্তিরই হতে পারে, যার জীবন ইসলামী পরিবেশ এবং মুসলমানদের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে এবং তার কান ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। পক্ষান্তরে ওই বাতেনী ফেরকার লোক, যে বাতেনীদের মাঝে এবং বাতেনী পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে, সে এই হাকীকতের কী বুঝবে?

বলেন–

এমনিভাবে ওই মুহাদ্দিস, যার জীবন হাদীস ও রেওয়ায়েতের অধ্যয়ন ও আলোচনা-পর্যালোচনায় অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোনো কোনো মুতাকাল্লিমীনের তাবীলসমূহকে এমনই (ভুল বলে) জানেন, (যেমন ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত মুসলমান 'বাতেনিয়্যা'দের তাবীলসমূহকে [ভুল জানে]) তেমনিভাবে একজন 'মুতাকাল্লিম', যার জীবন কেটেছে 'ইলমে কালাম' নিয়ে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে দূরে থাকা এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের অবস্থা সম্পর্কে অনবগত থাকার কারণে একজন মুহাদ্দিসের ইলম থেকে এমনই দূর এবং

অপরিচিত হয়ে থাকে, যেমন এই বাতেনীরা এক মুসলমানের ইলমের সঙ্গে অপরিচিত। এ জন্য একজন মুতাকাল্লিম তো 'ইলমে আদব' ও 'ইলমে মাআনী'র উলামায়ে কেরাম কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতি ও 'মাজায' এর শর্তসমূহকে সামনে রেখে তাবীলকে জায়েয সাব্যস্ত করে দেন এবং ওই দৃষ্টিকোণ থেকে তা সহীহও হতে পারে, কিন্তু একজন মুহাদ্দিসের নিকট অকাট্য ও সুনিশ্চিত ইলম বিদ্যমান আছে যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণ (এ সকল নুসূসে) এই তাবীল নিঃসন্দেহে করেননি, যেমন একজন মুতাকাল্লিমের নিকট (আরবী ভাষা ও ইলমে মাআনীর মূলনীতির আলোকে) সুনিশ্চিত ইলম বিদ্যমান আছে যে, সালাফে সালেহীন আসমায়ে হুসনার মধ্যে এই তাবীল কখনোই করেননি যে, সেগুলো 'মিসদাক' তথা উদ্দিষ্ট হচ্ছে 'সমকালীন ইমাম'। যদিও ওই مجاز بالحذف –যার ভিত্তিতে বাতেনিয়্যারা আসমায়ে হুসনার মধ্যে তাবীল করেছে– আপন জায়গায় ভাষারীতি অনুযায়ী সকলের নিকটই সহীহ, কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও সুনির্দিষ্ট আলামত থাকে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে 'মুযাফ'কে উহ্য মানা যায়। বাতেনিয়্যারা ইলমে আদব ও ইলমে লুগাতের এই কায়দাকে নিঃসন্দেহে অপাত্রে প্রয়োগ করেছে।

'ঈসারুল হক' কিতাবের ১৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

বাকি রইল 'তাফসীর' তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তো সেটি 'আরকানে ইসলাম' (উদাহরণস্বরূপ, নামায, রোযা, হজ, যাকাত) এবং 'আসমায়ে হুসনা' যেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে সকলেরই জানা, সেগুলোর তাফসীরকে আমরা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করি। কেননা, সেগুলো তো একেবারেই স্পষ্ট। (কোনো তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী না।) এবং সেগুলোর অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট। (তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই।) সেগুলোর তাফসীর বা ব্যাখ্যা তো কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে সেগুলোতে বিকৃতি ঘটাতে চায়। যেমন, মুলহিদ ও বাতেনিয়্যা সম্প্রদায়। আর যেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না এবং তা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে কষ্ট ও জটিলতা দেখা দেয়, তখন সেগুলোর তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যদি গোমরাহীর আশঙ্কা ও ভুল করে গুনাহে পতিত হওয়ার ভয় থাকে, তা হলে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো আকীদার সাথে সম্পর্কিত (ওগুলোকে তো আমরা আপন

অবস্থায় রেখে দিব) এবং সেগুলোর মধ্যে যেগুলো 'খোদ সাখ্‌তাহ' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে একেবারেই ছেড়ে দিব এবং সতর্কতা ও নীরবতা অবলম্বনের পন্থা গ্রহণ করব। কেননা, সেগুলোতে তো আমলের প্রশ্নই আসে না যে, ওগুলোর নির্দিষ্ট অর্থের পরিচয় লাভ করা জরুরি হবে। (তা হলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কী প্রয়োজন? যেভাবে কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আমরা ঈমান আনব; আল্লাহ তাআলার নিকট সেগুলো যা-ই উদ্দেশ্য থাকুক, তা হক ও সত্য; যদিও আমরা তা জানি না।) আর যদি গোমরাহীর আশঙ্কা না থাকে, (এবং তার সম্পর্ক আমলের সঙ্গে হয়) তা হলে আমরা 'যন্নে গালেব' তথা প্রবল ধারণার উপর আমল করব। (অর্থাৎ যন্নে গালেবের সাহায্যে সেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তার উপর আমল করব।) কেননা, আমলী বিষয়ে যন্নে গালেবই গ্রহণযোগ্য এবং উম্মতের ইজামার দ্বারা যন্নে গালেবের উপর আমল করা ওয়াজিব বা জায়েয। والله الهادى والموفق

দীন ইসলাম মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্তের উর্ধ্বে

ওই কিতাবেরই ১১৬ পৃষ্ঠায় বলেন,

দ্বিতীয়ত, উম্মতের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি দীনের –যা অকাট্যরূপে জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ –বিরোধিতা করবে, তাকে কাফের বলা হবে। আর যদি সে দীনে প্রবেশ করা (ও মুসলমান হওয়া)র পর (ওই বিরোধিতার ভিত্তিতে) দীন থেকে বের হয়ে থাকে, তা হলে তাকে মুরতাদ বলা হবে। আর যদি দীন মানুষের (জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস এবং) চিন্তা-ভাবনা থেকে উদ্ভাবিত হত, (অর্থাৎ মানবীয় বিবেক যদি দীনের প্রবর্তক হত) তা হলে তাকে অস্বীকারকারী কাফের হত না। (কেননা, তখন দীনকে প্রবর্তনকারীও হত মানবীয় বিবেক আর তার বিরোধিতাকারীও হত মানবীয় বিবেক। আর মানবীয় বিবেকের উপর অপর মানবীয় বিবেকের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য নেই যে, তার বিরোধিতাকারী 'মুরতাদ' এবং 'ওয়াজিবুল কতল'[৭৫] হবে।) অতএব, প্রমাণিত হল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় ও মজবুত (মানবীয় বিবেকের আয়ত্ত-বহির্ভূত) দীন নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। [পাশাপাশি এ-ও প্রমাণিত

[৭৫]. অর্থাৎ যাকে হত্যা করা ওয়াজিব। –অনুবাদক

হল যে) কোনো ব্যক্তির জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এই দীনের মধ্যে কোনো ধরনের দোষ-ত্রুটি ও খুঁত বের করার হিম্মত করবে এবং তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করবে।[৭৩]

কুফরকে আবশ্যককারী বিষয়ে তাবীল করা কাফের সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়

ওই কিতাবেরই ৪১৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

মনে রাখবেন, মূলত কুফরির ভিত্তি হচ্ছে ইচ্ছাকৃত 'তাকযীব' (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা)র উপর; চাই প্রসিদ্ধ ও জানাকোনা ঐশী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে কোনো কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, অথবা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্য থেকে কোনো নবী-রসূলকে অস্বীকার করুক, অথবা ওই দীন ও শরীয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, যা তাঁরা [নবী-রসূলগণ] নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন; তবে শর্ত হচ্ছে যে দীনী বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তা জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে কোনোও মতভেদ নেই যে, এই ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সুনিশ্চিত কুফরি। আর যে ব্যক্তি তাতে লিপ্ত হবে, যদি সে সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন, জ্ঞানী ও সাবালক হয় এবং বিবেক-বুদ্ধিশূন্য (পাগল-দিওয়ানা) কিংবা মাজবুর ও অপারগ না হয়, তা হলে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর ওই ব্যক্তিও কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই, যে কোনো মুজমা আলাইহি, স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে জানাকোনা ও জ্ঞাত দীনী বিষয়কে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাবীল করে থাকে; অথচ অবস্থা এমন যে, তাতে তাবীল সম্ভব নয়। যেমন, মুলহিদ 'ক্বারামিতিয়া' সম্প্রদায়।

আলোচনাধীন মাসআলায় اَلْقَوَاصِمُ وَالْعَوَاصِمُ এর গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিসমূহ

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-ওযীরুল ইয়ামানী'র আরেক কিতাব اَلْقَوَاصِمُ وَالْعَوَاصِمُ থেকে আমরা

---

[৭৩]. এই যামানায় যারা ইসলামকে 'নতুন করে সংস্কার করা'র নামে দ্বীনকে বিকৃত করছে, তাদের কান পেতে শুনে নেওয়া উচিত।

আলোচনাধীন মাসআলার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি পেশ করছি। লক্ষ করুন...

বলেন, আলোচিত মুহাক্কিক (আমরা যে সকল উদ্ধৃতি পেশ করছি, সেগুলো ছাড়াও) ওই কিতাবের প্রথম খণ্ডে নিম্নবর্ণিত শিরোনামের অধীনে তাকফীরের মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

> اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : اَلْإِشَارَةُ إِلَى حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ هٰؤُلَاءِ وَمَا يَرِدُ عَلَيْهَا .
>
> তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ওই সকল লোকের দলীল-প্রমাণ ও তাদের উপর আরোপিত শক-সন্দেহ ও সংশয়ের দিকে ইঙ্গিত, যারা তাদেরকে কাফে বলে।

বলেন, খুব সম্ভবত اَلْوَهْمُ الْخَامِسُ عَشَرَ এর অধীনে এর আলোচনা করেছেন, তা ছাড়া মুহাক্কিক সাহেব 'বায়হাকী'র كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ এর বরাতে খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিশ্লেষণও উদ্ধৃত করেছেন; যা খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অপর কিতাব معالم السنن এর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে এবং 'তাকদীরের মাসআলা'র অধীনে الأسماء والصفات এর বরাতে হযরত উযাইর আলাইহিস সালামের নাম আম্বিয়ায়ে কেরামের তালিকা থেকে মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যকেও স্পষ্ট করে; অথচ উযাইর আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন।

যে তাবীল নবী-যুগে এবং সাহাবা-যুগে শোনা যায়নি, তা গ্রহণযোগ্য নয়

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ جزء ثالث এর শুরুতে বলেন–

দ্বিতীয় দলীল এই এবং এটিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য যে, নবী-যুগে এবং সাহাবা-যুগে ওই সকল নুসূস (এবং আয়াত) এর আধিক্য এবং বারবার সেগুলোর তেলাওয়াতের এমনভাবে পুনরাবৃত্তি যে, না তাতে কোনো তাবীল কারও থেকে শোনা গেছে আর না সেগুলোর বাহ্যিক অর্থের উপর ভরসা করা থেকে কোনো অনবগত লোককে নিষেধ করা হয়েছে। এক পর্যায়ে নবী-যুগ ও সাহাবা-যুগ (এভাবেই) অতিবাহিত হয়ে যায়। এই (তাওয়াতুরে মা'নবী) ওই সকল নুসূস (ও আয়াত) 'মুআওয়াল' তথা তাবীলকৃত না হওয়ার

নিশ্চয়তার (অত্যন্ত মজবুত) দলীল। কুরআনে করীমের এই আয়াতও ওই দলীলের দিকে ইঙ্গিত করে—

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা কোনো ইলম ও একীনের জন্য উপকারী 'দলীলে মাছুর' দ্বারা এর (নিজেদের দাবির) প্রমাণ দাও।[৭৭]

(বোঝা গেল, দাবি সত্য ও সঠিক হওয়ার প্রমাণ ওই দুই বিষয়ের দ্বারা পেশ করা হয়।)

বলেন—

এই জায়গায় গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য এই (তাকফীরের) মাসআলায় এবং [আল্লাহ তাআলার] গুণাবলির আলোচনায় বিদআতীদের বাতিল আকীদাসমূহের মূলোৎপাটন করার জন্য এই দলীল (তাওয়াতুর) কতই না শক্তিশালী ও শানদার দলীল। কারণ, স্বভাবত এটা সম্ভব নয় যে, যে (অর্থ) মু'তাযিলারা প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে, তা প্রকাশ করা ও বর্ণনার জন্য এত দীর্ঘ যামানা অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং তার উত্তম তাবীলও বিদ্যমান থাকবে (যা মু'তাযিলারা করে) আর কেউই ওই তাবীল উল্লেখ করবে না; [এটা সাধারণত সম্ভব নয়] চাই তার উল্লেখ করাটা ওয়াজিব হোক, চাই মুবাহ হোক। (অর্থাৎ তাবীল জরুরি হোক কিংবা জায়েয।)

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন—

ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় কিতাব 'আল-মাহসূল' এর ভূমিকায় —যেখানে লুগাতের আলোচনা করেছেন— এই মাসআলার ব্যাপারেও একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন যে, 'সাময়ী দলীলাদি একীনের জন্য ফায়দাদানকারী হওয়া নিষিদ্ধ'। কেননা, একক শব্দসমূহ ও তা থেকে গঠিত বাক্যসমূহে লুগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে মাজায, হয্‌ফ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারণা ও অনুমানের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। (আর ধারণা ও অনুমান একীনের

---

[৭৭]. সূরা আহকাফ : ৪

পরিপন্থী) আরও বলেন, ওই সকল ধারণা ও অনুমানসমূহ না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো দলীল নেই যে, অনুসন্ধান ও খোঁজ করা সত্ত্বেও ধারণাগুলো পাওয়া যাবে না। (আর কোনো বিষয় পাওয়া না যাওয়া) এটিই 'দলীলে যন্নী'। যেমন, এ সিলসিলায় তারা بسم الله الرحمن الرحيم এর উহ্য (আমেল) এর ব্যাপারে মতানৈক্যের আধিক্যকে উল্লেখ করেন। আর মতানৈক্যের এ আধিক্য স্পষ্টতই একীনের পরিপন্থী। (অতএব, প্রমাণিত হল যে, 'দালায়েলে সামইয়্যাহ' [শ্রুত দলীল] একীনের ফায়দা দিতে পারে না।) এরপর ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ নিজেই তার জওয়াব দেন যে, কুরআন ও হাদীসে একীনের স্থানসমূহে ওই আলামতসমূহের উপর ভরসা থাকে, যা বক্তার ইচ্ছার উপর বাধ্যতামূলক দিকনির্দেশনা দান করে। (অর্থাৎ শ্রোতাদের ওই সমস্ত আলমতের ভিত্তিতে অনিচ্ছায়ই বক্তার ইচ্ছার একীন হয়ে যায় এবং কোনো সম্ভাবনা বাকি থাকে না।) এর পাশাপাশি একীনের স্থানসমূহে শব্দসমূহের অর্থ তাওয়াতুর (কোনো অর্থের জন্য কোনো শব্দ তাওয়াতুরের সাথে ব্যবহৃত হওয়া)ও একীনের জন্য ফায়দাদায়ক হয়। (আর তাওয়াতুর অকাট্য দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এ কথা বলা ভুল যে, 'দালায়েলে সামইয়্যাহ একীনের ফায়দাদায়ক হওয়া নিষিদ্ধ।)

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন–

ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর এই বর্ণনা ওই বিশ্লেষণকে সমর্থন করে, যা আমি 'আয়াতে মাশিয়্যত' এর অধীনে উল্লেখ করে এসেছি। আর যদি এমন না হয়, (অর্থাৎ দালায়েলে সামইয়্যাকে একীনের ফায়দাদায়ক নয় বলে মেনে নেওয়া হয়) তা হলে ইসলামের দুশমন এবং মুলহিদরা মুসলমানদের বহু আকায়েদে সামইয়্যাহতে বিভিন্ন ধরনের শক-সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং ঝামেলা সৃষ্টি করার পুরোপুরি সুযোগ পেয়ে যাবে। (এবং মুসলমানদেরকোনো আকীদাই নিরাপদ থাকবে না) বলেন, এ কথার সমর্থন কোনো কোনো মু'তাযিলার এ অভিমত থেকেও হয় যে, 'প্রত্যেক একীনী সেমায়ী দলীল জরুরি (অকাট্য) হয়'। মু'তাযিলাদের এই কথা খুবই বোধগম্য এবং প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু তার আলোচনার জায়গা এটা নয়।

শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য বিষয়ই 'জরুরি'

ওই جزء ثالث এর মাঝামাঝি বর্ণনা করেন–

দ্বিতীয় কারণ, আর এ কারণই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, মু'তাযিলাদের নিকট তাকফীর (অর্থাৎ কুফরকে আবশ্যককারী কোনো কথা কিংবা কাজের ভিত্তিতে কাউকে কাফের বলা) 'কতয়ী সেমায়ী'। (অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে বিষয়টি 'ছাহেবে শরীয়ত' তথা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রুত হওয়া জরুরি।) আর সহীহ হচ্ছে এই যে, শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য এবং সুনিশ্চিত বিষয় 'জরুরি'। (অর্থাৎ ওই সকল জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত, যা দীন হওয়ার বিষয়টি প্রতিটি সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই সুনিশ্চিতভাবে জানে।)

তাওয়াতুরে মা'নবী হুজ্জত

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ বিষয়ে বহু পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করার পর বলেন–

ষষ্ঠ দলীল এই যে, দালায়েলে সামইয়্যাহ (কুরআন-হাদীসের নুসূস) আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টিজীবকে হেদায়েত [পথপ্রাপ্ত] করে দেওয়ার কুদরতের উপর এমন বদীহীভাবে বা সুনিশ্চিতভাবে দালালত করে (যার কারণে প্রত্যেক সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির একীন হাসিল হয়ে যায়।) যে, তাতে কোনো তাবীল করা যায় না। আর তা দু'টি কারণে– এক কারণ তো হল তা-ই, যা ইতিপূর্বে [আলোচনায়] এসেছে যে, 'মাশিয়্যত' এবং এর মতো ওই সকল 'সিফাতে ইলাহিয়্যা'র আয়াতসমূহে তাবীল নিষিদ্ধ, যা নবী-যুগে এবং সাহাবা-যুগে সাধারণ ও বিশিষ্ট [সকল মানুষের] মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি ওই যামানা –যা হেদায়েতের যুগ ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বর্ণনা করার যুগ ছিল তা– অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওই সকল আয়াতে কোনো তাবীল করা হয়নি; আর না সেগুলোর বাহ্য অর্থের উপর বিশ্বাস রাখতে কোনো ধরনের নিষেধ করা হয়েছে। (এই সুরতহাল এ কথার দলীল যে, ওই সকল আয়াতে কোনো ধরনের তাবীল করা যায় না এবং সেগুলোর বাহ্যিক অর্থের উপর ই'তিকাদ রাখা ওয়াজিব।) কেননা, (যদি কোনো তাবীল হত এবং সেগুলোর বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস রাখা নিষেধ হত, তা হলে)

স্বভাবত এটা আবশ্যক ছিল (যে সেই হোদয়েতের যামানায়ই এ ব্যাপারে আলোচনা হত) যদিও যুক্তির নিরিখে জরুরি নয়। যেমনটা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক অকাট্য বিষয়ের জন্য 'জরুরি' (মুতাওয়াতির) হওয়া জরুরি কি না?

গ্রন্থকার রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এর চাইতেও বেশি যুক্তিযুক্ত কারণ হচ্ছে সেটি, যা মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ جزءِ اوّل এর শেষের দিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

মনে রেখো! একীন দুই দিক থেকে 'জরুরি' হয়।

১. সত্তাগতভাবে শরীয়তের নসের প্রামাণ্যতার বিচারে। (অর্থাৎ ওই আয়াত কিংবা হাদীস অর্থের দিক থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ছাহেবে শরীয়ত থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে।)

২. অর্থের স্পষ্টতার বিচারে। (অর্থাৎ ওই নসের অর্থ/মর্ম এতটাই স্পষ্ট হবে যে, অনিচ্ছাকৃতই তার অর্থের একীন হয়ে যাবে) প্রামাণ্যতা অকাট্য হওয়ার মাধ্যম তো একটাই, আর তা হচ্ছে 'বদীহী তাওয়াতুর'। (অর্থাৎ প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষ তার প্রামাণ্যতাকে তাওয়াতুরের মতো জানে) যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি রইল অর্থের স্পষ্টতার বিচারে... তো এটা কি কখনও সম্ভব যে, (কোনো বিষয়) 'অকাট্য' এবং 'সুনিশ্চিত' হবে, কিন্তু 'জরুরি' হবে না! (অর্থাৎ তার প্রামাণ্যতা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছেনি?) এটা একটা প্রশ্ন। যার উত্তর অধিকাংশ উসূলিয়্যিনের বর্ণনা থেকে এই বের হয় যে, এমনটা হওয়া জায়েয (যে, কোনো বিষয় 'কতয়ী' তথা অকাট্য হবে কিন্তু জরুরি (মুতাওয়াতির) হবে না।) কিন্তু কোনো কোনো উসূলবিদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এটা নিষিদ্ধ। (অর্থাৎ এমন হতে পারে না যে, [কোনো বিষয়] 'কতয়ী' তথা অকাট্য হবে কিন্তু 'জরুরি' হবে না। বরং প্রতিটি অকাট্য বিষয়ের জন্যই 'জরুরি' হওয়া জরুরি)

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন—

আমার মতেও (শেষ) অভিমত (যে, প্রত্যেক অকাট্য বিষয় 'জরুরি' হয়) অধিক শক্তিশালী। কেননা, কোনো নসের অর্থের উপর একীন হাসিল করার পদ্ধতি এটিই যে, আহলে লুগাতের পক্ষ থেকে তার 'একীনী সুবূত' তথা সুনিশ্চিত প্রামাণ্যতা বিদ্যমান হবে যে, তারা অমুক নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা অমুক নির্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য নেন; এ ছাড়া আর কোনো অর্থ উদ্দেশ্য নেন না। আর এটা স্পষ্ট যে, এই প্রামাণ্যতা 'নকলী' এবং 'সামঈ'; 'আকলী' এবং 'নযরী' নয়। আর যে বিষয়ের প্রামাণ্যতার ভিত্তি 'সিমা' ও 'নকল' এর উপর হবে, 'আকল' ও 'নযর' এর উপর হবে না, তাতে একীন ইসতিদলাল (আকলী)র কোনো দখল থাকে না। বরং সেটি মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত হয়। আর মুতাওয়াতির 'জরুরিউস সুবূত' হয়ে থাকে। (এ জন্য আহলে লুগাত থেকে উপরোল্লিখিত প্রামাণ্যতা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই আলোচনাধীন নস অর্থের স্পষ্টতার বিচারে 'একীনী' ও 'কতয়ী' হতে পারে। অতএব, প্রমাণিত হল যে, কোনো বিষয় 'কতয়ী' হওয়ার জন্য শব্দের দিক বিবেচনায় ছাহেবে শরীয়ত থেকে প্রামাণ্যতার মুতাওয়াতির হওয়া যেমনিভাবে জরুরি, তেমনিভাবে অর্থের বিচারে আহলে লুগাত থেকে প্রামাণ্যতাও মুতাওয়াতির হওয়া জরুরি।)

কোনো নস (আয়াত) অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির হওয়ার উদ্দেশ্য

মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলাইহ جُزْءِ ثَانِي এর শেষ দিকে বলেন—

আল্লাহ তাআলা 'ফায়েলে মুখতার' হওয়ার দলীল কুরআনে করীমের ওই সকল নুসূস (স্পষ্ট আয়াত) এর উপর মাওকুফ ও মাবনী সাব্যস্ত করা হবে, যেগুলোর অর্থ (প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তির) জানাকোনা ও প্রসিদ্ধ এবং সেগুলোতে কোনো ধরনের তাবীল না হওয়ার ব্যাপারে শাব্দিক আলামত বিদ্যমান থাকবে। বরং সেগুলো জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং সে ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমাও প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের জানাকোনা ও প্রসিদ্ধ থাকবে। আর ওই একীন ও নিশ্চয়তা প্রদানকারী আলামতসমূহের মধ্য থেকে একটি আলামত উম্মতে মুসলিমার ওই নুসূস

(আয়াতসমূহকে)কে সেগুলোর বহ্যিক অর্থের ফাসাদের উপর সতর্ক করা ব্যতীত তেলাওয়াত করতে থাকবে। (অর্থাৎ যদি ওই নুসূসের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য না হত, তা হলে খাইরুল কুরূনে কোনো না কোনো মনীষী থেকে তো এ ব্যাপারে সতর্ক করা হত।)

'জরুরতে শরইয়্যাহ' এর উদাহরণ

বলেন–

ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'মাহসূল'-এ এই প্রশ্নকে অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুবিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তার জওয়াব দিয়েছেন। যার সারাংশ হচ্ছে এই যে, (নুসূসে শরইয়্যাহ'র) অর্থ ও মাকসাদসমূহের ইলম আলামতসমূহের সাথে মিলিত হয়ে জরুরি (বদীহী) ও একীনী হয়ে যায়। কেননা, উদাহরণস্বরূপ, আমরা السموات والارض শব্দ থেকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য একীনী এবং বদীহীভাবে জানি (যে, [এর দ্বারা] এই আসমান ও জমিনই উদ্দেশ্য, যা আমাদের সামনে আছে) এ জন্য নয় যে, আরবী ভাষায় [উদাহরণস্বরূপ] سماء শব্দটিকে আসমানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, ওই (শাব্দিক) অর্থে তো 'ইশতিরাক' 'মাজায' 'হযফ' এবং 'ইযমার' ইত্যাদির দখলও থাকতে পারে। (এ জন্য ওই সকল সম্ভবনার ভিত্তিতে তো سماء শব্দ দ্বারা আসমান উদ্দেশ্য হওয়া 'কতয়ী' ও 'একীনী' থাকে না। বরং হতে পারে যে, 'হাকীকী' অর্থের পরিবর্তে 'মাজাযী' অর্থ উদাহরণস্বরূপ 'মেঘ' উদ্দেশ্য হবে। মোটকথা, সম্ভাবনা একীনের পরিপন্থী। এর বিপরীতে 'জরুরতে শরইয়্যা'র অধীনে আমাদের কতয়ী একীন আছে যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এই আসমান এবং জমিনই।)

কোনো অকাট্য নস একীনের ফায়দাদানকারী হওয়ার ভিত্তি

ওই কিতাবেরই جزء آخر এর মাঝামাঝিতে বলেন–

ওই ব্যক্তির জন্য এটি দিবালোকের চেয়ে স্পষ্ট, যে একীনের শর্তসমূহ জানে। আর উমূরে সামইয়্যার ওই সকল শর্তসমূহ ('সিমা' ও 'নকল' এর সংশ্লিষ্ট বিষয়)-এ (ছাহেবে শরীয়ত থেকে) 'নকল' এর বিচারে বদীহী তাওয়াতুর আছে এবং অর্থের বিবেচনায় বদীহীভাবে স্পষ্ট হওয়া বিদ্যমান। (অর্থাৎ যে নসের

প্রামাণ্যতা নবী আলাইহিস সালাম থেকে তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছে গেছে এবং তার অর্থ ও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতাও বদীহী-এর পর্যায়ে পৌছে গেছে, ওই অকাট্য নস অবশ্যই একীনের ফায়দাদানকারী হবে।)

এ ধরনের কতয়ী নসে তাবীল হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল

তারপর বলেন–

বাকি এই বিষয়ের একীন যে, তার তাবীল করা হারাম; বরং এই বিষয়ের একীন যে, এটি নিজের বাহ্যিক অর্থের উপর আছে– এর দলীল এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুএর যামানায় তার প্রসিদ্ধি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। আর আমরা জানি যে, তাঁরা ওই নসকে তার যাহেরী অর্থের উপরই অটল রেখেছেন (এবং কোনো তাবীল করেননি) এবং স্বভাবত এটা অসম্ভব যে, ওই নসের কোনো সঠিক তাবীল থাকবে আর তাঁদের মধ্য থেকে কেউ-ই সেটা আলোচনা করবেন না। যেমন ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে।

আর جزء ثالث এর মাঝামাঝিতে ايمان بالقدر [তাকদীরের উপর ঈমান আনা]র নসূস (আয়াতসমূহ) এর অধীনে বলেন–

যে ব্যক্তি পূর্বসূরি (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন) এর অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তার জন্য ইলমে জরুরি (কতয়ী ও একীনী) এর দাবির দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে এই যে, তাঁরা ওই সকল নুসূসে (আয়াতসমূহে) মতলক কোনো তাবীল করতেন না।

প্রত্যেক অকাট্য বিষয় একীনের ফায়দাদানকারী হওয়ার জন্য সেটি 'জরুরি' (মুতাওয়াতির) হওয়া জরুরি

جزء أول এর প্রথম দিকে বলেন–

এ সকল অকাট্য বিষয়সমূহ ছাড়াও এমন কিছু বিষয়ও আছে, যেগুলোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে যে, ওগুলো কতয়ী (একীনী) কি না? উদাহরণস্বরূপ, 'কিয়াসে জলী' [প্রকাশ্য কিয়াস] এবং তার (বিরোধিতার) উপর ভিত্তি করে কাউকে গুনাহগার ফাসেক কিংবা কাফের বলা (জায়েয আছে কি না? এই ইখতিলাফই এই কথার দলীল যে, প্রত্যেক কতয়ী বিষয়ের

জন্য একীনের ফায়দাদানকারী হওয়া জরুরি না।) যেমন, ইবনে হাজেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ প্রমুখ মুহাক্কিকীন এমন শরয়ী অকাট্য বিষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, যা 'জরুরি' (মুতাওয়াতির) হবে না। আর তাঁদের ফায়সালা হচ্ছে, নসূসে শরইয়্যায় অর্থ বোঝার বিচারে 'যন' ও 'জরুরত' এর মাঝে কোনো স্তর নেই। (অর্থাৎ নসূস হয়তো যন্নী হবে নয়তো জরুরি (মুতাওয়াতির) হবে; তৃতীয় প্রকার বলতে কিছু নেই।) যেমন, লফযের বিচারে তাওয়াতুর (সকলের নিকট) 'যন্নী' (খবরে ওয়াহেদ) এবং 'জরুরি' (খবরে মাশহুর ও মুতাওয়াতির) এর মাঝে কোনো স্তর নেই। (অর্থাৎ যেমনিভাবে রেওয়ায়েতের বিবেচনায় অর্থাৎ 'সুবূতে আলাফায' তথা শব্দ/বর্ণনা শুধু দুই স্তরের– 'যন্নী' (খবরে ওয়াহেদ) এবং 'জরুরি' (খবরে মাশহুর ও মুতাওয়াতির) তেমনিভাবে 'দিরায়েত' তথা অর্থা বোঝার বিবেচনায়ও দুই স্তর– 'যন্নী' অথবা 'জরুরি'। অতএব, প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক অকাট্য বিষয় অকাট্যতা ও একীনের ফায়দাদানকারী হওয়ার জন্য 'জরুরি' (মুতাওয়াতির) হওয়া আবশ্যক।

আরও এক স্থানে বলেন–

উসূলবিদ উলামায়ে কেরামের বাণী থেকে স্পষ্ট যে, ওই সকল কতয়ী বিষয় (একীনী বিষয়সমূহ) এর অস্তিত্ব কেবলমাত্র ওই সকল দলীল-প্রমাণে মানে, যা ইলমী এবং একীনের ফায়দাদানকারী হবে।

শরয়ী দলীল-প্রমাণে 'কতয়ী' এবং 'জরুরি'
একটি অপরটিকে আবশ্যক করে

ওই কিতাবেরই শেষ দিকে বলেন–

অধিকাংশ মুহাক্কিকীনের অভিমত এই-ই যে, কতয়ী তথা অকাট্য দলীল-প্রমাণ যখন শরয়ী হবে, তখন নিঃসন্দেহে তা জরুরী বা স্বতসিদ্ধ হবে। (অর্থাৎ শরীয়তের সমস্ত কাতয়ী দলীল জরুরী হয়ে থাকে। শরয়ী দলীলসমূহে এমন কোন কাতয়ী দলীল পাওয়া যায় না, যেটি জরুরী নয়। এক কথায় দালায়েলে শারইয়্যার ক্ষেত্রে কাতয়ী ও জরুরী একটি অপরটির জন্য অত্যাবশ্যাকীয় বিষয়।)

অধিক দলীল ও নিদর্শনের উপকারিতা

অধিক পরিমাণ দলীল থাকলে এবং সূত্র ও নিদর্শন একাধিক হলে, সবগুলো মিলে "বিষয়টি নিশ্চিত ও সুদৃঢ়" হওয়া বুঝায়।

হযরত লেখক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইতহাফ নামক কিতাবের ১৩/৩ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে বায়াযী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহ হযরত মাতুরিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কথা বর্ণনা করেন যে, নকলী দলীল তখনই একীন বা নিশ্চিতের ফায়দা দেয়, যখন একই অর্থে একাধিক সূত্রে অনেকগুলো দলীল বর্ণিত হয়। সেই সাথে করীনা (নিদর্শন)ও বিদ্যমান থাকে। "আল-ইবকার ওয়াল মাকাসিদ" কিতাবের লেখক এবং মুহাক্কিক আলেমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য মত এটিই। বিস্তারিতভাবে গবেষণার জন্য "তাওযীহে তালবীহ" অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

স্বয়ং হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহও বলেন–

হযরত ইবনে হাজেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মতে জরুরী (ضروری) শব্দের অর্থ

হযরত ইবনে হাজেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর মতে জরুরী শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক এমন বিষয়, মন যেটাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয় এবং পুরোপুরি বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন হয়। তবে জরুরী শব্দের যেই পরিচিত অর্থ "জরুরিয়াতে দীন"এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ইবনে হাজেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিকট সে অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা সে সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "জরুরী" হচ্ছে এমন বিষয় যে সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ সকলেই সমানভাবে জ্ঞান রাখে।

"জরুরী" দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, লফযী দলীল একীনের ফায়দা দেয় না। কেননা এটি তো হচ্ছে আরেকটি বিরোধপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, তৃতীয় মত যেটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ ইমাম ও আলেমদের মত, সেটি হচ্ছে এই যে, এই হুকুমের মধ্যে ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এটি একীনী তথা নিশ্চিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাবীল কুফর থেকে বাঁচায় না।

কুফরের মূল কেন্দ্র

কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করাই হচ্ছে কুফর। চাই তা স্পষ্ট ভাষায় হোক, অথবা এমন কোন উক্তি বা আকীদা হোক, যার কারণে একীনী ও বদহীভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা লাযেম হয়ে যায়। তবে যদি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা নযরী ও এস্তেদলালীভাবে লাযেম আসে, তাহলে তা ধর্তব্য হবে না।

তাবীল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) গৃহীত হওয়ার মূলভিত্তি ও মূলনীতি

প্রত্যেক এমন বিষয় যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রকাশিত ছিল, অথচ কেউ তাতে কোন তাবীল বা ব্যাখ্যা করেননি, এমন বিষয়ের নিশ্চিত ও স্বতসিদ্ধ দাবি হচ্ছে এই বিষয়টি নিজস্ব জাহেরী অর্থেই ধর্তব্য হবে। (তাতে কোন তাবীল করা যাবে না।)

আমি যেই মূলনীতি বর্ণনা করলাম এটি ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যমানায় যেসব বিষয় এই পরিমাণ পরিচয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তার প্রসিদ্ধি তাওয়াতুর এর পর্যায় পৌঁছে গেছে এবং তার কোন ব্যাখ্যা অকাট্যভাবে উল্লেখ নেই, (সেগুলো তার বাহ্যিক অর্থের উপরই বহাল থাকবে; তাতে কোন তাবীল বা ব্যাখ্যা শোনা হবে না এবং এর অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে, যদিও সে অপব্যাখ্যাকারী হয়।)

দৃষ্টান্ত স্বরূপ

সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনরূপ তাবীল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই "কালাম" আল্লাহ্ তাআলার সিফাত। আর এজন্যই তিনি মুতাকাল্লিম। বিধায় যারা বলে "কালাম" আল্লাহ্ তাআলার সিফত নয়, অথবা কুরআন শরীফ আল্লাহ তাআলার কালাম নয়, উলামায়ে কিরাম তাদেরকে প্রকাশ্যে কাফের আখ্যায়িত করেন। এই আখ্যায়িত করাটা হয়তো এই ভিত্তিতে যে, তাদের এ কথা সে সব আয়াত অস্বীকার করে, যেগুলো দ্বারা "কালাম" আল্লাহ্ তাআলার সিফত হওয়া প্রমাণিত হয়। অথবা এই ভিত্তিতে আখ্যায়িত করা হয় যে, তাদের এ কথা দ্বারা সেসব আয়াতের

অস্বীকার আবশ্যক হয়ে পড়ে। (অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে এ সব আয়াত অস্বীকার করেছে বা তাদের কথা দ্বারা আবশ্যিকরূপে অস্বীকার করা হয়ে যাচ্ছে।) আর এই উভয়টিই কুফর সাব্যস্তকারী।

সতর্কতা !

তিনি আরো বলেন, যে সব লোক কুরআনকে "কাদীম" (অনাদী, অবিনশ্বর) মানে না, তারাও তাকে "হাদেস" (নশ্বর) বলা থেকে বেঁচে থাকে। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বর্ণনা অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম। "নুবালা"তে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর জীবনীতে তাঁর এক রেওয়ায়াত উল্লেখ করে থাকেন। এমনিভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পূর্ববর্তী সকল উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাঁরা [নাযিল হওয়া এই] কুরআনকে "কাদীম"ও মানতেন না, আবার "হাদেস"ও বলতেন না। (বরং স্থগীত থাকতেন।) আর এ মতটিই "নুবালা"র লেখক নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।

কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে শীয়া ও মুতাযিলাদের অভিমত

কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুতাযিলা, শীয়াসহ আরো কিছু দলের আকীদা মতে কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে তার কুফরের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া শর্ত। যে ব্যক্তি কুফরের হুকুম নিশ্চিতভাবে চায়, তার জন্য উচিত তাকেও এমন হওয়া উচিত যে, কারো কাফের হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কাফের না বলে।

যাহোক, এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হবে, কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অকাট্যতার এই স্তর থেকে নিচে নেমে ধারণার ঐ স্তর কেন অবলম্বন করবেন না, যে স্তরে প্রবল ধারণা পাওয়া যায়? (অর্থাৎ কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে একীন তথা নিশ্চিতের স্থানে প্রবল ধারণাকে কেন যথেষ্ট মনে করছেন না?) আর বিপরীতে নিশ্চিত ও অকাট্য দলীল থাকলেই কেবল প্রবল ধারণার উপর আমল করা নিষিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ যদি যন্নেগালেবের মোকাবেলায় কোন কাতয়ী দলীল বিদ্যমান থাকে কেবল তখনই যন্নেগালেব অনুযায়ী আমল করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর যদি প্রবল ধারণার বিপরীতে কোন অকাট্য দলীল না থাকে, তাহলে প্রবল ধারণার অনুযায়ী কেন আমল করা যাবে না?)

প্রজ্ঞাময় কুরআনের কোথায়ও এ কথা বলা হয়নি যে, সম্পূর্ণ কুরআনই মুতাশাবিহ (বা অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ)। বরং তার বিপরীতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে "কুরআনের কিছু আয়াত মুহকাম বা স্পষ্ট আর এগুলোই কিতাবের মূল। (এগুলোর উপরই দীন ও ঈমানের ভিত্তি।) আর কিছু আয়াত হচ্ছে মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট।

মুহকাম ও সুস্পষ্ট আয়াতগুলোতে যে অগণিত তাবীল বা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তাতে কুরআনের এমন মুহকাম আয়াত আর কোথায় পাওয়া যাবে, যেগুলোকে মুতাশাবিহ আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বুঝার জন্য এবং মতলব ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য মূলভিত্তি ও উৎস বানানো হবে ? সুস্থবিবেক এটা বিশ্বাস করবে না এবং সম্ভবও মনে করবে না যে, কিতাবুল্লাহর মুতাশাবিহ আয়াতের মতলব ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় এমন সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সঠিক বয়ান থেকে আসমানী কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহ খালি থাকবে। (অর্থাৎ যুক্তির নিরিখে এটি অসম্ভব যে, আসমানী কিতাবে এমন সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত সঠিক বিবরণ থাকবে না, যেটা দিয়ে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব। বিধায় কুরআন শরীফে এমন সুস্পষ্ট আয়াত অবশ্যই থাকতে হবে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না বরং সেগুলো নিজ নিজ বাহ্যিক অর্থেই থাকবে।) কুরআনে করীমের নিম্নে লেখিত আয়াতটি এমন (সুস্পষ্ট আয়াত না থাকা) অসম্ভব হওয়ার প্রতি ইশারা বহন করে।

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

মূর্তীপূজার দাবির ব্যাপারে যদি তোমরা সত্যবাদি হয়ে থাক, তাহলে এটির পূর্বের কোন আসমানী কিতাব অথবা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে এমন কোন দলীল আমর নিকট নিয়ে এসো।[৭৮]

সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও জ্ঞানীজনদের মধ্য হতে যারা গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেন, তাদের জন্য অপব্যাখ্যাকারী ভ্রান্ত দলগুলোর খণ্ডনের ক্ষেত্রে এই আয়াত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল। যদি এ সব আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য সেটাই হতো যেটা অপব্যাখ্যাকারীরা বলে থাকে তাহলে তো কম পক্ষে

---

[৭৮]. সূরা, কাহাফ: ৪

দু'একবার আসমানী কিতাবের কোথাও না কোথাও এর সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকত। যাতে করে মুতাশাবিহ্ আয়াতের উদ্দেশ্য তার দ্বারা নির্ধারণ করা যেত, যেমনটি কুরআনের ওয়াদা।

কাফের আখ্যায়িত করার মূলনীতি

তৃতীয় খণ্ডের মাঝামাঝিতে "তাকদীরের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব" বিষয়ে বাহাত্তর নং হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, "আমি বলব, কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন এমন বিষয় প্রত্যাখ্যান করে যেটি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বদহী স্বতসিদ্ধভাবে জানা গেছে সে ব্যক্তি কাফের।"

এই বর্ণনার মধ্যে কিছুটা সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। এর সুস্পষ্ট ও সুবিস্তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে জানতে পারব যে, সে জরুরিয়তে দীনের কোন বদহী ও একীনী বিষয় প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করেছে এবং এটাও নিশ্চিতভাবে জানতে পারব যে, এ লোকটিও আমাদের মত বদহী ও একীনীভাবে জানে যে এটি জরুরিয়াতের দীনের অর্ন্তভুক্ত। (এরকম জানা-বোঝা সত্ত্বেও সে অস্বীকার করেছে।) তাহলে এরূপ ব্যক্তি কোন রকম সংশয়-সন্দেহ ছাড়াই কাফের। (এটি হচ্ছে কুফরে জুহুদ ও কুফরে ইনাদ।)

মোদ্দাকথা হচ্ছে, তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। এক. অস্বীকারকৃত বিষয়টি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

দুই. অস্বীকারকৃত বিষয়টি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি তার জানা থাকা।

তিন. ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জানা থাকা।

আর যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের প্রবল ধারণা হবে যে, যে সব বিষয় আমরা নিশ্চিতভাবে জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত জানি, সে সম্পর্কে এই ব্যক্তি অজ্ঞ, এমন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে বহু মতভেদ রয়েছে। যে সব লোক অজ্ঞতা ও না জানাকে উযর বলে গণ্য করে এবং শুধু জুহূদ ও ইনাদের ভিত্তিতে কাফের আখ্যায়িত করে, তারা এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেন না। আর যারা কুফরে ইনাদ এবং কুফরে জেহেলকে এক সমান মনে করে, তারা এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেন। (উল্লেখিত মুসান্নিফ বলেন,)

উত্তম হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত না করা। তিনি বলেন, মাসআলায়ে সিফাতের শেষে এব্যাপারে গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর অভিমত

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই পুস্তকে বলেন, যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে, অথচ তাকে বলে দেওয়া হয়েছে, (এটি জরুরিয়াতের দীনের অন্তর্ভুক্ত,) তাহলে সে ব্যক্তি কাফের বলে গণ্য হবে। যেমন হযরত ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ সহীহ বোখারীতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

যদি ব্যক্তকারীদের সংখ্যা তাওয়াতুরের পর্যায়ে নাও পৌছে, তবুও মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর নিকট শুধু ঐ বিষয়টি জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইলম তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছাই যথেষ্ট। ভিন্ন শব্দে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত ইলম থাকার পরিবর্তে শুধু একটি বিষয়ের ইলম সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হওয়া যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, তাওয়াতুরের পর্যায় পৌছেনি এমন বিষয় অস্বীকার করা কুফরী হবে না। তবে কাফেরদের সাথে যেমন আচরণ করা হয়, ঐ অস্বীকারকারী বা প্রত্যাখ্যানকারীর সাথেও সেরূপ আচরণ করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যমানায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এই নীতিই মানা হত।

যদি অস্বীকারকারী লোকটি এই বাহানা করে যে, খবরে ওয়াহেদ হওয়ার কারণে এ বিষয়ে আমার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং তার এই উযর সঠিক কি না তা যাচাই করে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় যেমনিভাবে কুফরের প্রকারভেদ তথা কোনটি কুফরে জেহেল আর কোনটি কুফরে ইনাদ এবং কার কুফর কুফরে জেহেল আর কার কুফর কুফরে ইনাদ, সব আখেরাতের হাওলা এবং আল্লাহর কাছে অর্পণ করা হবে। (কিন্তু দুনিয়ার বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়টির হুকুম একই হবে অর্থাৎ উভয়েই কাফের।) ঠিক তেমনিভাবে এই অস্বীকারকারীর ব্যাপারটিও আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে ন্যাস্ত করা হবে। (তবে পার্থিব হুকুম অনুসারে তাকে

কাফের বলা হবে।) যেমন, ঐ ব্যক্তি যে কুফরের পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছে এবং তার ভালমন্দ বোঝার শক্তি হয়েছে, এর ব্যাপারে আমরা কাফের হওয়ার হুকুম দিয়ে থাকি। যদিও তার কুফরের ভিত্তি না জানার উপর, জেদ ও বৈরিতার উপর নয়। এমনিভাবে উল্লিখিত সুরতেও আমরা তাকে কাফের বলব (এবং না জানাকে উযর হিসেবে মেনে নেব না।) তিনি বলেন, এই গবেষণা ও পার্থক্য ভাল করে বুঝে নিবে এবং স্মরণ রাখবে। কেননা যে ব্যক্তি শরীয়তের মুতাওয়াতির কোন বিষয়ই গ্রহণ করেনি, সে আমাদের দৃষ্টিতে এবং আমাদের বেলায় কাফের। একেবারে ঐ ব্যক্তির মত, যে এখনও ইসলামে দিক্ষিত হয়নি। যদিও বৈরিতাবশত না হোক তবুও আমাদের নিকট সে কাফের। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর এই ব্যক্তির অবস্থা ঠিক এমনই যেমন, কাউকে কোন নবী ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি; নিজের পূর্ববর্তী কুফরীর উপরই অবিচল রয়েছে। তো এমন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ না করাটা যদি বৈরিতাবশত নাও হয়, তবুও সে কাফের। বিধায় কুফরের মূলভিত্তি এই বিষয়ের উপর যে, শরীয়তের মুতাওয়াতির বিষয়াদির মধ্য হতে কোন একটির উপর ঈমান না আনা এবং তা মেনে নেওয়া থেকে দূরে থাকা। চাই না জানার কারণে হোক বা অস্বীকার করার কারণে হোক অথবা বৈরীতার কারণে হোক।

নবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা যুক্তির নিরিখে মন্দ ও কুফর সাব্যস্তকারী

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইতহাফ কিতাবের লেখক ১২/২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, নবীর আগমন, দাওয়াত ও তাবলীগ অস্বীকার ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা যুক্তির নিরিখেও মন্দ ও কুশ্রী। বিধায় এই কুফর যৌক্তিক মন্দের অন্তর্ভুক্ত। এটি কোন শরীয়তগত মন্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। (অর্থাৎ কোন নবীর আগমন, দাওয়াত ও তাবলীগ অস্বীকার করা যুক্তিগত দিক থেকেই দোষণীয় ও কুফর সাব্যস্তকারী। এই দোষ ও কুফর প্রমাণের জন্য শরীয়তের দলীলের প্রয়োজন হয় না।) [যদিও বহু দলীল আছে।]

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এটি অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী তাহকীক বা গবেষণা।

মোসায়িরা কিতাবের ৪৭/৪ পৃষ্ঠায়ও যৌক্তিক ভাল ও মন্দের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ গবেষণা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, যদি নবীগণ

(আলাইহিমুস সালাম) কে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস করা যৌক্তিক ভাল-মন্দের মধ্যে গণ্য করা না হয়ে, তাহলে তো নবীগণ (আলাইহিস সালাম) কে নিরুত্তর করে দেওয়ার সম্ভবতা এলযাম (চাপ) ফিরে আসে। আর এটিই মাতুরীদিয়া ও অধিকাংশ আশআরিয়্যার মত।

তাবীল ও মাজায (রূপক) অর্থ গ্রহণের মূলনীতি

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ বাদায়িউল ফাওয়ায়েদ কিতাবে বলেন, কুরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নস বা ভাষ্যের মধ্যে নিঃশর্তভাবে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া ও ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। রূপক অর্থ ও ব্যাখ্যার দখল কেবল ঐ সব বাহ্যিক নসের মধ্যে রয়েছে, যেগুলো রূপক অর্থ ও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও অবকাশ রাখে।

তিনি আরো বলেন, এ ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আবশ্যিকরূপে বুঝে নেওয়া দরকার যে, কোন শব্দ বা কথা "নস" হওয়া প্রমাণিত হয় দুটি বস্তুর মাধ্যমে। এক. শব্দটি তার আভিধানিক অর্থ ছাড়া অভিধানের দিক থেকে অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ, عشرة শব্দটি দশ বুঝানোর জন্য বানানো হয়েছে; না এর চেয়ে কম বুঝানোর জন্য আর না বেশী বুঝানোর জন্য।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এই শব্দটির যতগুলো প্রয়োগক্ষেত্র আছে, সবগুলোর মধ্যে একই পন্থায় একই অর্থে ব্যবহার হতে হবে। এমন শব্দ নিজ পরিচিত অর্থের ক্ষেত্রে নস। এ জাতীয় শব্দের মধ্যে না কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে, আর কোন বিবেচনার সুযোগ আছে। যদি কোন বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্রে এই অবকাশ থাকেও, (তবুও সমস্ত প্রয়োগক্ষেত্রের বিবেচনায় একই অর্থ নির্ধারিত হবে। তো এই বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্রে অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্যাখ্যা করা বা রূপক অর্থ করা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ঐ অর্থই উদ্দেশ্য নিতে হবে যে অর্থটি অন্যান্য সকল প্রয়োগক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।) এমন শব্দ নিজেস্ব প্রসিদ্ধ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে খবরে মুতাওয়াতির এর মত হয়ে যায়। যদি খবরে মুতাওয়াতিরের মধ্যে রেওয়ায়াতের প্রতিটি সনদ পৃথকভাবে দেখা হয়, তাহলে সেটিও মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সবগুলো সনদ যদি সমষ্টিগতভাবে দেখা হয়, তাহলে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এটি একটি অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রদ সূক্ষ্মতা। এটি ঐ সকল জাহেরী আয়াত ও

হাদীসের কৃত তাবীল বা ব্যাখ্যা বাতিল ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের কাজে আসবে, যেগুলো সকল প্রয়োগক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার হয়। এরকম সুরতে যে কোন ব্যাখ্যাই অকাট্যরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত। কেননা, ব্যাখ্যা তো কেবল এমন জাহেরী শব্দের ক্ষেত্রে করা হয় যেটি অন্যান্য সকল আয়াত ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরলরূপে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের শব্দে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। যাতে করে অন্যান্য সকল আয়াত ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। মতভেদ ও বৈপরীত্য দূর হয়ে যায়। তবে যখন একই শব্দ সকল প্রয়োগক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার হচ্ছে এবং কোন সংঘর্ষ ও বৈপরীত্যও নেই তখন তো এই শব্দটি নিজেস্ব জাহেরী অর্থের ক্ষেত্রে অকাট্য নস। বরং এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যা করা অকাট্যরূপে নিষিদ্ধ। এই মূলনীতি ভাল করে বুঝে নাও।

বাদায়িউল ফাওয়ায়েদ কিতাবের ৫/১ পৃষ্ঠায় اَلْفَرْقُ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَ الشَّهَادَةِ এর অধীনে এ বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে-

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আলোচনার মধ্যে توفى শব্দ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

আলোচিত মূলনীতি অনুসারে توفى শব্দের অর্থ হওয়া উচিত, পুরোপুরিভাবে নিয়ে নেওয়া। এখানে "মৃত্যু দেওয়া" অর্থ হবে না। কেননা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে কুরআন হাদীসে যতগুলো আয়াত ও হাদীস এসেছে সবগুলোই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জীবত থাকার ব্যাপারে একমত ও প্রসিদ্ধ। এমনিভাবে একটি অপরটির সমর্থকও বটে। (বিধায় উল্লিখিত আয়াতে 'মৃত্যু দেওয়া' অর্থ নেওয়া যাবে না।)

হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত

জামিউল ফুসুলাইন কিতাবে লেখা হয়েছে, একবার হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মারার জন্য হাত উঠাল। তখন অপর ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি আল্লাহ

তাআলাকে ভয় করো না? উত্তরে প্রহারকারী বলল, না। এখন এই প্রহারকারী লোকটি তার এই কথার কারণে কাফের হয়ে যাবে, কি না? হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহ বললেন, না, তাকে কাফের বলা হবে না। কেননা, এটা সম্ভব যে, ঐ লোকটি বলবে, আমার তো উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলার ভয় ও তাকওয়া তো এটির মধ্যে রয়েছে যা আমি করছি। (অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার তাকাযা এটাই ছিল যে, আমি তাকে প্রহার করি।)

আর যদি কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় (উদাহরণ স্বরূপ কোন হারাম কাজ বা মদ পান করার সময়) বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? উত্তরে লোকটি বলে, না। তাহলে এই ব্যক্তিকে কাফের বলা হবে। কেননা, এই সুরতে সেই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় (যে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল প্রথম সুরতে। কারণ, কাউকে প্রহার করা ও পিটানো তাকওয়ার তাকাযা হতে পারে। কিন্তু কোন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হওয়া কোন সুরতেই তাকওয়ার তাকাযা হতে পারে না।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ফাতাওয়ায়ে খানিয়াতেও শাদ্দাদ বিন হাকীম এবং তার স্ত্রীর ঘটনার মধ্যে এটিই বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, তবকাতে হানাফিয়্যাতে স্বয়ং শাদ্দাদ বিন হাকীম হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে এই রেওয়ায়াতই বর্ণনা করেছেন। আর 'তবকাত' এর বর্ণনা জামিউল ফুসুলাইন এর বর্ণনা থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য। তো সেখানে বলা হয়েছে শুধু ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকাই ধর্তব্য; বক্তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের উপর এর ভিত্তি নয়। কেননা, তাতে তো কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অথচ হানাফী শাইখগণ বলেন, যদি কাউকে কুফরি কথা বলতে বাধ্য করা হয়, আর তার নলেজে তাওরিয়ার[৭৯] এমন কোন সুরত থাকে, যেটা অবলম্বন করে সে মূল কুফরী থেকে বেঁচে থাকতে পারত। এতদ্বসত্ত্বেও সে তাওরিয়া অবলম্বন না করে কুফরী কথা বলে দেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। (কেননা, সে জেনেবুঝে কুফরী কথা বলেছে অথচ সে ইচ্ছা করলে

---

[৭৯]. তাওরিয়া বলা হয়, কোন শব্দ বা কথা বলে তার প্রসিদ্ধ ও নিকটবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে দূরবর্তী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া। অনুবাদক

তাওরিয়া করে কুফরী থেকে বেঁচে থাকতে পারত। এটি রিযা বিলকুফরি তথা কুফরীর উপর সন্তুষ্টি" হয়ে গেছে।

উক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এই মাশায়েখগণ (কাফের আখ্যায়িত করণ পরিহার করার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকাকে যথেষ্ট মনে করেন না। বরং) এ জাতীয় নিরূপায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কোনরূপ তাবীল বা ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নেওয়াকে প্রতিক্রিয়াকারী মানেন। যদি এমনটি না হয় তাহলে কৌশল অবলম্বন ও বাহানা তালাশ করা থেকে কেউই অক্ষম নয়।

(সারকথা হচ্ছে, একরাহ তথা জোর-যবরদস্তি ও বাধ্য করার মাসআলায় মাশায়েখগণ শুধু তাওরিয়ার সম্ভাবনার উপর কাফের আখ্যায়িতকরণ পরিহার করার ভিত্তি রাখেননি। বরং বক্তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যেও ধর্তব্য মনে করেন। যদি নিরূপায় লোকটি তাওরিয়া করে তাহলে কুফরী থেকে বেঁচে যাবে, অন্যথায় নয়। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য করে, তাহলে সে কুফর থেকে বেঁচে যাবে অন্যথায় নয়। অতএব বুঝাগেল শুধু ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকা যথেষ্ট নয়। যেমন জামিউল ফুসুলীন কিতাব থেকে বুঝে আসে যে, ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট। বরং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য থাকাও আবশ্যক। যেমনটি তবকাতে হানাফিয়্যা থেকে বুঝে আসে।)

তাই তো মীযানুল ই'তিদাল কিতাবের ২৭২/১ পৃষ্ঠায় হাকাম বিন নাফে' এর পরিচিতিমূলক আলোচনার অধীনে শক্তিশালী সূত্রে এ কথা বর্ণিত আছে যে,

> "আল্লাহর কসম! মুমিনও কুরআন পাকের আয়াত দিয়ে দলীল প্রদান করেন। তবে পরাজিত হয়ে যান। আর মুনাফিকও কুরআন পাকের আয়াত দিয়ে দলীল দেয় এবং বিজয়ও লাভ করে।" (কেননা, মুনাফিক ধোকাবাজ ও কুটকৌশলী। তাই সে আয়াতের অর্থের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে মনগড়া অর্থ করে এবং ভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে জিতে যায়। পক্ষান্তরে মুমিন দীনদার ও সঠিক মত অবলম্বী। তাই মুমিন কুরআনে করীমের আয়াতের অর্থের মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ও অপব্যাখ্যা করেন না। ফলে তার ধোকাবাজ প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যান।)

আল্লামা খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে শিফা কিতাবের ৪২৬/৪ পৃষ্ঠায় লেখেছেন-

"আর এ কারণেই (অর্থাৎ কুফরের ভিত্তি বাহ্যিক অবস্থার উপর; নিয়ত ও উদ্দেশের উপর নয়) হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি নিজ ধারণা অনুসারে নিজের মুখ কন্ট্রোল করতে পারেনি; মুখে যা এসেছে বলে ফেলেছে। ফলে গালি ও কটুকথা বলার উদ্দেশ্য ছাড়াই তার মুখ দিয়ে গালি ও কটুকথা বের হয়ে গেছে।

এ কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, মুসান্নিফ (তথা হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী) রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর বয়ান আমাদের মাযহাবের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা, কুফরির হুকুম লাগানোর ভিত্তি হচ্ছে বাহ্যিক কথা ও কর্মের উপর; না নিয়ত ও উদ্দেশ্যের উপর, আর না অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের আলামতের উপর। তবে হ্যাঁ, 'না জানা'র দাবিদার যদি নবমুসলিম হয়, অথবা আলেম-উলামাদের সংশ্রব থেকে বঞ্চিত বা দূরে থাকার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি না জানার দাবি করে, তার কথা ধর্তব্য হবে এবং তার অজুহাত গ্রহণ করা হবে। (তাকে কাফের বলা হবে না।) রওজা কিতাবের আলোচনা থেকেও এমনটি জানা যায়।

'তাবীল' বা ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থার দখল

হযরত ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শরহে মুসলিম এর ৩৯ পৃষ্ঠায় ইমাম খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেন–

"যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, (হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর যমানায়) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আপনারা কিভাবে নিজেদের বয়ান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলেন? তাদেরকে (কাফের-মুরতাদ বলার পরিবর্তে) রাষ্ট্রদ্রোহী কিভাবে বললেন? আমাদের যুগেও যদি মুসলমানদের থেকে কোন দল যাকাত দেওয়ার আবশ্যকিয়তা অস্বীকার করে (এবং যাকাত প্রদান না করে) তাহলে তাদেরকেও কি আপনারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলবেন? (কাফের-মুরতাদ বলবেন না?) (যদি এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়) তাহলে এর জবাব হচ্ছে এই যে, এ যুগে কোন ব্যক্তি বা দল যাকাত প্রদান করা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে উম্মতের সকলের ঐকমত্যে সে ব্যক্তি বা দল কাফের। তাদের মাঝে আর এই যমানার লোকদের মাঝে পার্থক্য হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সে সময় যাকাত দিতে যারা অস্বীকার করেছিল

তাদের সামনে অস্বীকার করার এমন কিছু হেতু ছিল যা এই যমানায় নেই। তাই তাদেরকে ক্ষমার্হ ধরা হবে; এই যুগের লোকদেরকে নয়।

উদাহরণস্বরূপ (কয়েকটি হেতু) যেমন–

১. যাকাত অস্বীকারকারীদের যুগটি ঐ যুগের নিকটবর্তী বা তার সাথে মিলিত ছিল, যে যুগে শরীয়তের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ ও সংকলন হচ্ছিল। হুকুম আহাকম রহিতকরণ ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। (বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর যাকাতের আবশ্যকিয়তা রহিত হয়ে যাওয়ার সংশয়-সন্দেহ এই ভিত্তিতে সৃষ্টি হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যাকাত গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার কারণে সেই হুকুমও খতম হয়ে গেছে।)

২. ঐ সকল লোক ছিল একেবারে মুর্খ ও ধর্মীয় বিধিবিধানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাছাড়া তাদের ইসলাম গ্রহণের পর তখনও বেশী দিন অতিবাহিত হয়ে সাড়েনি। এককথায় তারা ছিল নওমুসলিম। এ জন্য তাদের মনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া এক ধরনের যৌক্তিক ছিল। বিধায় তাদেরকে ক্ষমার্হ ও অপারগ ধরা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধান এত ব্যাপকতা ও প্রচার-প্রসার লাভ করেছে যে, শুধু মুসলমানদের মাঝেই নয়, বরং অমুসলিমদের মাঝেও ইসলাম ধর্মে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে এবং তা তাওয়াতুর তথা বিশেষ পরম্পরার স্তরে পৌঁছে গেছে। এমনকি বিশেষ ও সাধারণ, আলেম ও অশিক্ষিত সকল পর্যায়ের লোক সমানভাবে জানে যে, ইসলামে যাকাত দেওয়া ফরয।

অতএব এ যুগে যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তাকে কাফের বলা হবে। তার কোন তাবীল ও অজুহাত মানা হবে না। (কারণ, জরুরিয়াতে দীন [দীনের স্বতসিদ্ধ বিষয়] এর ক্ষেত্রে তাবীল করা কুফর থেকে বাঁচায় না। ঠিক এরূপ একই হুকুম হবে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি ধর্মের সর্বসম্মত এমন বিষয় অস্বীকার করে, যে বিষয়ের জ্ঞান মশহুরের স্তরে পৌছে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, মাহে রমাযানের রোযা, ফরয গোসল, যিনার অবৈধতা, মদের অবৈধতা, সুদের

অবৈধতা, চিরস্থায়ী মাহরামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অবৈধতা, এছাড়াও এ ধরনের যত ধর্মীয় বিধিবিধান রয়েছে।

তবে এরূপ বিধান অস্বীকারকারী যদি একেবারে নওমুসলিম হয় এবং ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ হয়। আর নিজের মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে কোন হুকুম অস্বীকার করে, তাহলে তাকে ক্ষমার্হ ও অপারগ মনে করা হবে। তাকে কাফের বলা হবে না। এ জাতীয় নওমুসলিমদের সাথে প্রথম যুগের যাকাত অস্বীকারকারী অজ্ঞ ও নবীন মুসলমানের মত আচরণ করা হবে। (অর্থাৎ ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানানো হবে। তারপরও যদি না মানে, তাহলে ধরা হবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এবং কাফের হয়ে গেছে।) তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে সে সব সর্বসম্মত বিশেষ বিশেষ মাসআলা ও বিধিবিধান, যেগুলো শরীয়তে বিশেষ শিরোনামে এসেছে। এবং তার জ্ঞান শুধু উলামায়ে কিরামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, বিবাহ বন্ধনে যে মহিলা রয়েছে, সে থাকা অবস্থায় তার আপন ভাতিজী বা ভাগ্নী বিয়ে করা হারাম হওয়া। যার থেকে মিরাস পাবে এমন আত্মীয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী তার এই নিহত আত্মীয়ের মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। মায়ের অবর্তমানে দাদী একষষ্ঠাংশ মিরাসের মালিক হওয়া। এ জাতীয় গবেষণামূলক কোন মাসআলা বা হুকুম অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না। (এ ক্ষেত্রে মনে করা হবে অজানা ও অজ্ঞতার কারণে বলেছে।) কেননা, এ জাতীয় মাসআলা ও হুকুম এই পরিমাণ প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নয় যে, প্রত্যেক সাধারণ ও অশিক্ষিত লোক তা জানে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই মাসআলা সংশ্লিষ্ট ইমাম খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আরো একটি আলোচনা ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মাসআলার পূর্বে আল-ইয়াকীতু ওয়াল জাওয়াহির কিতাবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আলোচনার ফলাফল ও গবেষণার সারাংশ

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এই হাকীকত পরিষ্কার ও পরিস্ফুটিত হয়ে গেল যে, জরুরিয়াতে দীন অস্বীকারকারী যদি তাওবা করতে বলার পরও তাওবা না করে, তাহলে কোন প্রকার তাবীলই তাকে হত্যা থেকে বাঁচাতে পারবে না। আর না কাফের ও মুরতাদ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে।

এখন বাকি থাকল ঐ প্রশ্ন, যেটি ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ হযরত খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি (হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর যমানায়) যাকাত অস্বীকারকারীরা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করে থাকে, তাহলে এই অস্বীকারের কারণে তারা মুরতাদ হবে কি না? এ অবস্থায় যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুও এই যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। যাহোক, যথাসম্ভব এর সহীহ্ জবাব হচ্ছে, ঐ সকল লোক হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর পক্ষ থেকে যাকাত উসুল করার কাজে নিযুক্ত লোকদের কাছে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। সেই সাথে নিজ নিজ গোত্রে আমীর ও বিচারক নির্ধারণ করার ইচ্ছা ছিল তাদের। এভাবে তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর আনুগত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে ছিল। ফলে তারা এই বিবেচনায় রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল। আর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু যেহেতু মনে করেছিলেন, তাদের এই অস্বীকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও খলীফার অবাধ্যতা। (তাই তাঁর মতে এ সব লোক যাকাতের আবশ্যকতা অস্বীকার করেনি, বরং খলীফাতুল মুসলিমীনকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিদ্রোহ করেছে।)

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ টিকাতে বলেন, এই আলোচনার সমর্থন মুসতাদরাকের একটি বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। যেটি ইমাম হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহ ৩০৩ /২ পৃষ্ঠায় হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, আহ! যদি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে রাখতাম, তাহলে এটি আমার জন্য লাল উটনী থেকেও বেশী দামী ও কার্যকরী হত। এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর কে খলীফা হবেন ?

দুই. ঐ সকল লোকের কী হুকুম, যারা বলে "মালের যাকাত দেওয়া ফরয এটাতো আমরা মানি। তবে আমরা সেই যাকাত তোমাদের কাছে অর্থাৎ মুসলমানদের খলীফার কাছে দেবো না।" এ জাতীয় লোকদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে কি না?

তিন. কালালার মাসআলা। (অর্থাৎ এমন মৃত ব্যক্তি যার না মাতাপিতা জীবিত আছে, আর না কোন ছেলেমেয়ে আছে- এমন ব্যক্তির মিরাসের ওয়ারিশ কে হবে?)

এই হাদীসটি হযরত ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর শর্তানুসারে সহীহ। অবশ্য সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়নি।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ সব লোক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মনে করে ছিল যে, যাকাতও এমন একটি আর্থিক টেক্স, যেমন প্রত্যেক বাদশা তার প্রজাদের থেকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক টেক্স উসুল করে থাকে। বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত দিন জীবিত ছিলেন, বাদশা হিসেবে আমাদের থেকে যাকাত উসূল করেছেন (আমরাও তা আদায় করেছি)। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই অধিকার ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর যখন আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি, এখন আমাদের দলপতিদের স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছে করলে তারা অন্যান্য ট্যাক্সের ন্যায় যাকাতও উসুল করতে পারে, ইচ্ছে করলে নাও করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় আমরা যে যাকাত দিয়ে ছিলাম সেটার বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সাথে খতম হয়ে গেছে। এখন সেভাবে যাকাত চাওয়ার অধিকার কারো নেই। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মতে এটাই ছিল ঐ লোকদের যাকাত দিতে অস্বীকার করার মূল মতলব ও হেতু। (বিধায় তারা রষ্ট্রদ্রোহী ছিল।) যাকাত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এটা ছাড়া অন্য যেসব তাবীল বা ব্যাখ্যা তারা করত, সেগুলো ছিল অতিরিক্ত; মূল নয়।

কিন্তু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন এই ভিত্তিতে যে, তাদের এই অস্বীকার যেন যাকাতের মূল আবশ্যকতাই অস্বীকার করা। (কেননা, যাকাতকে ইবাদত ও ধর্মীয় ফরয মানার পরিবর্তে সরকারের আর্থিক টেক্স বলা মূলত যাকাত ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করা। বিধায় এ সব লোক মুরতাদ।) আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয় সম্পর্কে অধিক অবগত।

যাহোক, শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর মতভেদ মূলত অস্বীকারকারীদের আসল মতলব ও অস্বীকার করার মূল হেতু নির্ধারণ করার ব্যাপারে ছিল। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাদের যাকাত অস্বীকার করার মূল সবব ও হেতু সাব্যস্ত করেছেন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর আনুগত্য থেকে তাদের সরে যাওয়া এবং তাঁর হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে। আর "যাকাত আদায়ে অস্বীকার করা" তো মূলত ঐ বিদ্রোহেরই পরিচায়ক।

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর মতে তাদের যাকাত অস্বীকার করার মূল সবব ও হেতু হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীন থেকে সরে যাওয়া এবং দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত অস্বীকার করা। বিধায় তিনি তাদেরকে মুরতাদ মনে করতেন এবং মনে করতেন তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। সুতরাং হযরত আবু বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর এই মতভেদ ছিল যাকাত অস্বীকার করার মূল সবব ও হেতু বের করণ ও যাচাই করণ সম্পর্কে। তাই হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর নিকট যদি এই হাকীকত স্পষ্ট হয়ে যেতে যে, মূলত এ সব লোক কুফরির উপর ভিত্তি করেই যাকাত ফরয হওয়া কে অস্বীকার করছে, (এবং এটিকে দীনের একটি স্তম্ভই মানছে না) তাহলে তিনিও নিশ্চিতভাবে তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করতেন; এ ক্ষেত্রে কোন ইতস্ততা বোধ করতেন না।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, তারপর ঠিক এই গবেষণাটিই হযরত হাফেয জামালুদ্দীন যাইলাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর তাখরীজে হেদায়ার বাবুল জিযইয়া (টেক্সের অধ্যায়) এর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে পড়ে। এ ক্ষেত্রে মিনহাজুস সুন্নাহর ২৩৩/২ এবং ২৩১/৩ পৃষ্ঠা দুটিও দেখে নেওয়া উচিত।

একটি নতুন হাকীকত উন্মোচন

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কানযুল উম্মাল কিতাবে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক সেই মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ আছে। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুও

তাদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন। তবে তিনি মনে করেছিলেন, ঐ মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার মত সামরিক শক্তি এই মুহূর্তে নেই। (এজন্য তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে শুধু আক্রমানাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছিলেন। ঐ সকল লোকের মুরতাদ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত ছিল না। বরং সেই মুহূর্তে যুদ্ধ করা মুনাসেব বা সমীচীন হবে কি হবে না- এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল।)

তাছাড়া মুহিব্বে তবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর আর-রিয়াযুন নাযরাহ কিতাবে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান, তখন আরবের কিছু গোত্র ইসলাম ধর্ম থেকে সরে যায় এবং মুরতাদ হয়ে যায়। তারা পরিষ্কার বলে দেয় যে, আমরা যাকাত দেবো না। তাদের এই কথার প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর কসম! উট কেন এ সব লোক যদি উটের একটি রশী দিতেও অস্বীকার করে তাহলেও আমি এই একটি রশীর কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফা! সময়ের চাহিদা ও দাবি হচ্ছে আপনি তাদের মন জয় করবেন এবং তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করবেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে উমর! অমুসলিম থাকা অবস্থায় তুমি কঠিন নির্ভীক ছিলে, আর ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এত ভীতু হয়ে গেলে? শুনো হে উমর! এখন ওহী আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দীনও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমি জীবিত থাকতে দীনের মধ্যে সামান্য ত্রুটি আসবে তা কক্ষনো হতে পারে না।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই রেওয়ায়াতটি হুবুহু এই শব্দে সুনানে নাসায়ীতেও উল্লেখ আছে। এই রেওয়ায়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (না যাকাত অস্বীকারকারীদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন, আর না মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। বরং তিনি) শুধু মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন।

হযরত ইবনে হাযাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর মালাল ও নাহাল কিতাবের ৭৯/৬ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আল্লামা নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর তাফসীরের ১৪০/৬ পৃষ্ঠায় সে সব মুরতাদদের বিভিন্ন দল ও ফেরকার পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। (তাদের মধ্যে কিছু ছিল মুরতাদ, আর কিছু ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী। আল্লামা নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটাকেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মতভেদের মূল কারণ ও ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন।

হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল কারী'র ২৭৩ /৪ পৃষ্ঠায় যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একলীলের উদ্ধৃতিতে হাকীম ইবনে আব্বাদ ইবনে হানীফ থেকে একটি হাদীসে মারফু' বর্ণনা করেছেন। তার পর হযরত হাকীম ইবনে আব্বাদের এই উক্তি উল্লেখ করেছেন।

مَا أَرَى أَبَا بَكْرٍ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ مُتَأَوِّلًا إِنَّمَا قَاتَلَهُمْ بِالنَّصِّ

> আমার ধারণা মতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু কোন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন- এমন নয়। বরং তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে নসসে কাতয়ী তথা অকাট্য ভাষ্যের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

এরপর হযরত হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭২ পৃষ্ঠায় সেই অকাট্য ভাষ্য বর্ণনা করেন। অকাট্য ভাষ্যটির একটি অংশ হচ্ছে إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ। এই অংশের আলোচনার অধীনে তিনি কয়েকটি সুরত বর্ণনা করেন।

এক. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

দুই. কোন ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যাকাত বা দীনের এ ধরনের কোন রুকন অস্বীকার করা।

তিন. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করা।

এগুলো এমন বিষয় যে, এগুলোর যে কোন একটির কারণে কালিমায়ে তাওহীদ পড়া মুসলমানও হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবু বকর রাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আহকামুল কুরআনের ৮২ /২ পৃষ্ঠায় অনেক পরিষ্কারভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কানযুল উম্মালের ১২৮/৩ পৃষ্ঠায় এর সমর্থনে আরো একটি রেওয়ায়াত আছে। হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহও ফাতহুল বারীর ১৮৭/১৩ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কানযুল উম্মালের ৩১৩/৬ পৃষ্ঠায় এবং ৮০/১ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন,

> وَاللهِ: لَيَوْمٌ و لَيْلَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ عُمْرِ عُمَرَ، وَآلِ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ لَيْلَةَ الْغَارِ إِلَى اَنْ قَالَ فَذَكَرَ قِتَالَهُ لِمَنِ ارْتَدَّ.
>
> আল্লাহর কসম! হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর একরাত ও একদিন উমর ও উমর পরিবারের পুরা যিন্দেগী থেকে উত্তম। অতপর তিনি বলেন, সে রাতটি হচ্ছে গারে হেরার রাত। আর সে দিনটি হচ্ছে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার দিন।

এই রেওয়ায়াতটি কামূস কিতাবের লেখকের রচিত "আসসালাতু ওয়াল বাশারু ফিসসালাতি আলা খাইরিল বাশারি" কিতাবের দাগ টানা পাণ্ডুলিপিতেও আছে। আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয় সম্পর্কে অধিক অবগত।

সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর এজমা বা ঐকমত্য

কোন হারাম বস্তুই তাবীল বা ব্যাখ্যা করার দ্বারা হালাল হয়ে যায় না। তথাপিও যদি কেউ এরূপ তাবীল করা বস্তু হালাল মনে করে তাহলে সে তাওবা না করলে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম আবু জাফর তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শরহে মাআনিল আসার কিতাবের ৮৯/২ পৃষ্ঠায় হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়ায়াতের কয়েকটি সূত্র ফাতহুল বারীর হদ্দুল খামার এর অধ্যায়ের ৬০/১২ এবং কানযুল উম্মালেও উল্লেখ আছে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে সময় ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু শামের শাসক ছিলেন, তখন সেখানকার কিছু লোক এ কথা

বলে মদ্যপান শুরু করে দিয়েছিল যে, আমাদের জন্য তো মদ পান করা হালাল। মদ হালাল সাব্যস্ত করার জন্য তারা এই আয়াত দিয়ে প্রমাণ পেশ করে–

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ

তখন ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কে এই ফেৎনা সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর সাথে সাথেই ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট জবাব লেখে পাঠান যে, এ সব লোক সেখানে এই ফেৎনা ছাড়ানোর পূর্বেই তুমি তাদেরকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।[৮৩]

হযরত ইয়াজিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাই করেন। যখন এ সব লোক হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মদীনায় পৌছে, তখন তিনি এদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর সাথে পরামর্শ করেন। সকল সাহাবী সম্মেলিতভাবে আবেদন করেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের অভিমত হচ্ছে, এ সব লোক (এই আয়াতের মধ্যে অপব্যাখ্যা করেছে) আল্লাহ তাআলার উপর অপবাদ দিয়েছে এবং তারা এমন বস্তু কে ধর্মের মধ্যে জায়েয ও হালাল বলেছে, যা পান করতে আল্লাহ তাআলা কক্ষনোই অনুমতি দেননি। বিধায় তারা সকলে মুরতাদ হয়ে গেছে। আপনি তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা থেকে চুপ থাকেন। তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আবুল হাসান! তোমার অভিমত কী? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মত হচ্ছে আপনি তাদেরকে এই আকীদা- বিশ্বাস থেকে তাওবা করার নির্দেশ প্রদান করেন। যদি তারা তাওবা করে, তাহলে আপনে তাদেরকে মদ পান করার কারণে (দণ্ড হিসেবে) আশিটা করে বেত্রাঘাত করবেন। আর যদি তারা তাওবা না করে, তাহলে তাদেরকে (কাফের মুরতাদ আখ্যায়িত করে) হত্যা করে ফেলবেন। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছে এবং ধর্মের মধ্যে এমন বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ তাআলা যার অনুমতি দেননি। তখন (সকল সাহাবী

---

[৮৩]. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৩

রাযিয়াল্লাহু আনহুম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর এই অভিমতের উপর একমত পোষণ করেন এবং) হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে তাওবা করার নির্দেশ দেন। যখন তারা তাওবা করে নেয়, তখন তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়।

এই ঘটনার ব্যাপারে হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, শূরার সাথী সকলেই হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথীদের এই ফায়সালার উপর একমত হয়ে যান যে, এ সব লোকদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং মদ হারাম হওয়াও স্বীকার করে নেয়, তাহলে তো তাদেরকে আশি দোররা লাগানো হবে। আর যদি এই আকীদা থেকে তাওবা না করে এবং মদ হারাম হওয়ার বিধান স্বীকার না করে, তাহলে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে এবং হত্যা করে দেওয়া হবে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, অথচ উল্লিখিত আয়াত (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا) ঐ সকল আহলে কিতাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পর, মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ পান করেছিল। (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান গ্রহণ ও আমালে সালেহ করার পর মদ পান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।) শামের এ সব লোকও এই ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য মদ পান হালাল বলেছিল। (তারা মনে করেছিল, মদ শুধু কাফেরদের জন্য হারাম; মুসলামনদের জন্য হালাল।) কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাদের এই ব্যাখ্যা কোন রূপ গ্রহণ করেননি।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, তাহরীরুল উসূল কিতাবের মধ্যেও অজ্ঞতার প্রকারভেদের আলোচনার অধীনে এই ঘটনা উল্লেখ আছে। হযরত আবু বকর রাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আহকামুল কুরআনের ৫৬৭/২ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদার অধীনে খুবই স্পষ্ট আকারে এই বিষয়টি বয়ান করেছেন। (তাঁরা বলেছেন, এমন বাতিল ব্যাখ্যা এবং প্রকাশ্য অজ্ঞতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যেমন কুরআন অস্বীকারকারী কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। এমনিভাবে কুরআনের অর্থ অস্বীকারকারীও কাফের, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ফাতহুল বারীর ৪০৩ /৭ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগে আগে যাচ্ছিলেন এই রণ-কবিতাগুলো পড়তে পড়তে—

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ * قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ فِي تَنْزِيلِهِ
بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ * نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

হে কাফেরদের সন্তানেরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ থেকে সরে দাঁড়াও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কুরআনে কারীমে নাযিল করেছেন যে, সর্বোত্তম হত্যা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় হত্যা হওয়া। আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব কুরআনে করীমের ব্যাখ্যা অনুসারে যেমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করি কুরআনের ভাষ্য অনুসারে।

আবু ইয়া'লা রহমাতুল্লাহি আলাইহও আবদুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর সনদে এই রেওয়ায়াতের তাখরীজ করেছেন। তবে আবু ইয়া'লা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর রেওয়ায়াতে نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ এর স্থানে نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ রয়েছে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, এ কথার অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাদের সাথে এই পর্যন্ত লড়াই করতে থাকব যে, তোমরা কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যও মেনে নিবে। তিনি আরো বলেন, এই কবিতার

উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কুরআনের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি ও বুঝি, সেই অনুসারে তোমাদের সাথে লড়াই করব, এ পর্যন্ত যে, তোমরাও সেই অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নেও, যেটা আমরা বুঝেছি ও মেনেছি। তোমরাও এই ধর্মে দিক্ষিত হয়ে যাও, যে ধর্মে আমরা দিক্ষিত হয়েছি। (অর্থাৎ কুরআন শরীফকে শুধু আল্লাহ তাআলার কালাম মেনে নেওয়া মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং মুসলমান হওয়ার জন্য কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নেওয়াও জরুরী। হত্যা ও যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা লাভ করার জন্যও এটি জরুরী। এটা সকল মুসলমানই বুঝে এবং এ বিষয়ে পুরা উম্মত একমত।)

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, কবিতার সঠিক শব্দ হচ্ছে নিম্নরূপ-

نَحْنُ ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ * كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ

তিনি আরো বলেন, চাই ضَرَبْنَاكُمْ হোক, আর قَتَلْنَاكُمْ হোক উভটির উদ্দেশ্য সেটাই, যা আমরা বলে এসেছি। শুধু শব্দের মধ্যে পার্থক্য; অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থ একই। তাই ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহ রেওয়ায়াতটির উভয় সূত্রকেই সঠিক বলেছেন। যদিও প্রথম সনদটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই বর্ণনাটি একটি সুস্পষ্ট ভাষ্য। এ ব্যাপারে উম্মত একমত যে, কুরআনে করীমের যে সব অর্থ ও ভাবের উপর সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালেহীনের এজমা হয়েছে, সেগুলো মানানো ও স্বীকার করানোর জন্যও (অস্বীকারকারীদের সাথে) যুদ্ধ করতে হবে, যেমনিভাবে কুরআন শরীফকে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত মানানোর জন্য (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করা হয়।

কুরআন-হাদীস ও মুতাকাদ্দিমীনের পরিভাষায় تأويل শব্দের অর্থ

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই বর্ণনায় تأويل শব্দের অর্থ হচ্ছে مراد বা উদ্দেশ্য। সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালফে সালেহীনের পরিভাষায় تأويل শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাফেয

ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর একাধিক গ্রন্থে এবং খাফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শিফা কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নাসীমুর রিয়াযে এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যার জান্য হযরত আবু বকর জাসসাস রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর আহকামুল কুরআনের ৪৮৮/২ দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, কুরআন হাকীমের মধ্যেও تأويل শব্দটি مصداق ও مراد অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী - يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ এর মধ্যে تأويل শব্দের অর্থ مصداق বা উদ্দেশ্য। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর উক্তি- وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ এর মধ্যেও تأويل শব্দটির অর্থ مصداق ও مراد। এটি কুরআনের প্রচলন ও ব্যবহার। এই تأويل শব্দটির অর্থ صرف عن الظاهر (কোন শব্দের জাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া।) নয়। (যেমনটি আকায়েদ ও কালাম শাস্ত্রে এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর পরিভাষায় উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। অর্থাৎ মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরাম تأويل শব্দটিকে ঐ অর্থে ব্যবহার করতেন না, যেই অর্থে মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম ব্যবহার করেছেন। মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম تأويل শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করেছেন যে, "শব্দকে তার জাহেরী অর্থ থেকে সরিয়ে ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া। আর মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কিরাম تأويل শব্দটিকে مصداق ও مراد অর্থে ব্যবহার করেছেন, যেমনটি কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।)

কুরআনের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার

কুরআন শরীফের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার কুরআন অস্বীকারেরই নামান্তর। এ কারণে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আসল কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি কুরআনে করীমের কোন আয়াতের ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের তাবীল (যেটাকে মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরাম তাফসীর বলেন, সেটাকে) পরিহার করবে তথা না মানবে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং হত্যার উপযুক্ত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কুরআন শরীফ পরিহারকারী ও অমান্যকারী কাফের ও হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়। এই দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যেমনিভাবে কুরআনে করীমের কোন আয়াত অস্বীকার করলে নিশ্চিতভাবে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়, হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়, ঠিক তদ্রুপ কুরআনের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করলেও নিশ্চিতভাবে কাফের ও হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়।)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কিতাব বাদায়ে' এর মধ্যে একটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন, এখন তুমি কুরআন মানানো ও স্বীকার করানোর জন্য (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যেমন যুদ্ধ করছ, এক সময় কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য মানানোর জন্যও তেমন যুদ্ধ করবা।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, খুব সম্ভব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ইশারাটি ছিল খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি। (যেন এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ভবিষ্যত বাণী ছিল, যা হুবুহু বাস্তবায়িত হয়েছে।)

তাই তো ইমাম তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ মুশকিলুল আসার কিতাবের সংক্ষিপ্ত রূপ আল-মু'তাসার এর ২২১/১ পৃষ্ঠায় এই হাদীসের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাব (অধ্যায়) রচনা করেছেন। এটির নাম দিয়েছেন, "بَابُ قِتَالِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ"। এমনিভাবে ইমাম নাসাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহও তাঁর "খাসায়েসে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু" নামক কিতাবে এই হাদীসটি এনেছেন। এমনিভাবে ইমাম হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহ মুস্তাদরাকের মধ্যে এই হাদীসটি এনেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, হাদীসটি ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর শর্ত অনুসারে সহীহ। যদিও তাঁরা তাদের কিতাবে হাদীসটি আনেননি।

হাফেয যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তালখীসুল মুসতাদরাক কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। হাদীসটির কিছু অংশ জামে তিরমিযীর ৩৩৫ পৃষ্ঠায় মানাকেবে আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু নামক অধ্যায় উল্লেখ আছে। তাঁদের কিতাবে হাদীসটি এই শব্দে উল্লেখ আছে-

ثم قال إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا الْقَوْمُ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله تعالى عنهما فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا قَالَ : لا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا قَالَ : لا ، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ.

অতপর তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য মানানোর জন্যও যুদ্ধ করবে, যেমনিভাবে এখন আমি কুরআন মানানো ও স্বীকার করানোর জন্য (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করছি। এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম একজন অপর জনের দিকে তাকাতে লাগলেন। উপস্থিতদের মধ্যে হযরত আবু বরক রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুও ছিলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই লোকটি কি আমি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি আমি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন না। বরং সেই লোকটি হচ্ছে জুতা একত্রকারী। অর্থাৎ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু।

এই হাদীস থেকেও প্রমাণ হয় যে, কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করা এবং কুরআন অস্বীকার করার হুকুম একই।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহও এই হাদীসটি মুসনাদে আহমদের ৮২/৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

যাহোক হাদীসটি খারেজীদের যুদ্ধ সম্পর্কিত। এ কারণে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আন্হু হাদীসটিকে সিফফীন যুদ্ধের আলোচনায় এনেছেন। হতে পারে তিনি অবস্থা অনুযায়ী উদাহরণ স্বরূপ এনেছেন অথবা তাঁর ধারণা সিফফীনের যোদ্ধাদের সম্পর্কেই এই হাদীসটি। পরবর্তীতে তাঁর

নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসটি সিফ্ফীনের যোদ্ধাদের সম্পর্কে নয় বরং খারেজীদের সম্পর্কে। মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবে সিফফীনের যোদ্ধাদের সম্পর্কে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর যে সব উক্তি রয়েছে তা থেকে এমনটিই প্রমাণিত হয়।

(মোটকথা, হাদীসটি খারেজীদের সম্পর্কে। হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হাদীসটি সিফফীনের যোদ্ধা সম্পর্কে পড়াটা হয়তো ভুল বুঝার কারণে হয়েছে, যা থেকে তিনি পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অথবা সামান্য সামঞ্জস্যতা থাকার কারণে তিনি অবস্থা বুঝে সিফফীনের যুদ্ধাদের সম্পর্কে পড়েছেন।)

ইমাম আবু জাফর তহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ মুশকিলুল আসার কিতাবের সংক্ষিপ্ত রূপ আল-মু'তাসার এর ২২২ পৃষ্ঠায় আছে-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবরূপ পেয়েছে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক খারেজীদের বিরুদ্ধে তাদের মাথার উপর চেপে বসা এবং তাদের উপর তরবারী পরিচালনার মাধ্যমে। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাদের যে সব বর্ণনা দিয়েছেন তা হুবুহু খারেজীদের মধ্যে পাওয়ার মাধ্যমে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর এই বৈশিষ্ট্যটি (খারেজীদেরকে সমূলে ধ্বংস করা) সে সব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফাদেরকে বিশেষভাবে প্রদান করেছেন। যা তিনি অন্যদেরকে প্রদান করেননি। যেমন যাকাত অস্বীকারকারী ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে আচ্ছাভাবে শায়েস্তা করা হযরত আবু বকর রা. এর বৈশিষ্ট্য। অনারবীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং ইরাক, শাম বিজয় করা এবং সে সব দেশে ইসলামী বিধিবিধান মজবুত ও শক্তিশালী করা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বৈশিষ্ট্য। কুরআন শরীফের অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকারকারী খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে মুলোৎপাটন করা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বৈশিষ্ট্য। এবং সকল উম্মতকে কুরআনের এক কেরাতের উপর তথা কুরাইশের আরবীর উপর একত্র করা এবং ভাষা ও পাঠের বৈচিত্র দূর করা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বৈশিষ্ট্য। এটি এমন কির্তী যার মাধ্যমে

বিরুদ্ধাচারী ও অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দলীল হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এখন যে কেউ কুরআনের একটি অক্ষরও অস্বীকার করবে অথবা তাতে কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা করবে সে কাফের। আর এর বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইহুদি-নাসারাদের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে রক্ষা করেছেন। তারা তাদের আসমানী কিতাবে এমন মতভেদের দার খুলেছে যার দরুন বিকৃতি ও পরিবর্তনের পথপ্রদর্শন হয়ে গেছে। (এবং উভয় কিতাবই তাদের হাতেই বিকৃত হয়ে গেছে)

যাহোক, আল্লাহ তাআলার মহান সন্তুষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সকল খলীফাগণের উপর সব সময়ই ছিল। তাঁদের এই বিশাল এহসানের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে সুমহান পুরস্কার দান করুন। আমরা আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে সে সকল খলীফাদের স্তর, মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য জানার তাওফীক দিয়েছেন। এ সকল খলীফা এবং তাঁরা ব্যতীত আরো যত সাহাবী আছেন, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও শত্রুতা ভাব লালন করা থেকে আমাদের অন্তরকে পাক-পরিষ্কার ও সংরক্ষিত রেখেছেন। সব সময় তাঁদের প্রতি আল্লাহ তাআলার মহান সন্তুষ্টি থাকুক এবং তিনি আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই মেহেরবান।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত উসমান যিননুরাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু (এর বৈশিষ্ট্য শুধু কুরআন শরীফ জমা করাই ছিল না। বরং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ন্যায় তিনিও) অনারবী সম্প্রদায়ের সাথে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন। (অবশিষ্ট দেশগুলো বিজয় করেছেন।) এগুলো ছাড়াও তাঁর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং অমর কির্তী হচ্ছে তিনি মুসলিম জাতিকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই তো তিনি শহীদ হওয়াকেই নিজের জন্য মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে উম্মতের মাঝে ফাটল ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি এবং গৃহযুদ্ধ হতে দেননি। নচেৎ তিনি যদি সামান্য ইঙ্গিত দিতেন, তাহলে তাঁকে রক্ষা করার জন্য জানবায বহু মুসলমান তৈরী ছিল। কিন্তু ফল দাঁড়াতো এই যে, তাঁরা তাঁর সামনে বিভেদ ও রক্তপাতে লিপ্ত হত।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার ন্যায় কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকারকাদের সাথে যুদ্ধ করার এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর যুগে এটির ব্যাপক প্রচলন ও প্রসিদ্ধি থাকার বিষয়টি আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের পনেরটি হাদীস থেকে খুব ভালভাবেই প্রমাণিত হয়।

তাইতো হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, সাবীগ ইবনে আসাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এর প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হাদীস এ বিষয়ের দলীল হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বলে যাওয়া বিবরণের মাধ্যমে) যার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে, সে খারেজী, তাকে হত্যা করা পুরোপুরি জায়েয মনে করতেন, চাই সে একাকিই হোক না কেন। যেমন আবু উসমান নাহদী বলেন, ইয়ারবু বা তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে الذَّارِيَاتِ ، الْمُرْسَلَاتِ ، النَّازِعَاتِ বা এগুলোর কোন একটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, এগুলোর অর্থ কী?) তখন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি তোমার মাথা থেকে পাগড়ী একটু সড়াও তো দেখি। লোকটি পাগড়ী খুলে ফেলল। লোকটির মাথায় চুল ছিল। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সাবধান থেকো। আল্লাহর কসম যদি আমি তোমার মাথা মুণ্ডানো পেতাম তাহলে তোমার মাথার খুপড়ী খুলে ফেলতাম, যার মধ্যে তোমার চোখ ঘোরছে। (এবং তোমাকে খারেজী হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অনুসারে হত্যা করতাম।)

আবু উসমান নাহদী বলেন, এরপর হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরাবাসীকে (অথবা বলেছেন, আমাদের বসরাবাসীকে) লেখে পাঠান যে, এ ব্যক্তির সাথে কখনোই উঠা-বসা, চলাফেরা করবে না। (তাকে বয়কট করবে। কারণ, সে কুরআনের মুতাশাবিহ ও অস্পষ্ট আয়াতের অর্থের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাচ্ছে।)

আবু উসমান নাহদী বলেন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘোষণার পর অবস্থা এই হয় যে, যদি সেই লোকটি আমাদের শত লোকের মজলিসেও

আসত, সকলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। (সকলে তার থেকে এমনভাবে ভাগতেন যেমন কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ লোকেরা ভেগে যায়।)

হযরত উমবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহ অনেক মুহাদ্দীস এই হাদীসকে সহীহ সনদের সাথে রেওয়ায়াত করেছেন।

হযরত ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই রেওয়ায়াতটি এনে বলেন, এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখুন যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুহাজের ও আনসার সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর সামনে কসম করে বলেন, যদি এই ব্যক্তির মধ্যে সে সব নিদর্শন পাওয়া যেত, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারেজীদের যে সব নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম। অথচ এই উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলখুওয়াইসিরা খারেজীকে হত্যা করতে নিষেধ করে ছিলেন। এতে বুঝাগেল, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ (যেথায় তাদেরকে পাবে সেথায় হত্যা করবে।) এর উদ্দেশ্য এটাই বুঝে ছিলেন যে, এ সব নিদর্শন বিশিষ্ট খারেজীদেরকে নির্দিষ্ট করা ছাড়াই হত্যা করে দেওয়া হবে। আর এটাও বুঝাগেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যুগে যুলখুওয়াইসিরা কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কেবল ইসলামের দুর্বলতা এবং মুসলমানদের মনোতুষ্টির উপর ভিত্তি করে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন যে, এ সকল লোককে কাফের হওয়ার ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছে; মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার ভিত্তিতে নয়।

আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের এই অংশটি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশ। এমনিভাবে মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবের বিবরণও দেখে নেওয়া দরকার। কেননা সেখানে যেমন আলোচ্য বিষয় তেমন আলোচনা হয়েছেই। বিশেষ করে হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কিতাবগুলোতে এমনটি খুব বেশী

পরিমাণে পাওয়া যায় যে, পুরা একটি অধ্যায়ে একটি মাসআলার একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশের জন্য আরেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায় তৈরী করা হয়েছে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবের ২৩০/২ পৃষ্ঠায় রাফেযীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখেছেন। আর সেটি এই আলোচনা করে সমাপ্ত করেছেন যে–

"যেহেতু রাফেযীরা দাবি করত, ইয়ামামাবাসী (মুরতাদদের) মাজলুম ছিল। তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা এদের সাথে যুদ্ধ করার বৈধতাও অস্বীকার করত। বরং এদের মুসলমান ও হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করত। সেহেতু এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই পরবর্তী রাফেযীরা ইয়ামাবাসী পূর্ববর্তী মুরতাদদের অনুগামী ও পদাঙ্ক অনুসারী।

আর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী হকপন্থী মুসলমানেরা প্রত্যেক যমানায় এই সব মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করে আসছেন। (অর্থাৎ যেমনিভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজ যুগের ইয়ামামাবাসী মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণে, এমনিভাবে তাঁর অনুসারী আহলে হকরাও নিজ নিজ যমানার মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। ভিন্ন শব্দে বললে বলতে হয়, প্রত্যেক যুগে মুরতাদও সৃষ্টি হবে আবার তাদেরকে হত্যা করার জন্য হকপন্থীও সৃষ্টি হবে। আর এই ধারাবাহিকতা বরাবরই অব্যাহত থাকবে।"

এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ "হত্যা" কেই মুরতাদ হওয়ার নিঃশর্ত শাস্তি আখ্যায়িত করেছেন।

কাফের-মুরতাদ কে মুসলমান মনে করার বিধান

যে ব্যক্তি কোন কাফের বা মুরতাদকে ব্যাখ্যা করে মুসলমান সাব্যস্ত করে অথবা কোন নিশ্চিত কাফের কে কাফের না বলে, সেও কাফের।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর উল্লিখিত আলোচনার মধ্যে এ বিষয়টির স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে,

যে ব্যক্তি তাবীল করে ইয়ামামাবাসী সেই লোকদেরকে মুসলামন সাব্যস্ত করবে সে কাফের। আর যে ব্যক্তি কোন অকাট্য ও নিশ্চিত কাফেরকে কাফের না বলে সেও কাফের।

এই মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবের ২৩৩/২ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে-

খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করাটা মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার মত ছিল না। বরং এটি তো তার চেয়ে মারাত্মক ও ভিন্ন ধরনের ছিল।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মিনহাজুস সুন্নাহ কিতাবের ১৯৭/২ পৃষ্ঠায় রাফেযীদের সম্পর্কে আরো কিছু লেখা আছে। (সেগুলোও দেখা উচিত।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এ কথাও বলেন যে, যেহেতু খারেজীদের প্রথম ব্যক্তির কথা- إِنَّ هَٰذِهِ لَقِسمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ তাদের সর্বসম্মত মত এবং সেটি তাদের মধ্যে চলমান বিধায় এই হুকুম তাদের সন্তান এবং অনুসারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সেই কাফের হবে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারী কিতাবের ২৬৬/ ১২ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির এই উক্তির পর তাকে সাথে সাথে হত্যা করার জন্য তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি إِنَّ هَٰذِهِ لَقِسمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ বলেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই লোকটি সেখান থেকে পালিয়ে যায় ফলে বেঁচে যায়। এ জন্য সেই লোক এবং তার অনুসারী সকলেই কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং শাস্তি স্বরূপ হত্যার উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহও তার আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ১৮০ পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে এমনটিই লেখেছেন।

অপাত্রে আয়াত ব্যবহার ও অর্থে হেরফের করা

কুরআনে করীমের আয়াত অপাত্রে প্রয়োগ করা এবং এদিক সেদিক ঘুরিয়ে অর্থ ও মতলব বর্ণনা করা কুফরী।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এদের সকলের কর্মপদ্ধতি একই ছিল। তারা কুরআনে কারীমের আয়াত অপাত্রে প্রয়োগ করে এবং হক কথা দ্বারা বাতিল মতলব গ্রহণ করে। যেমন, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতের শব্দসমূহ নিম্নরূপ–

فَقَالَ "إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيًّا رَطْبًا."

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আল্লাহ তাআলার কিতাবকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়বে।

এই হাদীসে لَيًا শব্দটি ي এর সাথে এসেছে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ হযরত কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, অধিকাংশ মাশায়েখের বর্ণনায় এই শব্দটিই এসেছে। এর অর্থ হয়, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِهِ তারা কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যে বিকৃতি ঘটায়।

হযরত ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহীহ বোখারীর "কিতাবুল খাওয়ারিজ" অধ্যায়ের অধীনে বলেন, ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই খারেজীদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্টতম মাখলুক মনে করতেন। তিনি বলতেন, কুরআনের যে সব আয়াত কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, এই জালেমরা সেগুলো মুমনিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে (এবং মুমিনদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এটাই হচ্ছে কুরআনকে ভিন্নখাতে প্রয়োগ করা এবং অপব্যাখ্যা করার অর্থ। (যার একটি সুরত হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন।)

সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালফে সালেহীন রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই খারেজীদের ব্যাপারে বলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ অর্থাৎ এই কথাটি হক তবে ব্যবহার করা হয়েছে বাতিলের জন্য। এটাকে এক কথায় বলে "কথা সত্য মতলব খারাপ"।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সহীহ মুসলিমে এই রেওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত শব্দে এসেছে।

يَقُولُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنهمْ (وَ اَشَارَ اِلَى حَلْقِهِ)

তারা মুখে মুখে তো হক কথা বলে কিন্তু তাদের এই হক তাদের এটা (কণ্ঠনালী) অতিক্রম করবে না।[৮১] (বর্ণনাকারী স্বীয় হাত দিয়ে গলার দিকে ইশারা করেন। অর্থাৎ এ কথা বুঝান যে তাদের অন্তরে হকের নামনিশানাও থাকবে না।

কানযুল উম্মাল কিতাবে হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ : إِنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ ، يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা কুরআনে করীমের আয়াতগুলোকে এমন উল্টাসিধা ও অপাত্রে পড়বে, যেমন দোষী খেজুর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলানো হয়। অর্থাৎ তারা আয়াতের এমন উদ্দেশ্য ও মতলব ব্যক্ত করবে, যা প্রকৃতপক্ষে আয়াতের উদ্দেশ্য ও মতলব নয়।[৮২]

হযরত ইবনে জারীর তবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং হযরত আবু ইয়ালা রহমাতুল্লাহি আলাইহও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে ইতকানের ৮০তম প্রকারে এটি উল্লেখ আছে। এমনিভাবে হযরত হাফেয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহও তার তাফসীরের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৩ বর্ণনা করেছেন।

কুরআন করীম থেকে প্রমাণ

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মহান আল্লাহ তাআলাও কুরআনে কারীমে বলেছেন–

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

---

[৮১]. সহীহ মুসলিম: ১/৩৪৩

[৮২]. কানযুল উম্মাল : ৬/৭৫

নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা মুখ আকাবাকা করে আসমানী কিতাব পড়ে। (অর্থাৎ আসমানী কিতাবে বিকৃতি করে।) যাতে করে তোমরা সেটিকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর। অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয়। আবার তারা বলেও যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। অথচ সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি। তারা জেনে শুনে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে।[৮৩]

আয়াত ও হাদীস নির্গত ফলাফল

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মুআত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মুসতাওয়া" এর পূর্বোক্ত আলোচনা অনুসারে যে সকল মুহাদ্দিস এই খারেজীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন, তাঁরা এই পদ্ধতিতে এই হাদীসগুলোর মাধ্যমে করেছেন।

১. কাফের আখ্যায়িত করার কারণ সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। (যে এই মুহাদ্দিসগণ কেন তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন।)

আল্লামা সিন্ধী রহমাতুল্লাহি আলাইহও নাসায়ী শরীফের টিকায় বলেছেন, খারেজেদীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা মুহাদ্দিসগণের মত। আর এটিই শক্তিশালী অভিমত।

হযরত শাইখ ইমাম ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহও ফাতহুল কাদীরের মধ্যে মুহাদ্দিসগণের এই মতই বয়ান করেছেন।

২. তাছাড়া এই হাদীসগুলো থেকে এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দীনের অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়কে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করা এবং তাবীল তথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ ও ব্যাখ্যা করার মাঝে কুফরী হওয়ার দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। (পরিষ্কারভাবে যে অস্বীকার করে, সে যেমন কাফের, ঠিক তদ্রূপ যে অপব্যাখ্যা করে সেও কাফের।)

৩. এমনিভাবে ঐ হাদীসগুলো থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ অনেক সময় কুফরী আকীদা, কুফরী কথা বা কুফরী কাজের কারণে কাফের হয়ে যায়, অথচ সে টেরও পায় না। (অর্থাৎ কারো কাফের হওয়ার জন্য এটা

---

[৮৩]. সূরা আলে ইমরান: ৭৮

আবশ্যক নয় যে, তার জানা থাকতে হবে, এমন কথা বললে বা এমন কাজ করলে কাফের হয়ে যাবো। বরং শুধু কোন কুফরী কথা বললে বা কুফরী কাজ করলেই কাফের হয়ে যাবে।)

নামায-রোযা আদায়ের সাথে কুফরী আকীদাও পোষণ

নামায রোযার পাবন্দী এবং বাহ্যিক দীনদারী থাকা সত্ত্বেও কুফরী আকীদা পোষণ করলে বা কোন কুফরী করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায়।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই মাসআলাটি প্রমাণ করার জন্য এই হাদীসেরই নিম্নোক্ত শব্দগুলো দেখুন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِم وَأَعْمَالَه مَعَ أَعْمَالِهِمْ لَيْسَتْ قِرَاءَتُهُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا.

তাদের নামায রোযার বিপরীতে তোমরা নিজেদের নামায রোযা অনেক কম মনে করবে। তাদের আমলের তুলনায় নিজেদের আমল অনেক অল্প মনে হবে। তাদের কুরআন তেলাওয়াতের সামনে তোমাদের কুরআন তেলাওয়াতকে কিছুই মনে হবে না। (এতদ্বসত্ত্বেও তারা ইসলাম ধর্মের বাইরে এবং কাফের।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হে মুসলমান সকল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মুখনিঃশৃত এই হক কথাগুলোকে কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ কর। কেননা, এই কথাগুলো কুরআনের ভাষ্যের মতই যথেষ্ট, পরিপূর্ণ এবং অকাট্য। (সেই সাথে এ কথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নাও যে, কুফরী আকীদা পোষণ করলে, বা কুফরী কথা বললে কিংবা কুফরী কাজ করলে মুসলমান কাফের হয়ে যায়, চাই সে যতই দীনদার এবং নামায রোযার পাবন্দ হোক না কেন।)

কাফের প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিম ফকীহগণের মতভেদের মূল কথা

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এখন আলোচনা বাকি আছে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার মাসআলায় মুতাকাল্লিমীন ও ফকীহগণের মতভেদের কথা। (তাদের মতভেদের কারণে কখনোই ধোকায় পড়বেন না।) কারণ

তাদের মতভেদ কেবল পথভ্রষ্ট মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে। (কাফের মুরতাদদের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোনই মতভেদ নেই। জরুরিয়াতে দীন অস্বীকারকারী এবং তাতে অপব্যাখ্যাকারী উম্মতের সর্বসম্মত মত অনুসারে কাফের।)

এই মতভেদের ভিত্তি কেবল ইসলামী সম্প্রদায়গুলোর গোমরাহির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা ও না করার উপর। (মুসলমানদের যেই গোমরা সম্প্রদায় নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে এতটাই সীমালঙ্ঘন করে যে, তাদের মতাদর্শ পরিপন্থী সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরেক বলে, তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। আর যারা এতটা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।)

অথবা এই মতভেদের ভিত্তি হচ্ছে কিতাব লেখকদের অবস্থার ভিন্নতার উপর। যেমন, যে লেখক যেই গোমরাহ্ সম্প্রদায়ের সাথে বোঝাপড়া করেছেন, তাদের ভ্রান্তির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও আমলের কারণে দীনের ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন, সেই লেখক সেই গোমরা সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এবং এত কঠিনভাবে প্রতিহত করেছেন যে, তাদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছেন এবং তাদের নামনিশানা পর্যন্ত বাকি থাকতে দেননি। (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তনকারী ও কাফের সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।) আর যে, লেখক কে এমন বোঝাপড়া করতে হয়নি এবং তিনি তাদের ভ্রষ্টতার গভীরতায় পৌঁছার সুযোগ পাননি, তিনি সতর্কতাস্বরূপ তাদেরকে মুসলমান এবং আহলে কেবলা মনে করে কাফের বলা থেকে বিরত থেকেছেন।

আহলে কেবলাকে কাফের বলো না

একটি প্রসিদ্ধ উক্ত আছে যে, আহলে কেবলা তথা কাবাকে যারা কেবলা মানে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করো না। এই উক্তির হাকীকত বা মৌলিকতা সম্পর্কে মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, এই সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত উক্তির মূল অর্থ এটাই যা এখন বলা হল। অর্থাৎ মুসলিম গোমরাহ্ সম্প্রদায় সম্পর্কে এটাই মূলনীতি যে, তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা হবে। কিন্তু যদি কোন গোমরাহ্ সম্প্রদায় তাদের বিশেষ অবস্থা ও

সীমানা অতিক্রম করে এবং এটা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তাকে কাফের বলা হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের গোমরাহী থেকে বাঁচাতে হবে।

এই কিতাব লেখার উদ্দেশ্য ও হেতু

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমি নিজেও যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি। তবে এটাও পরিষ্কার হওয়া চাই যে, সতর্কতা অবলম্বনেরও একটা সীমা আছে। (সেই সীমা অতিক্রম করাও স্বয়ং অসতর্কতা।) অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ কেউ কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একটা দিক সামনে রেখে সতর্কতা অবলম্বন করতে চায় অথচ অন্য দিক বিবেচনায় সে নিজেই অসতর্কতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে টেরও পায় না।

আমি এই পুস্তকে শুধু আল্লাহ তাআলার ঐ দীনের মূলনীতি ঘোষণা করেছি, যার উপর আমি কায়েম আছি এবং তা সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্বও বটে। সর্বদিক বিবেচনা করে সতর্কতার হক আদায় করার চেষ্টা করেছি। (অর্থাৎ যেমনিভাবে কালিমা পড়ুয়া কোন ব্যক্তিকে কাফের বলা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, তেমনিভাবে দীন ও দীনের মূলনীতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করাও অত্যন্ত জরুরী। এমন যেন না হয় যে, কালিমা পড়ুয়া কোন ব্যক্তিকে কাফের প্রতিপন্ন হওয়া থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা দীনের বুনিয়াদ ও মূলভিত্তির ক্ষতি করে বসি। এমনটি করা তো প্রকাশ্য চাটুকারিতা এবং আল্লাহর দীনের সাথে গাদ্দারী। [আলহামদু লিল্লাহ] আমার নিয়ত এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাক ও পরিষ্কার।) যা কিছু আমি বলছি আল্লাহ তাআলা তার উপর সাক্ষী। আর তিনিই সকল অবস্থায় প্রশংসা ও গুণকীর্তনের উপযুক্ত।

দীনকে হেফাযত করা হক্কানী উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সেই সাথে ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহ মাদখাল কিতাবে যেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেটিও সামনে রাখতে হবে। সেই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عنه تحريفَ الغالِينَ، وانتحالَ المُبْطِلِينَ ، وتأويلَ الجاهلِينَ.

আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি নির্ভরযোগ্য জামাত বিদ্যমান থাকবে, যারা এই ইলম ও দীনের ধারকবাহক হবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের হস্তক্ষেপ এবং জাহেলদের অপব্যাখ্যা থেকে দীনকে মুক্ত রাখবে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিসৃত বাণী। (এগুলো আমাদের হক অবলম্বন, সত্যতা এবং দীনদারির জামানাত। কেননা, আমরা ঐ দায়িত্বই পালন করছি, যার ভবিষদ্বাণী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন।) আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

বড় বড় আলেমগণের কিতাব হতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কুড়ানো মুক্তা

কুফরী আকীদা, মন্তব্য ও কর্মের উপর চুপ থাকার বিধান

কুফরী আকীদা, মন্তব্য ও কর্মের উপর চুপ থাকা জায়েয নেই।

ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ "ফাইয়াসিলুত তাফরিকা" কিতাবের ১৪নং পৃষ্ঠায় বলেন, এ জাতীয় কুফরী কথা যদি দীনের বুনিয়াদী আকীদা ও মূলনীতির ব্যাপারে হয়, তাহলে যে ব্যক্তি কোন অকাট্য দলীল ছাড়া এ সব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে, তাকে কাফের আখ্যায়িত করা ফরয। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর পুনঃরায় স্বশরীরে জীবিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে অথবা বুঝশক্তি কম হওয়ার কারণে বা যুক্তিতে না ধরার কারণে নিজের ধারণার উপর ভিত্তি করে পরকালে শারীরিক শাস্তি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তাকে কাফের বলা নিশ্চিতভাবে ফরয।

ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাইয়াসিলুত তাফরিকা কিতাবের ১৬নং পৃষ্ঠায় বলেন, শরীয়তের প্রত্যেক এমন আকীদা বা হুকুম, যা তাওয়াতুরভাবে প্রমাণিত এবং নিঃশর্তভাবে তাতে কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, আর না এর বিপরীতে কোন দলীল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন আকীদা বা হুকুমের

বিরোধিতা করা প্রকাশ্যে দীন অস্বীকার করা। (এবং এই বিরোধিতাকারী অকাট্যরূপে কাফের।)

উক্ত কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, আরো একটি মূলনীতির ব্যাপারে অবগত করানো জরুরী মনে করছি। আর সেটি হচ্ছে অনেক সময় হকের বিরোধিতাকারী কোন অকাট্য নসেরও বিরোধিতা করে বসে। আর দাবি করে আমরা তো এই নস অস্বীকার করছি না, আমরা কেবল ব্যাখ্যা করছি। কিন্তু তারা তো এমন ব্যাখ্যা করে, আরবী ব্যাখ্যার সাথে যার কোনই সম্পর্ক নেই। এমনকি দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নেই। এ ধরনের বিরোধিতা নিশ্চিত কুফরী। বিরোধিতাকারী মিথ্যুক ও কাফের, যদিও সে নিজেকে তাবীলকারী মনে করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবীর শানে কটুকথা ও বেয়াদবী

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমি হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর কিতাব "আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল" থেকে চয়নকৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই মাসআলার ক্ষেত্রে উল্লেখ করব। হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এর ছিদ্রান্বেষণ এবং তাঁদেরকে হীন ও তুচ্ছ করা কুফরী। বরং সব চেয়ে বড় কুফরী।

হযরত ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ উক্ত কিতাবে এই মাসআলাটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কুরআন, হাদীস, এজমা ও কিয়াস থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণ দিয়ে কিতাবটি পরিপূর্ণ করে ফেলেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বাধিনতা ছিল যে, তিনি ইচ্ছে করলে তাঁকে গালমন্দ করে এমন প্রত্যেককে হত্যা করতে পারেন, ইচ্ছে করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে উভয় ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গালমন্দকারীকে হত্যা করা ফরয। অবশ্য তাকে তাওবা করানো ও না করানো এবং পার্থিব বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার এই তাওবা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হবে কি না- এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে উলামায়ে কিরামের মতভেদ

রয়েছে। (কিন্তু এমন ব্যক্তির কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এটিই ছিল পুরা কিতাবের সারাংশ।)

আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ১৯৫ ও ৪১৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন, হযরত হরব রহমাতুল্লাহি আলাইহ "মাসায়েলে হরব" এর মধ্যে হযরত লাইস ইবনে আবি সুলাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর সূত্রে হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে এক লোককে আনা হয়। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে কটুকথা বলেছিল। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর থেকে তিনি ফরমান জারি করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে কটুকথা বলবে বা বেয়াদবী করবে, তাকে হত্যা করে ফেলব।

হযরত লাইস রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ আমার নিকট হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে মুসলমান নবীগণের মধ্য হতে যে কাউকেই গালমন্দ করল সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অস্বীকার করল। তার এই কাজের কারণে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। বিধায় তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। আর যদি কোন যিম্মি অমুসলিম আল্লাহ তাআলা বা কোন নবীর শানে কটু কথা বলে বা কোন বেয়াদবি করে, তাহলে সে তার এই কর্মের কারণে জানমালের নিরাপত্তার চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে। বিধায় তাকে হত্যা করা হবে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই হাদীসের প্রথম অংশটিকে কানযুল উম্মালের ৬/২৯৪ পৃষ্ঠায় হযরত আমালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ হযরত আবুল হাসান ইবনে রামালা ইসপাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয় অংশটিকে ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে এটিকে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে এবং এমন ধারণার ভিত্তিতেই তাঁকে গালমন্দ করে যে, তিনি নবী নন। লক্ষ্য করে দেখুন, فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولَ اللهِ বাক্যটি একথারই প্রমাণ বহন করে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, অধিক সম্ভব এই যিম্মির কথা "তিনি নবী নন" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি আমাদের নবী নন। তাঁকে আমাদের হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়নি।

আস-সারিমুল কিতাবের ২৮৩ পৃষ্ঠায় হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে) ষষ্ঠ দলীল হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর উক্তি ও ফায়সালাসমূহ। এ সব উক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গালমন্দকারীর শাস্তি "হত্যা" নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ভাষ্য। উদাহরণস্বরূপ, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফরমান "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অথবা কোন নবীর শানে কটুকথা বলে বা গালমন্দ করে, তাকে হত্যা করে ফেল।" হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এই উক্তির মধ্যে এমন অপরাধির শাস্তি 'হত্যা করে দেওয়া' কেই নির্ধারণ করেছেন।

এমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফতোয়া "যেই যিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অথবা কোন নবীর শানে কটু কথা বলে বা গালমন্দ করে কিংবা প্রকাশ্যে বেয়াদবী করে, সে নিজেই তার চুক্তির ভিত্তিতে পাওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করেছে। বিধায় তাকে হত্যা করে ফেলো।" এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, যে ব্যক্তি কোন নবীর ব্যাপারে কটুকথা বলেছে বা গালমন্দ করেছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার ফতোয়া দিয়েছেন তা নির্ধারিত ফায়সালা হিসেবে দিয়েছেন।

এমনিভাবে আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দ করেছিল। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে মুহাজিরদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যদি তোমরা প্রথমে ফায়সালা না করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতাম ঐ মহিলাটিকে হত্যা করতে। কারণ, নবীগণের শানে বেয়াদবীকারীর শাস্তি সাধারণ শাস্তির মত নয়। তাই যে মুসলমান এই অপরাধে লিপ্ত হবে সে মুরতাদ। আর যে চুক্তিকারী অমুসলিম এই অপরাধে লিপ্ত হবে সে চুক্তি ভঙ্গকারী এবং যেন যুদ্ধে লিপ্ত। (তাই তার জান মাল উভয়টিই মুবাহ।)"

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, যা'দুল মা'আদ কিতাবে ফাতহে মক্কার বিধিবিধানের মধ্যে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরমানসমূহের মধ্যেও এই হুকুমই উল্লেখ আছে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ উক্ত কিতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় বলেন, অতএব জানা গেল যে, নবীগণের শানে গালমন্দ বা বেয়াদবি করা সমস্ত কুফরীর উৎস এবং সকল গোমরাহির ভিত্তি। যেভাবে নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন এবং দীন সত্যায়ন ঈমানের সকল শাখার মূল ও হেদায়াতের সমস্ত মাধ্যমের উৎস।

নবীর শানে অন্যের গালী বা বেয়াদবি বর্ণনা করার বিধান

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী কখনো গালমন্দ করার জন্য এই পদ্ধতিও অবলম্বন করে যে, নিজে গালি দেওয়ার পরিবর্তে অন্য লোকের দেওয়া গালিমন্দ বর্ণনা করে। এটি শুধু এক ধরনের প্রতারণা। এভাবে বলে সে নিজেকেও বাঁচাল আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে গালমন্দও খুব প্রচার প্রসার করল, প্রোপাগান্ডা চালাল। তার উদ্দেশ্যও পুরা হল। এটি মূলত পরোক্ষ কুফরী যা আর পরোক্ষ থাকল না। বরং তার যবান পরিচালনা এবং অন্তরের বিষ ঢেলে দেওয়ার দ্বারা প্রকাশ হয়ে গেল যে, এটি তারও মনের কথা। তার মনেও এই ব্যধি বিদ্যমান, যা তার দিল-দেমাগ, কলিজা-সীনা সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ উক্ত কিতাবের ২২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহের মধ্যে তালাশ করলে এ বিষয়টির অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, بَهْزُبْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ এর সনদে বর্ণিত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তার ভাই (যে কাফের ছিল) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে বলল, আমার পড়শী কে কোন অপরাধের কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে? (লোকটির বেয়াদবীমূলক আচরণ দেখে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তখন লোকটি বলতে লাগল, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি নিজে লোকদেরকে জুলম ও গোমরাহী থেকে নিষেধ করেন অথচ নিজেই সেই

জুলম করে থাকেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আমি এমনটি করে থাকি, তাহলে এর অনিষ্ট আমার উপরেই আসবে, তাদের উপর নয়। আর সাহাবাদেরকে বললেন, তার পড়শীকে রেখে দাও।

আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ সহীহ সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তো লক্ষ্য করে দেখুন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো এই ব্যক্তি লোকদের বলা অপবাদ বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অপমান করা এবং এ কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন ভাঙ্গা ও কষ্ট দেওয়া। (মন্তব্যকারীদের অপবাদের সংবাদ দেওয়া বা তা খণ্ডন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।)

মোটকথা, কাউকে গালি দেওয়ার এটিও একটি পদ্ধতি। (আরবী ভাষায় এটি কে 'তারীয' বলে, অর্থাৎ অন্যের উপর দিয়ে কথা চালিয়ে দেওয়া।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মুসানাদের আহমদের এক বর্ণনার শব্দসমূহ তো হচ্ছে তা যা উপরে ব্যক্ত করা হল। আরেক বর্ণনায় এই শব্দে এসেছে—

إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ

আপনি নিজে লোকদেরকে দুস্কৃতি ও ফেৎনা-ফাসাদ করতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই সেগুলো করে থাকেন। (এই বর্ণনায় غَيِّ এর স্থানে شر শব্দ এসেছে।)

কানযুল উম্মাল কিতাবের ৪/৪৬ পৃষ্ঠাতেও রেওয়ায়াতটি এই শব্দে উল্লেখ আছে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস্-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ২২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, আমাদের মাশায়েখদের অভিমত হচ্ছে আল্লাহ তাআলা অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইশারা-ইঙ্গিত বা তির্যকভাবে গালমন্দ করাও কুফরি এবং ধর্মত্যাগ। এটির শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড (যেমন স্পষ্ট ভাষায় গালমন্দ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন এবং এভাবে ইঙ্গিতে গালমন্দ করার ও কটুকথা বলার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

এমন ব্যক্তির মুরতাদ হওয়া এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এজমা বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৫৫৯ পৃষ্ঠায় এ কথাও বলেছেন যে, ইতিপূর্বে আমরা হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর সুস্পষ্ট কথা বর্ণনা করেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার শানে তির্যকভাবে কোন মন্দত্ব বর্ণনা করবে, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। চাই সে মুসলমানই হোক, আর কাফেরই হোক।

এমনিভাবে আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা বা তাঁর দীনের কিংবা তাঁর রাসূলের অথবা তাঁর কিতাবের কোন দোষ বলাবলি করবে, চাই সে স্পষ্ট ভাষায় বলুক আর ইঙ্গিতে বলুক উভয়টির হুকুম একই। (তাকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করা হবে। আর এটাই তারীয বা তির্যকভাবে দোষ বলার হুকুম।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ হযরত আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর এই কথাটি তার কিতাবের অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। (৫২৭, ৫৩৬, ৫৫০, ৫৬৩ এবং ৫৫৩ পৃষ্ঠায়) যাহোক, এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ, রাসূল, দীন, কিতাব এগুলো সম্পর্কে কোন প্রকার গালমন্দ ও কটুকথা বললেই কাফের হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড, চাই পরিষ্কার ভাষায় বলুক আর ইঙ্গিতেই বলুক।

এই মাসআলার ব্যাপারে হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতহুল বারী কিতাবের ১২/২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেন, হযরত ইমাম খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা বা তাঁর কোন নবীর শানে ইঙ্গিত বা তির্যকভাবেও বেয়াদবী করবে, আমার জানামতে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই।

কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ শিফা কিতাবে বলেন, ইবনে ইতাব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত হচ্ছে, কুরআন হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সামান্য কষ্ট দেওয়ার কিংবা তাঁর সম্মানহানী ও তুচ্ছ করার ইচ্ছা করবে, চাই স্পষ্টভাবে করুক বা ইঙ্গিতে করুক, তাকে হত্যা করে ফেলা ফরয।

এই শিফা নামক কিতাবে এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসীমুর রিয়াযের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, অন্যদের পক্ষে থেকে কটুবাক্য বা গালমন্দ ব্যক্তকারীর ব্যাপারে যদি এই দোষারূপ প্রমাণিত হয়ে যায় যে-

১. এ সব গালি স্বয়ং ঐ ব্যক্তিরই তৈরীকৃত। শুধু শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য অন্যের বাহানা দিচ্ছে।
২. অথবা ঐ ব্যক্তির অভ্যাস হচ্ছে বেশী বেশী বেয়াদবীমূলক কথা নিজ থেকেই বলে, কিন্তু দাবি করে, আমি অন্যের কথা বর্ণনা করছি মাত্র।
৩. অথবা অন্যের দিকে সম্বন্ধকৃত এই বেয়াদবীমূলক কথাগুলো বর্ণনা করার সময় তার অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সব কথা তার ভাল লাগছে এবং বেয়াদবীমূলক এরূপ কথা বলাকে সে কোন দোষের বিষয় মনে করছে না।
৪. অথবা সে এই প্রকার অপমানকর ও তাচ্ছিল্যমূলক কথার প্রতি আগ্রহী ও আসক্ত। সে এরূপ কথা বলাটাকে একেবারে সাধারণ বিষয় মনে করে এবং নিষিদ্ধ মনে করে না।
৫. অথবা সে এ জাতীয় বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বিশেষভাবে স্মরণ করে। (আর এটা তার প্রিয় কাজ।)
৬. অথবা সে এ জাতীয় কথাবার্তার তালাশে থাকে এবং সাধারণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে ব্যক্ত করা কবিতা ও গালমন্দের ঘটনা বলে বেড়ায়।

তাহলে এই সবগুলো সুরতে ঐ বর্ণনাকারীর জন্যও সেই হুকুমই হবে, যা নিজ থেকে কুৎসা বর্ণনাকারী ও গালমন্দকারীর হুকুম। অর্থাৎ অন্যের নামে বর্ণনা করলেও তাকে ধরা হবে এবং তাকেও এই অপরাধের কারণে গালমন্দকারীর ন্যায়েই শাস্তি দেওয়া হবে। এভাবে অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়ার দ্বারা তার কোন লাভ হবে না। তাকেও অতিদ্রুত হত্যা করে জাহান্নামে পৌছে দেওয়া হবে।

এই শিফা নামক কিতাবে এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসীমুর রিয়াযের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় হযরত কাজী ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দ ও কটুকথা বলার ৬ষ্ঠ সুরত হচ্ছে এই যে, ঐ গালমন্দকারী এই বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা অন্য লোক থেকে বর্ণনা করবে এবং অন্যের দিকে সম্বন্ধ করবে। এ সময় এই ব্যক্তির বর্ণনার ভঙ্গি ও

কথাবার্তর আলামতের প্রতি খেয়াল করা হবে। আর সেই ভিত্তিতেই হুকুম দেওয়া হবে। (অর্থাৎ, যদি আলামত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সে অন্যের নাম নিচ্ছে শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অথবা এরূপ বেয়াদবীমূলক কথা শুনে সে আনন্দ পাচ্ছে কিংবা এরূপ করা তার প্রিয় কাজ, তাহলে এই ব্যক্তিকেও গালমন্দ করার অপরাধী আখ্যায়িত করে হত্যা করা হবে। আর যদি যাচাই বাছাই করে এবং তার আলামত দেখে প্রমাণ হয় যে, বাস্তবেই এটি অন্যের ব্যক্ত করা কথা। এই ব্যক্তি শুধু এরূপ কথা অপছন্দ করার কারণেই বর্ণনা করেছে, তাহলে একে হত্যা করা হবে না। বরং অন্য কোন মানানশয়ী শাস্তি প্রদান করা হবে অথবা ভাল করে সতর্ক করে দেওয়া হবে।

সর্বসম্মত মত ও মাসআলা বর্ণনাকারী কতক মুসান্নিফ এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের এজমা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুর্নাম করে কবিতা লেখা, পড়া, বলে বেড়ানো এবং কোথায়ও এ ধরনের কবিতা পেলে সেগুলি নিঃশ্চিহ্ন না করে রেখে দেওয়া হারাম।

আবু উবায়দা কাসেম ইবনে সালাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুর্নাম করে বানানো কবিতার একটি চরণও পড়া ও মুখস্ত করা কুফরী।

তিনি আরো বলেন, এমন সব লোক যাদের দুর্নাম করে কবিতা বলা হয়েছে, আমার কিতাবগুলোতে তাদের নাম উল্লেখ না করে, এ নামের মত অন্য একটি নাম ইঙ্গিত স্বরূপ উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও যে সকল লোকের নাম রাখা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে -এমন লোকদের ব্যাপারে দুর্নাম করে যেসব কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলো লেখার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নামটি উল্লেখ না করে এর স্থানে উপযুক্ত অন্য একটি নাম রেখে নেই।)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর শানে মির্জা কাদিয়ানীর ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবী

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই অভিশপ্ত কাদিয়ানীর লেখার মধ্যে যেখানেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আলোচনা এসেছে, সেখানেই সে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে তার কলম লাগামহীনভাবে বিভিন্ন ধরনের

তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও দোষ লেখে গেছে। মনভরে তাঁকে গালি দিয়েছে। তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ছোট করতে কোন ত্রুটি করেনি। এভাবে মনের আক্রোশ পূর্ণরূপে প্রকাশ করার পর নিজেকে বাঁচানোর জন্য অল্প কয়েকটি কথা এমন বলেছে, এগুলো খ্রিস্টানদের আলোচনা অনুসারে লেখা হয়েছে। (অর্থাৎ সে বুঝাতে চেয়েছে, এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানকর কথা আমি নিজের থেকে বলছি না। বরং খ্রিস্টানরাই এগুলো বলে এবং তাদের কিতাবে এগুলো লেখা আছে।) অথচ মির্জা কাদিয়ানীর আলোচনার ধারাবাহিকতায় এগুলোও এসেছে যে, আসল কথা হচ্ছে হযরত ঈসা মাসীহ থেকে কোন মুজেযাই প্রকাশ পায়নি। তার তো কেবল কিছু ভেল্কিবাজি ছিল। সে এও বলেছে যে, ঈসার দুর্ভাগ্যের কারণে সেখানে একটি হাউয ছিল। এটি থেকে লোকেরা পানি নিত। তার এই কথাগুলি সেই লেখাগুলির সমর্থন ও সত্যয়ন করে। বিশেষ করে তার এই কথাটি "ঈসার থেকে কোন মুজেযাই প্রকাশ পায়নি" তার সত্যয়নকে আরো সুদৃঢ় করেছে এবং এটিই যে তার গবেষণার ফল তা প্রকাশ করেছে।

এই প্রতারণা ও ধোকাবাজির পরও এই মরদুদের অনুগামীরা বলে, মির্জা কাদিয়ানী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর শানে কোন বেয়াদবী করেনি। তিনি তো এগুলো খ্রিস্টানদের কথা খণ্ডন এবং তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য লেখেছেন। এগুলো তো তিনি তাদের কিতাব থেকে অনুলিপি করেছেন। (আর কুফরীর অনুলিপি করা কুফরী নয়।)

অথচ হক্কানী উলামায়ে কিরাম খ্রিস্টানদের মন্তব্য ও মতাদর্শের খণ্ডন তো এভাবে শুরু করেন যে, "খ্রিস্টানদের আসমানী কিতাবগুলোকে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃত করে ফেলেছে। কেননা, তাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে এমন এমন কথা লেখা হয়েছে, যা নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী ও নিশ্চিত ভুল।"

তার বিপরীতে এই বেদীন বদবখত আলোচনা শুরু করেছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর দুর্নাম দিয়ে। সে তাদের মন্তব্যগুলোকে আরো বাড়িয়ে কঠিনভাবে প্রচারপ্রসার করেছে ও প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে। এ কাজে নিজের কলমের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে দিয়েছে। এই ধোকাবাজি রোগটি তার মরদুদ অনুসারীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। তারাও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর দুর্নাম ও হেয়প্রতিপন্ন করে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক

লেখেছে। তারপর সেটি শুধু খ্রিস্টানই নয় মুসলমানদের মাঝেও খুব প্রচার করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর মাহাত্ম্য এবং তাঁর আগমনের প্রতি আগ্রহ ও অপেক্ষা মুসলমানদের দিল থেকে বের করে দেওয়া এবং এই বেয়াদব অভিশপ্তকেই "হযরত ঈসা আ." বলে মেনে নেওয়ানো। অথচ হক্কানী উলামায়ে কিরাম সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, নবীগণের শানে বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা (গালমন্দ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে না থাকলেও তা) কুফরী এবং এর দ্বারা সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আর এমনটি কোন মুমিনের ক্ষেত্রে হওয়া দুষ্কর ও দুর্বোধ্য বিষয়।

اَللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর পক্ষ থেকে কয়েকটি কসীদা[৮৪]

اَلَا يَا عِبَادَ اللهِ قُوْمُوْا وَ قَوِّمُوْا * خُطُوْبًا اَلَمَّتْ ما لَهُنَّ يَدانِ

শোন হে আল্লাহর বান্দাগণ! দাঁড়িয়ে যাও এবং সে সব ফেতনার মোকাবেলা করো, যেগুলো ধর্মে ছেয়ে গেছে এবং ব্যাপকতা লাভ করেছে।

وَقَدْ كَادَ يَنْقَضُ الْهُدَي ومَنَارُه * وَزَحْزَحَ خَيْرٌ ما لِذالكَ تَدانِ

অচিরেই এ সব ফেতনার আক্রমনে হেদায়াতের অট্টালিকা ও তার আলোর মিনার ধ্বংস হয়ে যাবে। কল্যাণ ও সংশোধনের ভিত হেলে যাবে, যা পরবর্তীতে আর ঠিক করা যাবে না।

يُسَبُّ رَسُوْلٌ من اُولِي الْعَزْمِ فِيْكُمْ * فَكَادَ السَّماءُ وَالْاَرْضُ تَنْفَطِرانِ

মহামান্বিত নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে তোমাদের সামনে গালি দেওয়া হচ্ছে (অথচ তোমাদের টনক নড়ছে না।) সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন আসমান জমীন ফেটে যাবে।

وَطَهِّرَهُ مِنْ اَهْلِ كُفْرٍ وَلِيُّهُ * وَاَبْقَى لِنَارٍ بَعْضَ كُفْرِ اَمَانِىِّ

---

৮৪. হযরত মুসান্নিফ রহ. এই কাসীদার নাম দিয়েছেন صدع النقاب عن جساسة الفنجاب

অথচ ঐ নবীর মাওলা মহান আল্লাহ পাক তাঁকে দুশমন ও কুৎসা রটনাকারী কাফেরদের অপবাদ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। শুধু প্রবত্তিপূজারি কাফেরদের জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছেন।

وَحَارَبَ قَوْمٌ رَبَّهُمْ وَنَبِيَّهُ * فَقُوْمُوْا لِنَصْرِ اللهِ إِذْ هُوَ دَانِ

এক সম্প্রদায় নিজেদের প্রভু ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্যের উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে যাও। কারণ আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

وقد عِيْلَ صَبْرِيْ فِى اِنْتِهَاكِ حُدُوْدِهٖ * فَهَلْ ثَمَّ دَاعٍ مُجِيْبٌ اَذَانِى

আল্লাহ তাআলার হদসমূহের অপমান দেখে আমার ধৈর্যের আচল ছেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে আছে কি এমন কেউ, যে দীন রক্ষার্থে দাওয়াত দিবে এবং আমার ডাকে সাড়া দিবে?

واذْ عَزَّ خطبٌ جِئْتُ مُسْتَصْرِخًا بِكُمْ * فَهَلْ ثَمَّ غَوْثٌ يَا لَقَومِ يُدانِى

যখন বিপদ চুড়ান্ত পর্যায় পৌছে গেছে তখন আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। সুতরাং হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে আছে কি কোন সাহায্যকারী যে আমার নিকট এসে আমাকে সঙ্গ দিবে?

لَعُمْرِى لَقَدْ نَبَّهْتُ مَنْ كَانَ نَائِمًا * وَاَسْمَعْتُ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُذُنَانِ

আমার জীবনের কসম! আমি তো ঘোমন্তদেরকে জাগ্রত করছি এবং যাদের শ্রবণ করার মত কান আছে, তাদেরকে এই ব্যথাভরা আহ্বান শুনিয়ে যাচ্ছি।

وَنَادَيْتُ قَوْمًا فِى فَرِيْضَةِ رَبِّهِمْ * فَهَلْ مِنْ نَصِيْرٍ لِى مِنْ اَهْلِ زَمَانِ

আমি তো অনবগত সম্প্রদায়কে তাদের প্রভুর ফরয করে দেওয়া দায়িত্ব স্মরণ করে দেওয়ার জন্য ডাকছি। সুতরাং এই যমানার লোকদের মাঝে আছে কি কোন সাহায্যকারী?

دَعُوْا كُلَّ اَمْرٍ وَ اسْتَقِيْمُوْا لِمَا دُهِي * وَقَدْ عَادَ فَرْضُ الْعَيْنِ عِنْدَ عَيَانِ

সকল কাজ ছেড়ে দাও এবং বিপদের যে পাহাড় পড়েছে তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হও। কেননা, এই ফেতনার মোকাবেলা করা বিবেকবান ব্যক্তিদের মতে ফরয হয়ে গেছে।

فَشَانِئُ شَانِ الْأَنْبِيَاءِ مُكَفَّرٌ * وَمَنْ شَكَّ قُلْ هٰذَا لِأَوَّلِ ثَانٍ

কেননা, নবীগণের শানে বেয়াদবিকারী অকাট্যরূপে কাফের। আর যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে এই প্রথম কাফেরের ভাই দ্বিতীয় কাফের।

وَلَيْسَ مَدَارًا فِيهِ تَبْدِيلُ مِلَّةٍ * وَتُحْبَطُ أَعْمَالُ الَّذِي مَحَانِي

ধর্ম পরিবর্তনের ইচ্ছার উপর কাফের আখ্যায়িত করার মূলভিত্তি নয়। কেননা, কোন এক নবীকে গালিদাতার সকল আমল তার এই গালি বিনষ্ট করে দিয়েছে।

أَفِي ذِكْرِهِ عِيسَى يَطِيشُ لِسَانُهُ * وَلَا يَبْصُرُ الْمَرْمَى مِنَ الْخَيْمَانِ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আলোচনার ক্ষেত্রে কি তার যবান বের হয়ে যায় এবং সে এমন অন্ধ হয়ে যায় যে, তীরের লক্ষ্যস্থল এবং তার অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না?

وَأَكْفَرُ مِنْهُ مَنْ تَنَبَّأَ كَاذِبًا * وَكَانَ انْتَهَتْ مَا أَمْكَنَتْ بِمَكَانِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালিদাতা থেকেও বড় কাফের হচ্ছে ঐ মিথ্যুক, যে নিজেকে নবী দাবি করে। অথচ নবুওয়াত তার প্রান্তসীমায় পৌছে খতম হয়ে গেছে।

وَمَنْ ذَبَّ عَنْهُ أَوْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ * يُكَفَّرُ قَطْعًا لَيْسَ فِيهِ تَوَانِي

আর যে নবুওয়াতের এই দাবিদারের পক্ষ অবলম্বন করবে অথবা তার কথার কোন ব্যাখ্যা দিবে সেও অকাট্যরূপে কাফের। এই হুকুমের ব্যাপারে কোন ইতস্ততা ও দ্বিধাবোধ করা যাবে না।

كَأَنِّي بِكُمْ قَدْ قُلْتُمُوا لِمَ كُفْرُهُ * فَهَاكُمْ نُقُولًا جُلِّيَتْ لِمُعَانِ

কেমন যেন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ যে, সে কাফের কেন? তাই নাও, আমি তোমাদের সামনে এমন সব দলীল পেশ করছি, যা দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

فَمَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ حَمَا مِثْلَ ذٰلِكُمْ * مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ أَهْلُ هَوَانٍ

সুতরাং ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের কী খেয়াল ও মন্তব্য, যে মুসাইলামাতুল কায্যাবকে রক্ষা করার জন্য পক্ষ অবলম্বন করে, যেমনটি তোমরা এই ব্যক্তির ব্যাপারে করছ?

فَقَالَ لَهُ التَّأْوِيْلُ أَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ * نَبِيًّا هُوَ الْمَهْدِي لَيْسَ بِجَانٍ

আর বলে যে, মুসাইলামার নবুওয়াতের দাবির তো ব্যাখ্যা হতে পারে। অথবা বলে, মুসাইলামা নবী নয়, সে তো মাহদী ছিল। বিধায় সে কোন অপরাধী নয়।

وَهَلْ ثَمَّ فَرْقٌ يَسْتَطِيعُ مُكَابِرٌ * وَحَيْثُ ادَّعَى فَلْيَأْتِنَا بِبَيَانٍ

আছে কি কোন জোর প্রয়োগকারী যে এই দুইটির মাঝে পার্থক্য করে দেখাতে পারবে? যদি কেউ এ দুটির মাঝে পার্থক্য থাকার দাবি করে, তাহলে সে যেন আমাদের সামনে দলীল পেশ করে।

وَكَانَ عَلَى إِحْدَائِهِ وَجْهُ كُفْرِهِ * نَبَأُهُ مَشْهُورٌ كُلَّ مَكَانٍ

অথচ তার নবুওয়াতী দাবি করাই তাকে কাফের আখ্যায়িত করার কারণ ছিল, প্রতিটি যুগে এটাই প্রসিদ্ধ।

كَذَا فِي أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ * تَوَاتُرُ فِيمَا دَانَهُ الثَّقَلَانِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহ দ্বারাও এটিই প্রমাণিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর মুতাওয়াতিরভাবেও এটিই প্রমাণিত, যা জিন-ইনসান সকলেই দলীল মানে।

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَقَدْ وُجُوهٌ لِكُفْرِهِ * فَأَشْهَرُهَا دَعْوَاهُ تِلْكَ كَمَانِي

মুসাইলামার কাফের হওয়ার অন্য কোন কারণ থাকুক চাই না থাকুক, এখন তো বিশ্ববাসীর নিকট ছড়িয়ে পড়েছে যে, তার কুফরির কারণ হচ্ছে 'মানী'এর মত নবুওয়াত দাবি করা। (অর্থাৎ পুরা বিশ্ববাসী যেমন জানে ও মানে যে, ইরানের 'মানী'এর কাফের হওয়ার কারণ হচ্ছে তার নবুওয়াত দাবি করা, এমনিভাবে মুসাইলামা কাযযাবের কাফের হওয়ার কারণও হচ্ছে নবুওয়াত দাবি করা।)

وَ أَوَّلُ إِجْمَاعٍ تَحَقَّقَ عِنْدَنَا * لَفِيهِ بِإِكْفَارٍ وَ سَبْيِ غَوَانِي

আর আমাদের গবেষণা অনুসারে মুসাইলামা কাযযাবকে কাফের আখ্যায়িত করা এবং তার সমর্থক ও সহযোগীদেরকে বন্দি করার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম এজমা সংঘটিত হয়েছে ।

وكَانَ مُقِرًّا بِالنُّبُوَّةِ مُعْلِنًا * لِخَيْرِ الْوَرَى فِى قَوْلِهِ وَاَذَانِ

অথচ মুসাইলামাও সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত স্বীকার করত এবং তার সাধারণ কথাবার্তায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার ও তার আযানে ঘোষণাও করত ।

وما قَوْلُكُمْ فِى الْعِيْسَوِيَّةِ اَوَّلُوْا * رَسولًا لِاُمِّيِّيْنَ خَيْرَ كِيَانِ

এবং ঐ খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাদের কী ফতোয়া, যারা এই তাবীল করে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগৎ শ্রেষ্ঠ বটে, তবে শুধু আরবের লোকদের জন্য? (পুরা বিশ্ববাসীর জন্য নয় ।)

وَهَلْ ثَمَّ مَا لَا فِيْهِ تَأْوِيْلُ مُلْحِدٍ * وَمَنْ حَجَرَ التَّأْوِيْلَ رَمْيَ لِسَانِ

পৃথিবীতে কি এমন কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ আছে, যেটাকে কোন না কোন পথভ্রষ্ট তাবীল [অপব্যাখ্যা] করেনি? তাবীলের গোস্তাখী কে রুখতে পারবে? (তাবীলকারীর যবান কে বন্ধ করতে পারবে?)

وهَلْ فِى ضَرُوْرِيَاتِ دِيْنِس تَأَوُّلٌ * يُحَرِّفُهَا الاَّ كَكُفْرٍ عِيَانِ

দীনের স্বতসিদ্ধ বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা যা বিকৃতির নামান্তর, তা কি প্রকাশ্য কুফরের মত নয়?

وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مُنْكِرِيْهَا فَاِنَّهُ * يَجُرُّ لَهُ الْاِنْكَارَ يَسْتَوِيَانِ

আর যে ব্যক্তি দীনের স্বতসিদ্ধ বিষয় অস্বীকারকারীকে কাফের না বলে, সে এই অস্বীকারকে নিজেই মেনে নিয়েছে । তাই কোনরূপ ব্যবধান ছাড়া সেও তার মত কাফের ।

وَمَا الدِّيْنُ اِلَّا بَيْعَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ * وَمَا هُوَ كَالْاَنْسَابِ فِي السَّرَيَانِ

প্রকৃতপক্ষে দীন তো হচ্ছে একটি পরোক্ষ বায়াত (বা অঙ্গীকার) । (যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই বায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ

পর্যন্ত দীনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর যখনই এই বায়াত ভঙ্গ করে ফেলবে, তখন সে দীন থেকে বের হয়ে যাবে।) দীন বংশের ন্যায় কোন প্রজন্মগত সম্পর্ক নয় যে, সব সময়ই ঠিক থাকবে। (এবং এমন নয় যে, মুসলমানের সন্তান যে কাজই করুক, সে মুসলমানই থাকবে।)

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ قَائِلُهَا * وَلَكِنْ بِآيَاتٍ مَالَ مَعَانِى

(যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে) فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ এই আয়াত পড়ে নাও। এখানে বলা হয়েছে হে নবী! তারা তো আপনাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে না; প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার আয়াত ও বিধিবিধান অস্বীকার করে। (বিধায় এরাও কাফের ও জাহান্নামী।)

(প্রকাশ থাকে যে, এই শের বা কবিতাটি নির্ভর করে ঐ কেরাআতের উপর, যার মধ্যে يُكْذِبُوْنَكَ এসেছে, যা اَكْذَبه اى نسبه الى الكذب (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) থেকে নেওয়া হয়েছে।)

تَنَبَّأَ اَن لَّا يَمْتَرِىَ بِبَطَالَةٍ * كَحَجَّامِ سَابَاطٍ صَرِيْعُ عَوَانِ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কেবল এজন্য নবুওয়াতি দাবি করেছে যেন কেউ তাকে বাতিল ও বেকার সন্দেহ না করে। (অর্থাৎ মির্জা কাদিয়ানী তার সকল অপকর্ম ও দুষ্কৃতি ঢাকার জন্য নবুওয়াতের দাবি করেছে। কেননা নবীদেরকে মানুষ নিষ্পাপ মনে করে) যেমন সাবাত শহরের এক ক্ষৌরকারক তার মায়ের পায়ে শিংগা লাগাতো যাতে করে কেউ তাকে বেকার আছে বলে মনে না করে।

وَمُعْجِزُهُ مَنْكُوْحَةٌ فَلَكِيَّةٌ * يُصَادِقُهَا فِى رُقْيَةِ الْكَرْوَانِ

তাই সে নিজের স্ত্রীকে আসমানী বিবাহিত এবং মুজেযা দাবি করেছে। যাতে করে স্ত্রীকে কারিওয়ানের মন্ত্র দিয়ে অনুগত করে নিতে পারে। (অর্থাৎ যেমনিভাবে আরবের লোকেরা اُطْرُق كَرَى اطرق كرى اِنَّ النَّعَامَةَ فِى الْقُرى -এই মন্ত্র পড়ে অতি সহজে রাজহাস শিকার করে নিত, তেমনিভাবে গোলাম কাদিয়ানীও মুহাম্মাদী বেগমকে আসমানী বিবাহিত ও নিজের নবুওয়াতের

মুজেযা সাব্যস্ত করে তার কামনার ফাঁদে আটকাতে চেয়ে ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ঐ নেককার মহিলা এবং তার পিতামাতাও মির্জার মরণফাঁদে পা দেয়নি। পরিশেষে এই স্ত্রীর বিচ্ছেদের বিরহবেদনা অন্তরে নিয়ে জাহান্নামে পৌছেছে সে।)

وَمَنّى لَهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا بِوَحْيِهِ * رِفَاءً و وَصْلًا خِطْبَةً وَتَهَانِي

এদিকে শয়তান তাকে শয়তানী ওহীর মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব, মিলন এবং সুখী জীবন যাপনের মিথ্যা আশ্বাস ও মোবারকবাদ দিয়েছে। (অর্থাৎ মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তার কাছে অনেকগুলো ওহী নাযিল হয়ে ছিল। কিন্তু সেই ওহীগুলো ছিল শয়তানী ওহী। তাই সেগুলি বাস্তবায়িত হয়নি; সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।)

يَهُمّ بِأَمْرِ الْعَيْشِ لَوْ يَسْتَطِيْعُهُ * وقد حِيْلَ بَيْنَ الْعِيْرِ وَ النَّزَوَانِ

তার তো উদ্দেশ্য ছিল যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে নিয়ে আনন্দ-উল্লাস ও কামনা-বাসনা পূরণ করবে। কিন্তু জঙ্গলী গাধাকে সঙ্গম থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। (মুহাম্মদী বেগম এই মির্জা কাদিয়ানীর স্ত্রী হতে অস্বীকার করে মির্জার কামনা-বাসনা পূরণের প্রস্তাবের উপর পানি ঢেলে দিয়েছে।)

فَفَضَحَهُ رَبُّ السَّمَاءِ بِحَوْلِهِ * و قُوَّتِهِ وَاللهُ فِيْهِ كَفَانِي

আর আল্লাহ তাআলা এমনটি করে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে মিথ্যে নবুওয়াতের এই দাবিদারকে আচ্ছারকম লাঞ্ছিত করেছেন এবং তাকে মিথ্যুক প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। (অর্থাৎ কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করার কষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। স্বয়ং মির্জার মুখের ভবিষ্যৎবাণীই তাকে মিথ্যাবাদি প্রমাণিত করেছে)

وَكَانَ ادَّعَى وَحْيًا سِنِيْنَ عَدِيْدَةً * فَجَاءَ يُحَاكِي فِعْلَةَ الظَّرْبَانِ

এই মিথ্যুক কয়েক বছর যাবৎ ওহী নাযিল হওয়ার মিথ্যা দাবি করছিল এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণীর মত তার দুর্গন্ধ (মিথ্যা ওহী) দিয়ে

মুসলমানদের মাথা পেরেশান করে রেখেছিল। (যরবান হচ্ছে দুর্গন্ধময় একটি প্রাণী, যা দেখতে বিড়াল সদৃশ।)

وَدَلَّاهُ شَيْطَانَاهُ فِى ذَاكَ بُرْهَةً * وَلَمْ يَدْرِ شَيْطَانَانِ لَا يَفِيَانِ

তার উভয় শয়তান তাকে সুদীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত তাকে এই ধোকা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে লটকিয়ে রেখেছে যে, এগুলো হচ্ছে ওহী। কিন্তু এই নির্বোধ বুঝতেই পারেনি যে, এই বিশাল গোমরাহির প্রচার প্রসারের জন্য এই দুই শয়তান যথেষ্ট নয়। (এই শয়তানদ্বয় হচ্ছে খলীফা নুরুদ্দীন ও হাকীম আহমদ হাসান আমরুহী। তারা মির্জার শয়তানী ওহীর লেখক ছিল।)

وَاخِرًا وَ هَذَا بِذُرِّيَّتِهِ يُرَى * فَهَلَّا عَرَى أَصْلَ النُّبُوَّةِ دَانِسٌ

এই দুই শয়তান তো পর্দার আড়ালে থেকেছে আর মির্জা ও তার সন্তানদেরকে সম্মুখে অগ্রসর করে দিয়েছে। (এবং নবুওয়াতের দাবিদার বানিয়েছে।) যদি সাহস থাকতো তাহলে নিজেরা কেন নবুওয়াতের দাবি করে সামনে আসেনি?)

وَآتْهَمُ لَمَّا لَمْ يَمُتْ بِشُرُوْطٍ * رُجُوعًا إِلَى الْحَقِّ ادَّعَى بِرِهَانٍ

আর যখন খ্রিস্টান পাদ্রি আতহাম মির্জা কাদিয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মৃত্যুবরণ করেনি, তখন সে তার ব্যাপারে "সঠিক পথে ফিরে আসার" শর্ত জুড়ে দেয়। (অর্থাৎ তখন বলতে থাকে, আমি শর্তারোপ করেছিলাম যে, যদি সে হক পথ তথা আমার নবুওয়াত স্বীকার না করে তাহলে মারা যাবে। কিন্তু সে যেহেতু আমার নবুওয়াত স্বীকার করে নিয়েছে তাই মারা যায়নি।)

وَسَمَّاهُ أَيْضًا مَرَّةً بِسُقُوْطِهِ * لِهَاوِيَةٍ هَلْ ذَانِ يَجْتَمِعَانِ

অথচ সে একবার ঐ পাদ্রির জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ারও নাম নিয়েছিল। (এবং জাহান্নামে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল।) পরস্পর বিপরীত এই দুই ভবিষদ্বাণী কখনো কি একত্র হতে পারে? (অর্থাৎ একদিকে সে পাদ্রিকে কাফের হওয়ার এবং জাহান্নামে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, অপর দিকে হক মেনে নেওয়ার এবং তার নবুওয়াতের উপর ঈমান আনার কারণে তাকে মৃত্যু থেকে বেঁচে

যাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। ভিন্ন কথায় বলা যায়, তার এক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই পাদ্রি কাফের ও জাহান্নামী। আর অপর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে মুমিন ও মুক্তিপ্রাপ্ত। এটি সুস্পষ্ট পরস্পর বিপরীত দুটি বিষয়। বিধায় নিশ্চিতভাবে এদুটির মধ্য হতে কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই মিথ্যে। লোকেরা সত্যই বলেছেন, "মিথ্যের কোন পা থাকে না।"

يُحَصُّ بِأَفْوَاهِ الشَّيَاطِيْنِ حَيْقَةً * وَيَصْرِفُهُمْ عَنْ صَوْبٍ فَهُمْ مَبَانِى

শয়তান তথা তার মুরীদদের যবানের মাধ্যমে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে অথচ তাদেরকে প্রকৃত বিষয়টি বোঝা থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

فَعَلَّلَ أَذْنَابٌ لَهُ النَّاسُ أَنَّ فِى * حُدَيْبِيَّةٍ مَا نَحْوَهَا يُرْيَانِ

মির্জার লেজগুলো অর্থাৎ তার অনুসারীরা লোকদেরকে এভাবে ধোকা দিয়েছে যে, দেখুন, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও এরূপ বিপরীতমুখী দুটি স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। (অর্থাৎ আতহামের ব্যাপারে মির্জার স্বপ্ন সঠিক না হওয়ায় লোকেরা তাকে ও তার অনুসারীদেরকে প্রশ্ন করেছিল, তখন তারা এই জবাব দিয়ে ছিল যে, দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ৬ষ্ঠ হিজরী হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর স্বপ্নে দেখে ছিলেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে পুরোপুরি নিরাপদে মক্কার সব জায়গায় যাচ্ছেন এবং উমরা করছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই স্বপ্ন পুরা হয়নি। তাই তিনি এবং সকল সাহাবী উমরা না করেই হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসেন। বিধায় স্বপ্ন পুরা না হওয়া নবুওয়াত পরিপন্থী নয়। মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ সামনের শেরে তাদের কথার জবাব দিচ্ছেন।)

أَرُؤْيَا حَكَاهَا خَاتَمُ الرُّسُلِ مُرْسَلٌ * وَلَمْ يَكُ مِنْحَا السِّرِّ يَلْتَبِسَانِ

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বপ্নের কথা বলেছেন, সেটি কি বাস্তবায়িত হয়নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনাকৃত স্বপ্ন এবং তার বাস্তব ঘটনা একটি অপরটির সাথে কি মিলেনি? (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন কি পুরা হয়নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পরবর্তী বছর তথা সপ্তম হিজরীতে মুসলমানদেরকে নিয়ে নিরাপদে ও প্রশান্তভাবে উমরা করেননি? এই লোকগুলি ভুল বুঝেছে ছিল। তারা মনে করেছিল ৬ষ্ঠ হিজরীতেই উমরা হবে। অথচ স্বপ্নের মধ্যে এ কথার কোন উল্লেখ নেই, আর না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ বছরই স্বপ্ন পূরণ হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সহীহ বোখারী:১/৩৮০) তাই তো আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়েই এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য সূরা ফাতাহ এর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন-

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। অবশ্যই তোমরা পূর্ণ নিরাপদে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। (এবং উমরা করবে। উমরা থেকে অবসর হয়ে) কিছু লোক নিজেদের মাথা মুণ্ডণ করবে এবং কিছু লোক চুল ছোট করবে। এ সময় তোমাদের কোন ভয় থাকবে না।

وَمَا قَدْ حَكَاهُ الْوَاقِدِيُّ فَلَمْ يُرِدْ * تَرَتُّبَ سَيْرًا وَبِدَاءِ اَوَانْ

ওয়াকেদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ জীবনীতে যা বয়ান করেছেন, তাতে ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা অথবা জীবনের সময়ের সূচনা বর্ণনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

حَكَى مِنْ اُمُوْرٍ لَا تَرَتُّبَ بَيْنَهَا * قَدِ اتَّفَقَتْ فِى الْمُبِيْنِ مِنْ جِرْيَانْ

ওয়াকেদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তো ঐ বছর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে বর্ণনা করেননি। নিশ্চিতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরীর ৬ষ্ঠ বর্ষে এই স্বপ্ন দেখে ছিলেন। (কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্বপ্নটি এই বছরের সাথেই সম্পৃক্ত। যেমন বক্ষমান আয়াতে "ইনশা আল্লাহ" শব্দটি এসেছে। অতএব ওয়াকেদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর বর্ণনা দ্বারা এই দলীল দেওয়া যে, "দেখো রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নও বাস্তাবায়িত হয়নি" এটি ঠিক নয়। কেননা, ওয়াকেদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ তো এ কথা বলেনি যে, এই স্বপ্ন এ বছরের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল। মির্জা কাদিয়ানী ওয়াকেদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর বয়ান দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ছিল। হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ দুটি শেরের মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে দিলেন।)

وَأَوْضَحَهُ الصِّدِّيْقُ فِيْمَا رَوَى لَنَا * أَصَحّ كِتَابٍ فِي الْحَدِيْثِ مَثَانِي

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়টির মৌলিকতা একটি হাদীসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাদীসটি কুরআনের পর সবচেয়ে সহীহ্ কিতাব অর্থাৎ সহীহ্ বোখারী শরীফের ১/৩৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

رَجَاءٌ وَ قَصْدٌ لَيْسَ إِخْبَارُ غَيْبِهِ * عَلَى ظَاهِرِ الْأَسْبَابِ يَعْتَمِدَانِ

মূলত এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যাশা ও বাহ্যিক উপকরণের ভিত্তিতে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করা। এটি দ্বারা গায়েবের সংবাদ দেওয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী করা উদ্দেশ্য ছিল না। (তার বিপরীতে মির্জা কাদিয়ানী তো চ্যালেঞ্জ করে বলে ছিল যে, আতহাম এ বছর অবশ্যই মারা যাবে। কারণ আমাকে এই স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। বিধায় তার স্বপ্নকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নের সাথে তুলনা করা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা।)

وَمَا ذَابَ فِي الْعُمْرِ الطَّوِيْلِ لَهُ فَدَا * هِجَاءُ خِيَارِ الْخَلْقِ غِبٌّ لِعَانِ

এবং এই নবুওয়াত দাবিকারী কাদিয়ানীর যবান ও কলম থেকে তার দীর্ঘজীবনে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার পর আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এর দুর্নাম ও কুৎসা বর্ণনা করা।

تَفَكُّهُ فِي عِرْضِ النَّبِيِّيْنَ كَافِرٌ * عُتُلٌ زَنِيْمٌ كَانَ حَقَّ مُهَانِ

নবীগণের মানসম্মান নিয়ে এক বেয়াদব, দুর্ভাগা, কম্বখত, কাফের খুব হাসিতামাসা করে।

يَلَذُّ لَهُ بَسْطٌ لِمَطَاعِنٍ فِيهِمْ * وَيَجْعَلُ نَقْلًا عَنْ لِسَانِ فُلَانٍ

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে তার খুব মজা লাগে। (আর কাফের ফতোয়া থেকে বাঁচার জন্য) নিজের মনের কথা অন্যের বয়ান বানিয়ে দেয়। (যে, অমুক ব্যক্তি এমন বলেছে।)

يَصُوْغُ اِصْطِلَاحًا اِنَّ هَذَا مَسِيْحُكُمْ * كَمَا سَبَّ اُمًّا هَكَذَا اَخَوَانِ

পরিভাষা কায়েম করে এবং খুব ধমক দিয়ে সে বলে, (হে খ্রিস্টান দল!) তোমাদের ঈসা আলাইহিস সালাম এর বিষয়টি ঠিক এমন যেন আপন দুই ভাই, একজন অপর জনের মাকে গালি দিচ্ছে। (অথচ উভয়ের মা একজনই। তাই তারা উভয়েই যেন নিজের মাকেই গালি দিচ্ছে। এমনিভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেমন খ্রিস্টানদের নবী, তেমনিভাবে মুসলমানগণও তাঁকে আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসূল মানেন। কাজেই খ্রিস্টানদের ঈসা আলাইহিস সালাম কে গালি দেওয়া কুরআনের ঈসা আলাইহিস সালাম কেই গালি দেওয়ার নামান্তর এবং কুফরী।)

قَدْ رُدَّ فِى الْقُرْآنِ اَنْوَاعُ كُفْرِهِمْ * فَهَلْ غُضَّ مِنْ عِيْسَى الْمَسِيْحِ بِشَانٍ

অথচ কুরআনে করীমের মধ্যেও খ্রিস্টানদের সব ধরনের কুফরী মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে খণ্ডন করতে গিয়ে কি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সামান্যতম মানহানী করা হয়েছে? (কাজেই বুঝাগেল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সামান্যতম মানহানী করা ছাড়াই খ্রিস্টানদের কুফরী মতবাদ খণ্ডন করা সম্ভব। মির্জা কাদিয়ানী যেটা বলেছে সেটা তো শুধু তার বাহানা ছিল। মূলত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে গালমন্দ ও তাচ্ছিল্য করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। যাতে নিজে ঈসা হওয়ার পথ সুগম হয়।)

وَهَذَا كَمَنْ وَافَى عَدُوًّا يَسُبُّهُ * بِجَمْعٍ اَشَدَّ السَّبِّ مِنْ شَنَآنٍ

তার অবস্থা তো হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন দুশমনের সামনে চলে আসার পর অত্যাধিক ক্রোধের কারণে জনসাধারণের সামনেই লাগামহীনভাবে গালীগালাজ করা শুরু করে দিল।

قَصِيْرَةُ رُؤْيَا وَقَالَ بِاَنَّهُ * اِذَا انْفَتَحَتْ عَيْنِىَّ مِنَ الْخَفَقَانِ

এবং (মন ভরে গালি দেওয়ার পর) বলে দিল এটি আমার স্বপ্ন ছিল। অবশেষে অধিক নড়চড়া করার কারণে হঠাৎ আমার চোখ খোলে যায়। (আমি এতক্ষণ যাবৎ আমার স্বপ্নের অবস্থাই বর্ণনা করছিলাম।)

وَقَدْ يَجْعَلُهُ التَّحْقِيْقُ ذَلِكَ عِنْدَهُ * إِذَا مَا خَلَا جَوٌّ كَمَثَلِ جَبَانِ

আর কাপুরুষদের মত যখন মাঠ খালী পায়, তখন এটাকে নিজের গবেষণা বানিয়ে দেয়। (যে, আমার নিকটও এটিই সঠিক যে, ঈসা মাসীহ্ আলাইহিস সালাম এমনই ছিলেন।)

وَيَنْفِثُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ كُفْرَهُ * وَيُغْرِبُ فِي عِيسَى هُوَ شَانِي

এ পদ্ধতিতে এই দুস্কৃতিকারী (খ্রিস্টানদের মত খণ্ডনের নামে) কুফরী কথাবার্তামূলক গালিগালাজ করে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর ক্ষেত্রে বৈরিতা ও হিংসাবশত দোষারূপ ও বদনাম করে।

وَكَانَ هُنَا شَيْءٌ لِتَحْرِيْفِ "عَهْدِهِمْ" * فَصَيَّرَهُ حَقًّا لِخُبْثِ جَنَانِ

অথচ ঘটনা শুধু এতটুকু যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে বিকৃতি হওয়ার কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর শান ও মান পরিপন্থী কিছু কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই খবীস তার ভিতর খারাপ হওয়ার কারণে সে কথাগুলিকে সঠিক সাব্যস্ত করেছে।

وَقَدْ أَخَذُوْا فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ * بِصَاحِبِكُمْ لِلْمُصْطَفَى كَادَانِي

অথচ মালেক ইবনে নুওয়াইরা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে (ব্যাঙ্গ) করে صاحبكم "তোমাদের সাথী" বলেছিল, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম তার এ কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বেয়াদবী ও অপমান আখ্যায়িত করে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ছিলেন এবং হত্যা করে দিতে চেয়ে ছিলেন।

وَقِصَّةُ دُبَّاءٍ رَأَى الْقَتْلَ عِنْدَهَا * أَبُوْ يُوْسُفُ الْقَاضِي وَلَاتَ أَوَانِ

আর হযরত কাজী আবু ইউসূফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ লাউয়ের ঘটনায় (যে লোকটি বেয়াদবীমূলক বলেছিল "আমি তো লাউ পছন্দ করি না", তার এই কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর জন্য তাচ্ছিল্য ও হেয়প্রতিপন্ন আখ্যায়িত করে) সেই লোকটি কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো আর সেই যুগ নেই (যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গালমন্দকারীদেরকে হত্যা করতে পারবো।)

وَقَدْ اَعْمَلَتْ حُكْمَ الشَّرِيْعَةِ فِيْهِمْ * حُكُوْمَةُ عَدْلٍ لِلْاَمِيْرِ اَمَانٍ

আফগানিস্তানের বাদশা আমানুল্লাহ খান সাহেবের ইনসাফগার হুকুমত তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান মোতাবেক ফায়সালা করেছে (যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী কাদিয়ানীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।)

تَحَطَّمَ فِى جَمْعِ الْحِطَامِ وَ نَيْلِهَا * وَبَسْطَ الْمُنٰى فِىْ حَاصِلَاتٍ مَجَّانِى

এই অভিশপ্ত কাদিয়ানী তো আজীবন সম্পদ জমা করা ও ফ্রি চাঁদার টাকা বন্টনের প্রত্যাশা দীর্ঘ করার মাঝে পেরেশান ছিল। এমনকি পরিশেষে এভাবে বৃদ্ধ হয়ে গেছে।

وَكُلَّ صَنِيْعٍ اَوْ دَهَاءٍ فَعِنْدَهُ * لِنَيْلِ الْمُنٰى بِالطَّرْدِ الدَّوْرَانِ

খুব দ্রুত নিজের উদ্দেশ্য পুরা করার সব ধরনের চালাকি, ধোকাবাজি ও প্রতারণা তার কাছে বিদ্যমান ছিল।

اَ هٰذَا مَسِيْحٌ اَوْ مَثِيْلُ مَسِيْحِنَا * تَسَرْبَلَ سِرْبَالًا مِنَ الْقِطْرَانِ

সে কি মাসীহ না মাসীর নযীর? সে তো জাহান্নামী পোষাক কাতরান পরিধান করে রেখেছে।

وَكَانَ عَلٰى مَا قَالَ مَاجُوْجٌ اَصْلُهُ * وَصَارَ مَسِيْحًا فَاعْتَبِرْ بِقِرَانٍ

প্রকতপক্ষে তো সে তার কথা অনুসারে ইয়াজুজ মাজুজের বংশধর ছিল, পরবর্তীতে তার মধ্যে উন্নতি হয়েছে, ফলে সে মাসীহ হয়ে গেছে। অতএব হে লোক সকল! তার মাসীহ ও ইয়াজুজ মাজুজকে একত্রে মিলানো থেকে আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করুন।

نَعَمْ جَاءَ فِى الدَّجَّالِ اِطْلَاقُهُ كَذَا * فَقَدْ اَدْرَكَتْهُ خِفَّةُ السُّرْعَانِ

হ্যাঁ, দাজ্জালের ক্ষেত্রেও তো বিভিন্ন হাদীসে 'মাসীহ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এই মির্জা কাদিয়ানী তাহলে সেই মাসীহে দাজ্জাল ছিল।

নির্বোদ্ধিতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এই উপাধি ধারণ করেছে। (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাথে যে (مسيح) 'মাসীহ' শব্দ এসেছে সেটি (ماشيح) মাশীহ শব্দের আরবী রূপ। হিব্রুভাষায় এটির অর্থ হচ্ছে মোবারক বা বরকতময়। আর দাজ্জালের আলোচনায় যে 'মাসীহ' শব্দ এসেছে সেটি আরবী শব্দ। এটির অর্থ হচ্ছে مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى তথা ডান চোখ মিটানো। এজন্য উর্দূ ভাষীরা তাকে কানা দাজ্জাল বলে। কিন্তু এই জাহেল শব্দটির মূলতথ্য জানত না। তাই সে নিজের জন্য মাসীহ উপাধি ধারণ করে মাসীহে দাজ্জাল হয়ে গেছে।

اَلَمْ يَهْدِهِ لِلْقُرْآنِ يَحْفَظُهُ وَلَمْ * يَحُجُّ لِفَرْضٍ صَدَّهُ الْحَرَمَانِ

এ ঘটনা কি ঘটেনি যে, সে না কুরআন হেফয করতে পেরেছে আর না তার হজ্জ করার তাওফীক হয়েছে? (আর এটাই তো দাজ্জালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।) হারামাইন শরীফাইন তাকে হজ্জ করতে দেয়নি।

فَيَسْرِقُ فِى اَلْفَاظِهِ بَاطِنِيَّةٌ * وَقَرْمَطَةَ وَحْىٌ اَتَاهُ كَذَانِى

এই অভিশপ্ত কাদিয়ানীর কাছে যেই ওহী আসে, তাতে সে কিছু "বাতেনিয়া"র শব্দ চুরি করেছে আর কিছু করেছে "কারমাতা"র শব্দ। এটিই হচ্ছে কাদানীর (কাদিয়ানীর) ওহীর মৌলিকতা।

وَتَابَعَهُ مَنْ فِيْهِ نِصْفُ تَنَصُّرٍ * وَمَنْ فِيْهِ كُفْرٌ مُوْدَعٌ بِمَبَانِى

কেবল সে সব লোকই এই দাজ্জালের অনুসরণ করেছে, যারা পূর্ব থেকেই আধা খ্রিস্টান ছিল এবং যারা মনের মধ্যে কুফরী লুকিয়ে রেখেছিল।

وَكَفَّرَ مَنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِنُبُوَّةٍ لَهُ * وَهُوَ فِى هٰذَا لَاَوَّلُ جَانِ

এই জালেম সকল মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করেছে, যারা তার নবুওয়াত মানে না। এ ক্ষেত্রে [কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে] সে দুনিয়ার প্রথম অপরাধী। (আজ পর্যন্ত কোন মিথ্যা নবী তার অনুসরণ বর্জনকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলেনি।)

اَلَا فَاسْتَقِيْمُوْا وَاسْتَهِيْمُوْا لِدِيْنِكُمْ * فَمَوْتٌ عَلَيْهِ اَكْبَرُ الْحَيَوَانِ

সুতরাং শুনে নাও হে মুসলামনগণ! তোমরা সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকো এবং নিজেদের ধর্ম হেফাযত করার জন্য দেওয়ানা হয়ে একজন অপর জন থেকে অধিক অগ্রসর হও। কারণ ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তো মূল ও সব চেয়ে বড় জীবন।

وَعِنْدَ دُعَاءِ الرَّبِّ قُوْمُوْا وَشَمِّرُوْا * حَنَانًا عَلَيْكُمْ فِيْهِ اَثَرُ حَنَانِ

এবং প্রভুর ডাকে লাব্বাইক বল এবং এই দীন রক্ষায় কমড় বেঁধে নেমে যাও। তোমাদের উপর ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিল হোক।

وَكُنْ رَاجِيًا اَنْ يَّظْهَرَ الْحَقَّ وَارْتَقِبْ * لِاَوْلَادِ بَغِىٍّ فِى السُّهَيْلِ يَمَانِى

এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে শক্ত আশাবাদি হও যে, হকের বিজয় হবে এবং বর্ষাকালীন পোকার ধ্বংসের জন্য সুহাইলে ইয়ামানির অপেক্ষা করো।

وَلِلْحَقِّ صَدْعٌ كَالصَّدِيْعِ وَصَوْلَةٌ * وَطَعْنٌ وَ ضَرْبٌ فَوْقَ كُلِّ بَنَانِ

এবং হক-বাতিলের পর্দা সকালের ন্যায় চাকচাক করে ফেলে। হক নিজেই তখন বাতিলের উপর আক্রমন করে এবং তার প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করে।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّذِىْ * لِنُصْرَةِ دِيْنِ الْحَقِّ كَانَ هَدَانِى

আর আমাদের শেষ কথা তো হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে হকের সাহায্য করার তাওফীক দিয়েছেন।

وَصَلّٰى عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ دَائِمًا * وَسَلَّمَ مَا دَامَ اعْتَلَى الْقَمَرَانِ

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সদা-সর্বদা রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন, যতদিন আকাশের বুকে চন্দ্র-সূর্য চলমান থাকে। (আমীন)

অপব্যাখ্যার ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কিরামের নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর উপর ঈমান

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর উপর কোনরূপ আপত্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়াই ঈমান আনয়ন করা ফরয।

হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ফাতহুল বারী কিতাবের ১৩/৩৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, আবুল কাসেম লালকায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ মুত্তাসিল সনদে হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল ফুকাহায়ে কিরাম কুরআনে করীমের উপর এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকৃত সে সব সহীহ হাদীসসমূহের উপর কোনরূপ তুলনা ও ব্যাখ্যা ছাড়াই ঈমান আনাকে ফরয আখ্যায়িত করেছেন, যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে এসেছে। যে ব্যক্তি এ গুণগুলোর কোন একটির মধ্যে কোনরূপ ব্যতীক্রমী ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করবে কিংবা জাহম ইবনে সফওয়ানের মতাদর্শ গ্রহণ করবে, সে আল্লাহ্ তাআলার ঐ দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম এবং সালফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে উম্মতে মুসলিমার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ সে আল্লাহ তাআলার মূল ও প্রকৃত গুণাবলী ছেড়ে নিজের বানানো অর্থহীন গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে।

হানাফী ইমামগণের প্রতি জাহেমী হওয়ার

অপবাদ দেওয়া বিদ্বেষ ও বৈরিতার বহি"প্রকাশ

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, (ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এর এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও) যে কেউ আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ (ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহ্, ইমাম আবু ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ এবং ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্) কে জাহেমিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলবে, এটি তার বিদ্বেষ ও বৈরিতার বক্র দৃষ্টি বৈ কিছুই নয়। তাই তার দৃষ্টিতে মন্দ বিষয়ই পরে, (ভাল বিষয় দৃষ্টিতে পরে না।)

এরূপ ভ্রান্ত তাবীলের ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ আয়িম্মায়ে দীনের আরো কিছু বর্ণনা ও মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহও টিকাতে সে সব উক্তি ও মন্তব্য বর্ণনা করেছেন।

১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মুহাদ্দিসে লালকায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর কিতাব 'আসসুন্নাহ' এর মধ্যে عن حسن البصرى عن امه عن ام سلمة এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক স্বীয় আরশে) استواء (ইস্তিওয়া) হওয়ার গুণটি অপরিচিত নয়। (সকলেই জানে ও বোঝে।) তবে হ্যা, তার সুরত ও পদ্ধতি উপলব্ধি করা মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। এটি স্বীকার করা (যে, আল্লাহ তাআলার জন্য اسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ তথা আরশের উপর ইস্তিওয়া হওয়া প্রমাণিত) ফরযে আইন আর তা অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফরী।

২. হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, ইবনে আবি হাতেম রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর প্রশংসা লিখতে গিয়ে হযরত ইউনুস ইবনে আবদুল আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো নাম ও সিফাত [গুণ] রয়েছে, যেগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া (ও জানার) পর এগুলো অস্বীকার করেছে, সে কাফের হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (ও জানার) পূর্বে যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে তার অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতগুলো মানবীয় বুঝ শক্তি ও বিচক্ষণতা দিয়ে জানা যায় না। এ জন্য আমরা (কোন রূপ আপত্তি ছাড়াই) এ সব গুণাবলী আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত করি ও মানি। তবে কারো সাথে তুলনা ও উপমা দেওয়াকে অবশ্যই অস্বীকার করি। (কেননা, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর গুণাবলীর কোন উপমা ও নযীর হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা এ কথা বলি যে, তিনি শ্রবণ করেন, তবে আমাদের মত কান দিয়ে শুনেন না। তিনি দেখেন, তবে আমাদের মত চোখ দিয়ে দেখন না।) যেমন

আল্লাহ তাআলা নিজেই সাদৃশ্য অস্বীকার করে বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (কোন বস্তুই তাঁর মতন নয়।)

ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ক্ষতি ও ব্যাখ্যাকারীর হুকুম

হাফেয ইবনে কায়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি শিফাউল আলীল কিতাবের ৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, অপব্যাখ্যা নবীগণের আনীত শরীয়তকে বেকার ও অনর্থক বানিয়ে দেয় এবং শরীয়তপ্রবর্তককে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। যেন ব্যাখ্যাকারী যে ব্যাখ্যা করছে, সেটিই মূলত উদ্দেশ্য, অথচ দেখা যায় তার এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। যে কারণে এই অপব্যাখ্যা বাতিলকে হক আর হককে বাতিল বানিয়ে দেয়। আর শরীয়তপ্রবর্তকের দিকে ধোকাবাজির সম্বন্ধ করা হয়, যা তাঁর শান পরিপন্থী। (অর্থাৎ, অপব্যাখ্যাকারীর এই ব্যাখ্যা সঠিক মেনে নিলে এ কথা বলতে হবে যে, শরীয়তপ্রবর্তক জানাশুনা সত্ত্বেও এর উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার বাহ্যিক অর্থ তার শব্দ থেকে বুঝে আসে না। ফলে লোকেরা ভুল অর্থ বোঝে।) সেই সাথে নিশ্চিত ইলম ছাড়া এ কথা বলা যে, এটিই ছিল শরীযতপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য- এটা সম্পূর্ণ অপবাদ ও মিথ্যা রটনা।

বিধায় প্রত্যেক ব্যাখ্যাকারীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলা আবশ্যক।

১. প্রথমে তাকে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, অভিধান ও আরবী মূলনীতি অনুসারে এই শব্দগুলোর এই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়ার অবকাশ আছে। (যেটা ব্যাখ্যাকারী বলছে।)

২. তারপর তাকে (সূত্র উল্লেখ করে) একথা প্রমাণ করতে হবে যে, বক্তা এই শব্দগুলো অধিকাংশ সময় এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। এমনকি যদি তিনি কোথাও এই শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে থাকেন যে, সেটি থেকে ভিন্ন কোন অর্থ নেওয়া সম্ভব, তবুও সেখানে সেই শব্দ থেকে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া হবে।

৩. এমনিভাবে ব্যাখ্যাকারীর জন্য এটাও দায়িত্ব যে, ওই শব্দটি তার বাহ্যিক অর্থে বা মূল অর্থে ব্যবহার না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার হওয়ার শক্তিশালী ও তাআরুয (সংঘর্ষমুক্ত) কোন দলীল প্রতিষ্ঠা

করতে হবে। অন্যথায় তার এই দাবি দলীলবিহীন দাবি বলে মনে করা হবে এবং তা কক্ষণো গ্রহণযোগ্য হবে না।

সমর্থন ও সত্যয়ন

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তার ফাতাওয়ার ৪/২৯৭ পৃষ্ঠায় রাফেযী (শীয়া) সম্প্রদায়কে কাফের আখ্যায়িত করার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যদি কিছুক্ষণের জন্য এ কথা মেনেও নেই যে, এই রাফেযীরা তো [অস্বীকার করছে না] তাবীল বা ব্যাখ্যা করছে মাত্র, তবুও তো তাদের এই ব্যাখ্যা কখনোই গ্রহণের উপযুক্ত হবে না। বরং এদের ব্যাখ্যার তুলনায় তো খারেজী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাখ্যা তুলনামূলক বেশী যুক্তিযুক্ত। যেমন খারেজীরা পূর্ণ কুরআন অনুসরণ করার দাবি করত। আর বলত, যেই হাদীস কুরআনে করীম পরিপন্থী হবে, তার উপর আমল করা জায়েয নেই। (আর এই রাফেযীরা তো সরাসরি কুরআনকেই অসম্পূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য বলছে।) এমনিভাবে যাকাত অস্বীকারকারীরা তো বলত, আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করুন।) এই সম্বোধন ও নির্দেশ কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য। (তাই যতদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত নিয়েছেন আমরা দিয়েছি।) নবী ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত দেওয়া তো আমাদের উপর ফরয নয়। তারা তাদের মালের যাকাত না হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে অর্পণ করত, আর নিজেরাই আদায় করে দিত। (এরকম তাবীল বা ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ তার ফাতাওয়ার ৪/২৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন, সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাদের পরবর্তী ইমামগণ যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত ছিলেন। যদিও তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করত। রমযানের রোযাও রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কোন ব্যাখ্যা ও সন্দেহ সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়নি। তাই তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে।

অথচ তারাও কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি এবং যাকাতের বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অস্বীকার করত না; বরং তা স্বীকার করত।

যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে "বিদ্রোহী মুসলমান" মনে করা মারাত্মক ভুল ও গোমরাহী

তিনি উক্ত কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় আরো বলেন, তবে যে ব্যক্তি মনে করে "অপব্যাখ্যাকারী বিদ্রোহী মুসলমান" হিসেবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে, সে অনেক বড় ভুলের মধ্যে রয়েছে এবং হক থেকে বহু দূরে রয়েছে। কেননা, "অপব্যাখ্যাকারী বিদ্রোহী মুসলমানদের" কাছে কমপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা ও যুক্তিসম্মত কোন কারণ থাকে। যে কারণে তারা মুসলিম বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত হয়। একারণেই উলামায়ে হক বলেন, খলীফার জন্য উচিত, সে সব বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে চিঠিপত্র ও পয়গাম পাঠানো। অতপর যদি তারা কারণ হিসেবে কোন জুলুম-নির্যাতনের অভিযোগ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা দূর করতে হবে। এ কথা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, শুধু মুসলিম বাদশার সাথে বিদ্রোহ করার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। তার বিপরীতে যাকাত অস্বীকারকারীদের কোন ওযর-আপত্তি না শুনেই তাদেরকে উক্ত কারণে মুরতাদ ও হত্যা করা আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়।

ব্যাখ্যা যখন ঈমান নষ্টের কারণ

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ বুগিয়্যাতুল মুরতাদ কিতাবের ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন, এখানে শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, সাধারণত এ ধরনের ব্যাখ্যা অকাট্যরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি সেটি গ্রহণ করে কিংবা গ্রহণের উপযুক্ত মনে করে, অনেক সময় সে নিজেই এরূপ বাতিল ব্যাখ্যা বা হুবহু ঐ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে গোমরাহিতে লিপ্ত হয়। এমনকি কখনো কখনো ঈমানই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে কাফের হয়ে যায়। (তাই এরূপ ব্যাখ্যার দরজা খোলা বা খোলার অনুমতি দেওয়া খুবই ভয়ংকর ও আশঙ্কাজনক।)

যেমন হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ বুগিয়্যাতুল মুরতাদ কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের আলোচনার অধীনে ইবনে হুদের আলোচনা এনেছেন। এই ইবনে হুদের দাবি ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামএর রূহানিয়্যাত তার উপর নাযিল হয়।

চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে কি নবী হওয়া যায়?

যে ব্যক্তি নবুওয়াতকে উপার্জনযোগ্য (অর্থাৎ চেষ্টা করে নবী হওয়া যায় এরূপ কথা) বলে সে যিন্দীক।

যারকানী নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উক্তি হল, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে নবুওয়াত উপার্জন করে নেওয়া যায় এবং এর ধারাবাহিকতা কখনো বন্ধ হবে না অথবা যে বিশ্বাস করে ওলী নবী থেকে উত্তম, সে ব্যক্তি যিন্দীক। তাকে হত্যা করে ফেলা ওয়াজিব। কেননা, সে কুরআনে আযীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, যে ব্যক্তি এই আকীদা-বিশ্বাস রাখবে যে, নবুওয়াত উপার্জনযোগ্য সে অবশ্যই পরবর্তীতে নবীদের নবুওয়াতকেই অস্বীকার করে বসবে। আর হুবুহু এই আকীদাই পোষণ করে ইহুদিরা। যেমন, বালআম ইবনে বাউরের ব্যাপারে ইহুদিরা বলে থাকে, বালআম (অভিশপ্ত ও চেহারা বিকৃত হওয়ার পূর্বে) মাওয়াব সম্প্রদায়ের নবী ছিল। ইহুদিদের এমন আকীদা পোষণের কথা ইবনে হাযাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ তার কিতাবের মধ্যে বয়ান করেছেন।

তিনি বলেন, নবুওয়াতের দাবিদার মির্জা কাদিয়ানীর অবস্থাও অনেকটা এরূপ হয়েছিল। কেননা, অবশেষে তার ঈমানও চলে গিয়েছিল এবং তারও খুবই কু-মরণ হয়ে ছিল।

নবুওয়াতকে যারা অপার্জনযোগ্য মানে, তাদের কথার ব্যাখ্যা ও খণ্ডন

শাইখুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে শরহে আকীদায়ে সুফারিনী নামক কিতাবের ২৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সব লোকের আকীদা হচ্ছে, নবুওয়াত হলো একটি একাতেসাবী কামাল (উপার্জনযোগ্য পূর্ণতা)। (যে কেউই তা মেহনত করে অর্জন করতে পারে।)

তাই মুসলমানদাবিদার কতিপয় যিন্দিক নবী হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে ছিল। (অথচ এই আকীদা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত।) [বিধায় তাদের চেষ্টা সফল হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। বরং এই চেষ্টা করার কারণে তারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। অনুবাদক]

মূলকথা হচ্ছে, নবুওয়াত হল আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ দান ও নিয়ামত। তিনি যাকে এই নিয়ামত দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকেই এই সৌভাগ্য দান করেন এবং তাকেই নবী বানান। না কেউ নিজের ইলমী যোগ্যতা বলে এই স্তরে পৌছতে পারে, আর না নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবুওয়াত অর্জন করতে পারে, আর না ওলী হওয়ার যোগ্যতা ও শক্তি বলে নবী হতে পারে। বরং আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন অনুসারে বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই কেবল এই বিশেষ নিয়ামতে বিশেষিত করেন। বিধায় যে ব্যক্তি নবুওয়াতকে উপার্জনযোগ্য হওয়ার দাবি করবে, সে যিন্দীক। তাকে হত্যা করে ফেলা ওয়াজিব। কেননা, এই আকীদা ও কথার ভিত্তিতে এই ফলাফল বের হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, নবুওয়াতের দরজা বন্ধ না হওয়া উচিত। (এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ছিলেন না। নাউযু বিল্লাহ) এই আকীদা কুরআন শরীফের স্পষ্ট ভাষ্য وخاتم النبين (এবং তিনি সর্বশেষ নবী) এরও বিরোধী এবং সে সব মুতাওয়াতির হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলোতে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। এ কারণেই কিতাবের মূল অংশের (আকীদায়ে সুফারিনী এর) লেখক الى الاجل (একটি মেয়াদ পর্যন্ত) শব্দ যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ নবুওয়াত আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাআলা যাকে এই সম্মানে ভূষিত করতে চান, একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত এই সম্মান দান করেন। আর এই ধারাবহিকতা মানবজাতির প্রথম পুরুষ হযরত আদম সফিউল্লাহ্ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয় এবং আল্লাহর হাবীব খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে শেষ হয়।

এই আকীদার শাস্তি

সাবহুল আ'শী কিতাবের ১৩তম খণ্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, এই উভয় আকীদা সে সব বাতিল আকীদার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর কারণে এই আকীদা পোষণকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়।

একটি হচ্ছে, এ সব লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বহাল ও বাকি থাকার আকীদা সাব্যস্তকারী। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা বলে নবুওয়াত অর্জনযোগ্য বিষয়। চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তা অর্জন করা সম্ভব। সালাহে সাফদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ লামিয়াতুল আজম কিতাবের ব্যাখ্যগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ইমারাতে ইয়ামানী নামক কবিকে শুধু এ কারণে হত্যা করেছিলেন যে, সে ঐ দলের নেতা ছিল, যারা ফাতেমী রাজত্ব খতম ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তা জাগ্রত ও সঞ্জিবীত করার জন্য মাঠে নেমে ছিল। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে দ্বিতীয় প্রবন্ধে "মিসরীয় বাদশাদের রাজত্ব" শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

এই কবির অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে হযরত সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ তার নিম্নোক্ত কবিতা তুলে ধরেন-

وَكَانَ مَبْدَأُ هَذَا الدِّيْنِ مِنْ رَجُلٍ * سَعَى فَأَصْبَحَ يُدْعَى سَيِّدَ الْأُمَمِ

> এই দীনের সূচনা এমন এক ব্যক্তি (অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হয়েছে, যাকে তাঁর সত্তাগত প্রচেষ্টার ফলে সকল জাতির সর্দার বলা হত।

দেখুন এই কবিতায় কবি ইমারত কিরূপ ঔদ্ধত্যের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতকে একতেসাবী বা অর্জনযোগ্য বলেছে। আস্তাগফিরুল্লাহ!

কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে ধারণাপ্রসূত দলীল

যে সব দলীলের ভিত্তিতে কাউকে কাফের বলা হয়, সেগুলো অকাট্য হওয়া অপরিহার্য নয়। রবং যন্নী তথা ধারণাভিত্তিক দলীলও যথেষ্ট। বিষয়টি হুবুহু এরূপ যে, যদি জিহাদ চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে যেমন প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়, ঠিক তদ্রুপ কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রেও প্রবল ধারণা অনুসারে ফায়সালা করা হবে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ "আততাফরিকাহ" নামক কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেন, এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, কারো কাফের হওয়া না হওয়ার বিষয়টি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। বরং কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা একটি শরয়ী বিধান। এটির উপর ভিত্তি করে দুনিয়াতে তার সম্পদ মোবাহ হওয়ার এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার বিধান আর আখেরাতে তার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বিধান সাব্যস্ত হয়। বিধায় এই বিধানের উৎস ও অস্তিত্ব অন্যান্য সকল শরয়ী বিধানের মতই হবে। যার ভিত্তি কখনো অকাট্য ও নিশ্চিত দলীলের উপর হয়, কখনো দলীলে যন্নী তথা প্রবল ধারণার উপর হয়। আবার কখনো তাতে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বও থাকতে পারে। বিধায় যেখানে কাফের আখ্যায়িত করার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা থাকে, সেখানে কাফের বলা ও না বলা উভয়টি থেকে বিরত থাকা উত্তম। (মোটকথা প্রবল ধারণাভিত্তিক দলীল কাফের আখ্যায়িত করার হুকুম দেওয়ার জন্য নিশ্চিতরূপে যথেষ্ট। প্রবল ধারণাভিত্তিক দলীল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্থগিত থাকা যাবে না।)

কিয়াসের উপরও কুফরীর হুকুমের ভিত্তি হতে পারে

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আত-তাফরিকাহ নামক কিতাবের ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলেন, আল-ইয়াওয়াকীত কিতাবেও এই মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ইমাম কুরদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ওয়াজীয কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়াসের উপর ভিত্তি করেও কাফের আখ্যায়িত করা যাবে। তার কারণ হচ্ছে কৃতদাস হওয়া ও স্বাধীন হওয়া ইত্যাদি হুকুমের মত কাফের হয়ে যাওয়াও একটি শরয়ী হুকুম। (অর্থাৎ যেমনিভাবে আমরা কাউকে গোলাম কিংবা আযাদ হওয়ার ফায়সালা কিয়াসের মাধ্যমে করে থাকি, তেমনিভাবে কোন ব্যক্তির মুসলমান বা কাফের হওয়ার ফায়সালাও কিয়সের মাধ্যমে করা যাবে।) কেননা, কাউকে কাফের বলার অর্থ হচ্ছে দুনিয়াতে তার জান ও মাল মোবাহ এবং আখেরাতে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম। (আর এটি একটি শরয়ী হুকুম।) তাই এটি জানার মাধ্যমও শরয়ী হতে হবে। অন্যান্য শরয়ী বিধিবিধানের ন্যায় এটিও হয়তো অকাট্য নস (ভাষ্য) দ্বারা সাব্যস্ত হবে অথবা অন্য কোন অকাট্য নসের উপর কিয়াস করা হবে। (যদি অকাট্য নস না পাওয়া যায়।) আল-ইয়াওয়াকীত

কিতাবে কুরদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর ন্যায় হযরত খাত্তাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকেও এটিই বর্ণনা করা হয়েছে।

যে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে, তবে দীনের জন্য ক্ষতিকর

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আত-তাফরিকাহ নামক কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, তবে এমন তাবীল যা [গ্রামারিক দিক থেকে করার সুযোগ আছে তবে তা] দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, সেটি এজতেহাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সব তাবীলের ক্ষেত্রে তাবীলকারীকে কাফের বলারও অবকাশ আছে, আবার কাফের না বলারও অবকাশ আছে। (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা দ্বারা যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, তার এই তাবীল দ্বারা নিশ্চিতভাবে দীনের ক্ষতি হবে, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা। অন্যথায় কাফের আখ্যায়িত করা হবে না। মেটিকথা কাফের আখ্যায়িত করার ভিত্তি হচ্ছে দীনের ক্ষতি হওয়ার উপর। তাবীলের কোন জায়েয দিক বা অবকাশ থাকা না থাকার উপর নয়।)

জায়েয ও না জায়েযের ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধা দেখা দিলে

কখনো তাবীল করার জন্য জায়েযের দিক থাকা নাথাকার বিষয়টি নিয়ে দ্বিধা দেখা দেয় এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রেও প্রবলধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ আত-তাফরিকাহ নামক কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, এটি কোন অসম্ভব বিষয় নয় যে, কোন কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তাবীল বা ব্যাখ্যা এতই দুর্বোধ্য ও অযৌক্তিক হয় যে, এটি কি তাবীল না তাকযীব (অস্বীকার ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন) এ নিয়ে সন্দেহ ও দ্বিধা সৃষ্টি হয় এবং অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়। এমন ক্ষেত্রেও প্রবলধারণা ও ইজতেহাদের চাহিদা অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। কেননা, তোমার জানা হয়ে গেছে যে, এটি ইজতেহাদী মাসআলা।

একই কথার কারণে কখনো কাফের হয়ে যায় কখনো হয় না

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, অনেক সময় একই কথা এক অবস্থায় বলার কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায় এবং আরেক অবস্থায় বলার কারণে কাফের হয় না। এমনিভাবে একই কথা এক ব্যক্তি বললে কাফের

হয়ে যায় কিন্তু অপর ব্যক্তি বললে কাফের হয় না। উদারহণস্বরূপ, হাদীস শরীফে এসেছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাউ পছন্দ করতেন।

এ হাদীস শুনে একজন আফসোস করে বলল, لا أنَا أُحِبُّ الدُّبَّاءَ (আহ! আমার কাছে তো লাউ-খেতে ভাল লাগে না।) এ কথার দ্বারা এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দের খাবার থেকে নিজের বঞ্চিত হওয়া ও দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করা। অথবা উদ্দেশ্য হল লাউয়ের ক্ষেত্রে তার বাস্তব জীবনের ঘটনা প্রকাশ করা। বিধায় এরূপ কথা বলার দ্বারা তার কাফের হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু যদি কেউ এই হাদীসটিই শুনে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লাউ পছন্দ করাটাকে) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ক্ষিপ্র আওয়াজে বলে, أنَا لَا أُحِبُّ الدُّبَّاءَ (আমি লাউ পছন্দ করি না।) [ঘৃণা করি], তাহলে এই একই কথা তার কাফের হওয়ার কারণ হবে। (যদি সে তাওবা না করে, তাহলে) সে কাফের হয়ে যাবে। এই উসূল ও মূলনীতির উপর ফতোয়ার বহু শাখামূলক মাসআলার ভিত্তি।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ বিষয়টির জন্য নিম্নোক্ত উৎসগুলো দেখতে পারেন।

১. তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া, দ্বিতীয় মুকাদ্দিমা, আত-তাওয়াল্লী ওয়াত তাবাররী অধ্যায়।

২. "উলামায়ে কালাম ও আকায়েদ" এর খলকে কুরআনের বিষয়ে মুতাকাল্লিম ও গাইরে মুতাকাল্লিমের পার্থক্যের আলোচনা।

৩. "উলামায়ে কালাম ও আকায়েদ" এর হারাম লি-গাইরিহি কে হালাল মনে করার মধ্যে আলেম ও জাহেলের পার্থক্যের আলোচনা।

এই সবগুলো উৎসের আলোচনা ও গবেষণার সারাংশ হচ্ছে অবস্থার ভিন্নতার কারণে হুকুম ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি

আলাইহও এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন, যেমনটি শরহে শিফা নামক কিতাবের ৪/৩৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহও বুগিয়্যাতুল মুরাদ কিতাবের ৬৪ পৃষ্ঠায় এই গবেষণাই বয়ান করেছেন। এর জন্য দেখুন, মাওয়াহেব, তৃতীয় প্রকার, ৬ষ্ঠ মাকসাদ।

একটি সতর্কতা

কাফের আখ্যায়িত করতে কি "তাকযীব" (মিথ্যাপ্রতিপন্ন) প্রয়োজন?

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, মনে রাখবেন, মাসআলায়ে তাকফীর (কাফের আখ্যায়িত করার মাসআলা) এর বিষয়ে আলোচনকারী অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম কোন মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করা অথবা তাবীল করাকে শরীয়তপ্রবর্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাকযীব (মিথ্যাপ্রতিপন্ন) করার মুজে ও মুসতালযিম (হেতু ও আবশ্যককারী) আখ্যায়িত করেছেন। আর এই তাকযীব নিশ্চিত কুফরী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা উল্লিখিত আলোচনায় যে সব উদ্ধৃতি ও প্রমাণ উল্লেখ করেছি, তা থেকে প্রমাণ হয় তাকযীবের উপর তাকফীরের ভিত্তি নয়। বরং যে কোন মোতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করাই শরীয়তপ্রবর্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলগত ও বিশ্বাসগত আনুগত্য গ্রহণ না করা এবং শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করার সামর্থক। (এবং স্বতন্ত্র কুফরী।) যদি শরীয়তপ্রবর্তককে মিথ্যাপ্রতিপন্ন নাও করে, তথাপিও এটি প্রকাশ্য কুফরী। যেমন আল্লামা হামাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহ রদ্দুল মুহতারের ৩/৩৯২ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা তাহতাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহ কুফরের পরিচয় দিতে গিয়ে বয়ান করেছেন। তারা বলেছেন, তাকফীরের মাসআলায় শরীয়তপ্রবর্তককে তাকযীব করার অর্থ হচ্ছে শরীয়তপ্রবর্তকের আনুগত্য গ্রহণ না করা। তার অর্থ এই নয় যে, শরীয়তপ্রবর্তকের দিকে মিথ্যার স্বমন্ধ করা, তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। আল্লামা তাফতাযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহও তালবীহ নামক কিতাবে এমনটিই বয়ান করেছেন।

কুফরীর নতুন এক প্রকার

কুফরীর একটি নতুন প্রকার হচ্ছে শুধু মনের খাহেশ ও অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করা।

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ৫২৪ পৃষ্ঠায় বলেন, কখনো কখনো যে সকল বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক, সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার পরও শুধু অবাধ্যতা, গোরামী ও নিজেদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করে এনকার ও তাকযীব (অস্বীকার ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন) করা হয়। এটাও কুফরী। কারণ, সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে সকল বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সবই জানে। মনে মনে সে সব বিষয় সত্যায়নও করে, যেগুলো মুসলামনগণ সত্যায়ন করে। কিন্তু এরপরও নিজের চাহিদা, কামনা-বাসনা ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী হওয়ার কারণে এগুলোকে অপছন্দ করে এবং এগুলো সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। আর বলে, আমি এগুলো মানি না এবং এগুলো অনুসরণ করি না। বরং আমি তো এই বিষয়টিকে ক্ষোভ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। সুতরাং এটি কুফরীর একটি নতুন প্রকার (যে, অন্তরে তো ঈমান আছে তবে মুখে কুফরী) যা প্রথম প্রকার থেকে ব্যতীক্রম। উসূল ও মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কুফরী হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে জানা গেছে। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় এ ধরনের জেনেশুনে অস্বীকারকারী ও অহংকারকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এ ধরনের কাফেরদের শাস্তি অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় বেশী ও কঠিন হবে।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় স্বীকার করা সত্ত্বেও কাফের

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবের ৫১৪ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম আবু ইয়াকুব ইবরাহীম ইবনে ইসহাক হানযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ "ইসহাক ইবনে রাহবিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর সমস্তরের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, এব্যাপারে মুসলমানদের এজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দ করে কিংবা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত

বিষয় তথা দীনের কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করে অথবা কোন নবীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, সে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে কাফের। যদিও সে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিষয় স্বীকার করে।

মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু স্বীকারোক্তিই কি যথেষ্ট?

মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু যবান দিয়ে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; আমল করাও আবশ্যক।

হযরত হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ "কিতাবুল ঈমান" এর ৮৪ পৃষ্ঠায় হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম হুমাইদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন, আমাকে বলা হল, কিছু লোক না কি বলে, যে ব্যক্তি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি স্বীকার করে। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এগুলোর কোনটিই পালন করে দেখেনি। বরং সারা জীবনে কখনো কেবলার দিকে অভিমুখী হয়ে দেখেনি; দেখিয়েছে শুধু পিঠ। এমন ব্যক্তিও মুসলমান বলে গণ্য হবে, যদি সে এগুলোর কোনটিই সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার না করে থাকে। বরং তার ব্যাপারে এ কথা জানা গেছে যে, তার আকীদা ছিল দীনের রুকুনগুলো পালন না করা সত্ত্বেও আমি মুমিন। কারণ আমি এই সবগুলো বিধান ও কেবলা মুখী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি। (অর্থাৎ, তার আকীদা ছিল, মুমিন হওয়ার জন্য শুধু মুখে স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট; আমল করা আবশ্যক নয়।) ইমাম হুমাইদী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমি এ কথা শুনে বললাম এটাতো প্রকাশ্য কুফরী। তাদের এমন ফায়সালা কুরআন হাদীস ও উলামায়ে কিরামের ফায়সালা পরিপন্থী।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

> তাদেরকে তো এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্য মনে ও নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে। (কিন্তু তারা এই নির্দেশ মানেনি, ফলে জাহান্নামী হয়েছে।)

তারপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকেও শুনেছি যে, যে

ব্যক্তি এ কথা বলবে (যে, ঈমানের জন্য শুধু একরার তথা স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট, আমল জরুরী নয়।) সেও কাফের। কেননা, সে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, খাফাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর শরহে শিফা নামক কিতাবের ৪/৩৮৪ পৃষ্ঠাতেও একথা উল্লেখ আছে।

তাবীল শরীয়তপ্রবর্তকের কথা ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করার নামান্তর

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, শরীয়তপ্রবর্তক যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে কারো তাবীল করার অর্থ হচ্ছে শরীয়ত প্রবর্তকের গবেষণা ও বয়ানের মধ্যে ভুল ও স্খলন বের করা। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর গবেষণাকে ভুল বলা ও নিজের গবেষণা কে সঠিক বলা।

এটি নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য কুফরী। কেননা, যে ব্যক্তির ধারণা হচ্ছে এই যে, আমি শরীয়তের গোপন ভেদ ও রহস্য, মূলনীতি ও উদ্দেশ্য শরীয়তপ্রবর্তকের চেয়ে বেশী জানি, বেশী বুঝি সে নিশ্চিত কাফের। যদিও শরীয়তপ্রবর্তককে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

অতএব তাবীলের বৈধতার ব্যাপারে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত দলীল ছাড়া যে কোন মুতাওয়াতির বিষয়েই তাবীল করা শরীয়তপ্রবর্তককে অজ্ঞ ও মুর্খ আখ্যায়িত করার নামান্তর ও সমার্থক। সেই সাথে তার অর্থ এও দাঁড়ায় যে, এ ক্ষেত্রে যে ভুলত্রুটি রয়েছে, তা (নাউযু বিল্লাহ) শরীয়তপ্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রয়ে গেছে। আর আমরা তা সংশোধন করছি। শুধু এই আকীদার ভিত্তিতেই তাবীলকারীকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে। অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। এ রূপ ধারণা স্বতন্ত্র কুফরী। কেননা, যে বিষয়টি তাবীল করা হচ্ছে যদি তা মুতাশাবিহাত বা আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্য হতে হয়, (যার মূল রহস্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না), তাহলে এ কথা তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে, শরীয়তপ্রবর্তকের ব্যাখ্যার চেয়ে সুন্দর ও নির্ভুল ব্যাখ্যা অন্য কেউ আর করতে পারে না। (কারণ, শরীয়তপ্রবর্তক ওহী ও ইলহাম প্রাপ্ত ছিলেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইলমের অধিকারী ছিলেন। কাশফ ও ইলহামের অধিকারী বড় বড় ওলীও কখনোই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে না।)

আর যদি সেই বিষয়টি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলেও শরীয়তপ্রবর্তকের বয়ানকৃত উদ্দেশ্যকে ভুল বলা কোন সুরতেই বরদাশত হওয়ার যোগ্য নয় এবং তা সঠিকও নয়। (কারণ, শরীয়তের উদ্দেশ্য কী তা শরীয়তপ্রবর্তকের চেয়ে ভাল বুঝবে কে?) তবে একটি সুরত আছে যে, এমন কোন মুতাশাবিহ বিষয় যেটির ব্যাপারে শরীয়তপ্রবর্তক নিরবতা অবলম্বন করেছেন, সেটির উদ্দেশ্য সম্ভাবনা হিসেবে বর্ণনা করা যাবে। তবে এটিও আশঙ্কামুক্ত নয়। (কেননা, যদি উদ্দেশ্য বলার সুযোগ থাকত, তাহলে শরীয়তপ্রবর্তক চুপ থাকতেন না।) বিধায় এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যাস্ত করাই নিরাপদ ও সঙ্কামুক্ত।

এখন অবশিষ্ট রইল সে সব মুতাওয়াতির বিষয় যেগুলোর উদ্দেশ্য একেবারেই সুস্পষ্ট (এবং তা মুতাওয়াতিরভাবেই শরীয়তপ্রবর্তক থেকে বর্ণিত।) সেটির সুস্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ননা করা নিশ্চিত ও অকাট্যরূপে কুফরী।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

নিঃসন্দেহে (হে নবী!) তারা আপনাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে না, মূলত এই জালেমরা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।[৮৫]

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, (কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা ও সাধ্য অনুসারে আলোচনা করলাম) তবে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমই অধিক পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ়।

আমাদের জন্য সমীচীন হবে, খাতিমুল মুহাদ্দিসীন শাইখুল মাশায়েখ হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর আলোচনার মাধ্যমে এই আলোচনার ইতি টানা এবং উপসংহারে যাওয়া। হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর তাহকীক ও গবেষণা তাঁর ফিতরী তাফাক্কুহ ও মেশকাতে নবুওয়াত থেকে বের হওয়া একটি নূর।

---

[৮৫]. সূরা আনআম : ৩৩

উপসংহার

শাইখুল মাশায়েখ খাতিমুল মুহাদ্দিসীন হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর একটি চমৎকার গবেষণা।

(গবেষণাটির শিরোনাম হচ্ছে-)

কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ফায়সালা ও তার সমাধান

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়ার ১/৪২ পৃষ্ঠায় বলেন–

পরস্পর বিপরীত দুটি ফায়সালা

আল্লামা তাফতাযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শরহে আকায়েদ নামক কিতাবে বলেছেন- "কালাম শাস্ত্রের আলেমগণের এই দুই কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা খুবই দুস্কর।

১. আহলে কেবলা তথা কাবার দিকে অভিমুখী হয়ে নামায আদায়কারী কাউকে কাফের বলো না।

২. যে ব্যক্তি কুরআন শরীফকে মাখলুক বলে কিংবা আল্লাহ তাআলাকে পরকালেও দেখা অসম্ভব বলে অথবা শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু কে যারা গালমন্দ বা অভিসম্পাত করে, তাদেরকে অবশ্যই কাফের বলা হবে, যদিও তারা আহলে কিবলা হয়।

আল্লামা শামসুদ্দীন খিয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর গবেষণা

আল্লামা শামসুদ্দীন খিয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ শরহে আকায়েদের টিকায় লেখেছেন- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই উসূল যে, "আহলে কেবলা তথা কাবার দিকে অভিমুখী হয়ে নামায আদায়কারী কাউকে কাফের বলো না।" এর অর্থ হচ্ছে এজতেহাদী মাসায়েল অস্বীকার করলে কোন আহলে কেবলা কে কাফের বলা যাবে না। কেননা, যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনের কোন একটিকে অস্বীকার করবে, তাকে কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। (এমন ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবে কাফের।) তাছাড়া এই উসূলটি (তথা কোন আহলে কেবলা কে কাফের বলা যাবে না।) শুধু হযরত ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তাঁর কতক অনুসারীর কথা।

তাঁরা ছাড়া অবশিষ্ট সকল আশায়িরা এই মূলনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে একমত নন। আর এঁরা হচ্ছেন সে সকল আশায়িরা যারা মুতাযিলা ও শীয়াদেরকে তাদের কতক আকীদার কারণে কাফের বলেন। বিধায় এই দুই মতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, প্রথম মতের প্রবক্তাগণ নিজেরাই এ বিষয়ে একমত নন।

এই গবেষণার উপর হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর আপত্তি

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লামা খিয়ালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর প্রথম জবাবটি একটি ব্যাপক মূলনীতি ও সর্বজনস্বীকৃত কানুনের মধ্যে কোনরূপ দলীল ছাড়াই বিশেষিত করা ও মতলক (নিঃশর্ত বিষয়)কে মুকাইয়িদ (শর্তযুক্ত) বানানোর নামান্তর।

আর দ্বিতীয় জবাবটির ভিত্তি হচ্ছে এ কথার উপর যে, উভয় উক্তির প্রবক্তা ভিন্ন ভিন্ন। অথচ বাস্তবতা এমনটি নয়। বরং যারা এই মূলনীতির প্রবক্তা তারাও কুরআনকে মাখলুক মানা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দ করা, পৃথিবীকে অনাদী ও চিরস্থায়ী মানার ভিত্তিতে কাফের আখ্যায়িত করেন। (তাই এখনো বৈপরীত্য বিদ্যমান এবং তা নিরসন ও সামঞ্জস্য বিধান করার আবশ্যকীয়তা বাকি থেকে যায়।)

মীর সায়্যেদ শরীফের তাহকীক

মীর সায়্যেদ শরীফ শরহে মাওয়াকেফ নামক কিতাবে বলেন, মনে রাখবেন, আহলে কেবলাকে কাফের না বলা শাইখ আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ফুকাহায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর গবেষণা। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি। কিন্তু আমরা যখন পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের বিশ্লেষণ বর্ণনা করি, তখন তার মধ্যে এমন সব আকীদা বেরিয়ে আসে, যেগুলোর কারণে মানুষ নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে কাফের হয়ে যায়। যেমন–

১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদের অস্তিত্ব অথবা কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুলুল (অবতরণ করা) সংক্রান্ত আকীদা সমূহ।

২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত অস্বীকার সংক্রান্ত আকীদাসমূহ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অপমান ও তাচ্ছিল্য করার মত উক্তিসমূহ।

৩. অথবা শরীয়তে যেগুলোকে হারাম বলেছে, সেগুলোকে হালাল বলা বা মনে করা, এমনিভাবে শরীয়তের কোন ফরয বিধানকে অকেজো সাব্যস্ত করা।

(বিধায় আমরা শাইখ আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ফুকাহয়ে কিরামের এই মূলনীতির সাথে একমত হতে পারি না। বরং যদি কোন মুসালমান সম্প্রদায় এমন আকীদা পোষণ করে, বা এমন কোন কাজ করে বা উক্তি করে, যা কুফরীর কারণ বা হেতু, তাহলে আমরা অবশ্যই এ ধরনের লোককে কাফের বলব। যদিও সে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে।)

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর গবেষণা

("আহলে কেবলা" দ্বারা যে কোন দিকে অভিমুখী হয়ে নামায আদায়কারী উদ্দেশ্য নয়। বরং) সঠিক কথা হচ্ছে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত উক্তি "আহলে কেবলা" দ্বারা সে সব লোক উদ্দেশ্য, যারা জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করে না। (কেবলা বলে যেন দীন এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই এর অর্থ হচ্ছে "দীন মানে এমন লোক) ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য নয় যারা শুধু কেবলার দিকে অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

নেক ও দীনদারী কেবল এটাই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে অভিমুখী হবে। বরং নেক ও দীনদারী তো হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কাজ সমূহ যে আল্লাহ তাআলার (সত্তা ও গুণাবলীর) উপর এবং কিয়ামত দিবসের ঈমান রাখে...।

জরুরিয়াতে দীন

বিধায় যে ব্যক্তি জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করে, সে আহলে কেবলা (ও মুসলামন) থাকেই না। কেননা, মুহাক্কিক আলেমগণের মতে জরুরিয়াতে দীন তো কেবল তিন প্রকার বস্তু।

১. আল্লাহ তাআলার কিতাব কুরআনের আয়াতের অর্থ। তবে শর্ত হচ্ছে তা এমন সুস্পষ্ট ভাষ্য হতে হবে যে, তার মধ্যে কোন তাবীল বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ, মা এবং মেয়ে কে বিয়ে করা হারাম হওয়া। মদ ও জুয়া হারাম হওয়া। অথবা আল্লাহ তাআলার জন্য ইলম, কুদরত (ক্ষমতা) ইচ্ছাশক্তি, বাকশক্তি ইত্যাদি গুণাবলী সাব্যস্ত করা ও মানা। মুহাজের ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের ও প্রাক্তন যারা (সর্ব প্রথম ঈমান গ্রহণকারী যারা) তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার রাজী ও সন্তুষ্ট হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস এবং কোন ক্ষেত্রেই তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা জায়েয না হওয়া।

২. শব্দগত ও অর্থগত যে সব মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে, চাই তা আকীদা সংক্রান্ত হোক বা আমল ও বিধান সংক্রান্ত হোক, এমনিভাবে আমল ও বিধানগুলো চাই ফরয হোক কিংবা নফল হোক, সব মেনে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইতকে মহব্বত করা ফরয হওয়া, চাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ হোক বা তাঁর কন্যাগণ হোক। এমনিভাবে জুমআর নামায, জামাআতের সাথে নামায আদয় করা, আযান, দুই ঈদ ইত্যাদি মানা।

৩. সে সব বিষয় যেগুলোর ব্যাপারে উম্মতের এজমা সংঘটিত হয়েছে। যেমন, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক হওয়ার আকীদা এবং এগুলো ছাড়া উম্মতের আরো যেসব সর্বসম্মত আকীদা ও বিধান রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয় না মানার হুকুম

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এ জাতীয় আকীদা ও বিধিবিধান অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলার কিতাবসমূহ ও নবীগণের ব্যাপারেও তার ঈমান গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হবে না। কেননা, অকাট্য

এজমাকে ভুল বলা, পুরা উম্মতকে গোমরাহ বলার নামান্তর। সেই সাথে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহও অস্বীকার করা হয়ে যায়।

১. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরা সেই শ্রেষ্ঠজাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণ তথা পথ প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আল ইমরান: ১১০)

২. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

যে ব্যক্তি সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে,.. ।[৮৩]

৩. لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মত সকলেই পথভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।

হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই হাদীসটি অর্থ ও ভাবগত দিক থেকে মুতাওয়াতির। বিধায় এ ধরনের বিষয়গুলো অস্বীকারকারী আহলে কেবলা তথা মুসলমানই নয়।

জরুরিয়াতে দীনের পরিচয়

কতক আলেম বলেন, জরুরিয়াতে দীনের হচ্ছে, সে সব আকীদা ও বিধিবিধান, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি মুসলামন ও অমুসলমান সকলেই সমানভাবে জানে।

এই সংজ্ঞা সম্পর্কে হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর অভিমত

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আমাদের দৃষ্টির সামন দিয়ে যে সব কিতাব গত হয়েছে, তাতে তো জরুরিয়াতে দীনের এই সংজ্ঞা পাওয়া গেছে, " জরুরিয়াতে দীন হচ্ছে এমন সব আকীদা ও বিধিবিধান, যেগুলো বিশেষ ও সাধারণ লোক তথা আলেম ও জাহেল সকলেই সমানভাবে জানে।

---

[৮৩]. সূরা নিসা : ১১৫

আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর উক্তি ও হযরত শাহ সাহেবের অভিমত

হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সারসংক্ষেপ কথা হচ্ছে, শাইখ আবুল হাসান আশআরী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এবং ফকীহগণের এই উক্তি যে, لَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ (আমরা কোন আহলে কেবলা কে কাফের বলব না।) একটি সংক্ষিপ্ত কথা যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তাই নিঃসন্দেহে তাতে ব্যাপকতা বাকি আছে। তবে আহলে কেবলা ও নন আহলে কেবলা নির্দিষ্টকরণ ও এ দুটির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে যে, কারা আহলে কেবলা আর কারা আহলে কেবলা নয়। (এর মূল গবেষণমূলক কথা সেটাই যা উপরে আলোচনা হয়েছে।

ইজতেহাদী মাসআলা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা জায়েয নেই

তিনি বলেন, হ্যাঁ, কোন কোন ফকীহ এমন ইজতেহাদী মাসআলা অস্বীকারকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেন, যেগুলো একদলের নিকট প্রসিদ্ধ ও পরিচিত; কিন্তু অপর দলের নিকট নয়। উদাহরণস্বরূপ, কুসুমী রঙ্গে রঙ্গিত কাপড় পরিধান করা হারাম। (এটির অবৈধতা সকলের কাছে প্রসিদ্ধ নয়।) এ রকম মাসআলা অস্বীকার করার ভিত্তিতে কাফের বলা ভ্রান্ত পদ্ধতি।

আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি

কতক ফকীহ মূলনীতি ও শাখার মাঝে পার্থক্য করেন। তাই তারা মৌলিক আকীদা ও মৌলিক বিধান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেন। তবে শাখাগত আকীদা ও শাখাগত বিধান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেন না।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব রহ. এর মতামত

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, যদি এই বুযুর্গদের উদ্দেশ্য হয় শুধু আমল (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৌলিক আকীদা ও আমল অস্বীকার করে, সে আহলে কেবলা নয়।) তাহলে তো ঠিক আছে। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানাই। আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এ সব আমল ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি হওয়ার বিশ্বাস, (অর্থাৎ আমলকে তো অস্বীকার করে না, তবে তা ফরয বা সুন্নত হওয়া কে অস্বীকার করে।)

তাহলে এই মূলনীতি ও শাখানীতির মাঝে যে পার্থক্য বলা হয়েছে তা আমরা মানি না। কেননা, এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি (উদাহরণ স্বরূপ) যাকাত ফরয হওয়া, ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব হওয়া, পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং আযান সুন্নত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিত কাফের। ইসলামের শুরুতে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সাথে সকল সাহাবীর ঐকমত্যে যুদ্ধ করা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের ফরযসমূহের কোন একটির ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে) যদিও সে মূল আমল অস্বীকার না করে, তবুও সে কাফের।

কুফরী ব্যাখ্যা

তিনি বলেন, হ্যাঁ কোন কোন বিধানের ক্ষেত্রে কুফরে তাবীলী গ্রহণযোগ্য হয়। (অর্থাৎ তাবীলকারী কোন তাবীলের ভিত্তিতে অস্বীকার করার কারণে তাকে কাফের বলা হয় না।) কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়ে তাবীল করলে তা শুনা হয় না। যেমন যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের তাবীল শুনাই হয়নি। তারা নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দলীল দিত। إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (নিশ্চয়ই আপনার নামায তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ।) (অর্থাৎ যাকাত অস্বীকারকারীরা বলত, যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায উম্মতের জন্য প্রশান্তির কারণ হওয়া এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই খাস ছিল, তেমনিভাবে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ এই আয়াতের হুকুমও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই খাস হবে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। এটি তাদের সম্পদ পবিত্র করবে।

এমনিভাবে হারুরিয়া তথা খারেজীদের তাবীলও শুনা হয়নি। তারা إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (হুকুম ও রাজত্ব কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই।) এই আয়াতের ভিত্তিতে "বিচারক নির্ধারণ করা"কে বাতিল ও কুফরীর কারণ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করত। (এবং তারা সে সকল সাহাবীকে কাফের বলত, যারা হাকামের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।)

যেসব কারণে কাফের না বলা উচিত

তিনি বলেন, তবে কুরআন মাখলুক (সৃষ্টবস্তু) হওয়ার আকীদা পোষণ করা অথবা মুমিনদের জন্য পরকালে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ (অসম্ভব মনে করে) অস্বীকার করা, এমনিভাবে যে সব বিষয় যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলো অস্বীকার করা ইত্যাদি কারণে কাউকে কাফের বলা উচিত নয়। কারণ এ সব বিষয়ের বিরোধিতাকারীরা কুরআন-হাদীসের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য নস বা ভাষ্য অস্বীকার করছে না। (অর্থাৎ এ সব বিষয় এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য নস দ্বারা প্রমাণিত নয়, যার মধ্যে সত্তাগতভাবে তাবীল করার অবকাশ নেই। আর এর যতটুকু অংশ অকাট্য ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত তা তো তারা স্বীকার করেই।)

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যদি এ কথা বলা হয়, এ ব্যাপারে কী দলীল রয়েছে যে, আহলে কিবলা দ্বারা ঐ সকল লোকই উদ্দেশ্য, যারা সমস্ত জরুরিয়াতে দীন বিশ্বাস করে? আর আহলে কেবলা শব্দ থেকে এ কথাটি কিভাবে বুঝে আসে?

এর জবাব হচ্ছে, কুফরী এবং ঈমান একটি অপরটির বিপরীত। এ দুটির মাঝে "عدم وملكه" এর বৈপরীত্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। কেননা, কুফরের অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা। আর যে দুই বস্তুর মাঝে "عدم وملكه" এর বৈপরীত্য হয়, সে দুটির মাঝে উদ্দেশ্যগতভাবে মধ্যস্ত তথা তৃতীয় কোন সুরত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, এ দুটির মাঝে এ জাতীয় বৈপরীত্য রয়েছে। অন্ধ ঐ ব্যক্তিকে বলে যার দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি। আর এ কথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, যে মাখলুক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা, তা দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে না। হয় তো সেটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হবে অথবা দৃষ্টিশক্তিহীন হবে। এটি সম্ভব নয় যে, সেই মাখলুকটি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নও হয়নি, আবার দৃষ্টিশক্তিহীনও হয়নি, বরং তৃতীয় কোন অবস্থা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমানের যেই শরয়ী অর্থ কুরআন-হাদীস, তাফসীর, আকায়েদ, এবং কালাম শাস্ত্রের কিতাবে গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয়েছে, তা হচ্ছে এটিই

যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সে সব দীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্যায়ন করা, যেগুলোর ব্যাপারে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো রাসূল হিসেবে নিয়ে এসেছেন। আর এটিকে এমন ব্যক্তি কর্তৃক সত্যায়ন করা, যে সত্যায়নের আহাল ও উপযুক্ত।

এটি তো ঈমানের সংজ্ঞা হল। আর কুফরের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি এই তাসদীক তথা সত্যায়নের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে সব শরয়ী বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্যায়ন না করা, যেগুলোর ব্যাপারে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

তিনি বলেন, কুফরের এই সংজ্ঞাটি হুবুহু সেটিই, যা আমরা বলে এসেছি। আর তা হচ্ছে জরুরিয়াতে দীনের মধ্য হতে কোন একটি অস্বীকার করাও কুফরী এবং অস্বীকারকারী কাফের। (বিধায় যে কোন "জরুরী" বিষয় অস্বীকারকারীকে মুসলমান ও আহলে কেবলা বলা হবে না।)

কুফর চার প্রকার

তিনি বলেন, এই তাসদীক বা সত্যায়ন না করার চারটি স্তর রয়েছে।

১. কুফরে জাহাল। (অজ্ঞতা নির্ভর কুফর) অর্থাৎ দুনিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সে সব বিষয় নিয়ে আসা নিশ্চিত ও অকাট্য, সেগুলো মিথ্যা বলা ও অস্বীকার করা, এই বিশ্বাস নিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দাবিকৃত বিষয়ে (অস্বীকারকারীর ধারণা মতে) মিথ্যাবাদী। আবু জাহাল, আবু লাহাব ও তাদের মত মক্কার আরো যত কাফের ছিল, তাদের কুফর এই প্রকারের কুফর।

২. কুফরে জুহুদ ও ইনাদ। (জেনে বুঝে না মানার উপর যে কুফরের ভিত্তি।) অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্যবাদি এ কথা জানা সত্ত্বেও শুধু জিদ ও বিদ্বেষের বর্শবতী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যাবাদি বলা। এটিই হচ্ছে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের কুফর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ.

যাদেরকে আমি আসমানি কিতাব দিয়েছি তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমনভাবে চিনে যেমন তাদের ছেলেদেরকে চিনে। সূরা বাকারা : ১৪৬

অপর স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

এই আহলে কিতাবরা শুধু জিদ ও অহংকারবশত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত অস্বীকার করে। অথচ তাদের মন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত পুরোপুরি বিশ্বাস করে নিয়েছে।[৮৭]

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, অভিশপ্ত ইবলীসের কুফরও এই প্রকারের কুফর।

৩. কুফরে শক (সন্দেহ ও দ্বিধা নির্ভর কুফর) যেমন অধিকাংশ মুনাফিকদের কুফর। (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবী হওয়ার বিষয়ে তাদের সংশয় ও সন্দেহ ছিল।)

৪. কুফরে তাবীল। (তাবীল তথা ব্যাখ্যা নির্ভর কুফর) অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার এমন অর্থ ও উদ্দেশ্য বলা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য নয়। (যেমন আল্লাহ তাআলা এর বাণী, وَأَطِيعُوا اللَّهَ এর মধ্যে আনুগত্যের কেন্দ্রস্থল উদ্দেশ্য নেওয়া। অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা দ্বারা তাকিয়া কিংবা মাসলাহাত [প্রয়োজন] উদ্দেশ্য নেওয়া। যেমন শীয়ারা সেসব হাদীসের ক্ষেত্রে তাবীল করে থাকে, যেগুলোর মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

---

[৮৭]. সূরা নমল : ১৪

আলোচনার সারমর্ম

তিনি বলেন, যেহেতু নামাযের মধ্যে কেবলামুখী হওয়া ঈমান ও মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য। চাই এটিকে আকীদার দৃষ্টিতে দেখা হোক, বা আমলের দৃষ্টিতে দেখা হোক।

উলামায়ে কিরাম তাদের উক্তির মধ্যে আহলে ঈমান কে আহলে কেবলা শব্দে ব্যক্ত করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে মসল্লী (নামাযী) শব্দ দ্বারা মুসলমান বুঝানো হয়েছে। نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ (আমাকে নামাযী তথা মুসলমান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।) এই হাদীসে مصلين শব্দ দ্বারা নিশ্চিতরূপে মুসলমান বুঝানো হয়েছে।

এটি ছাড়াও কুরআন করীমের নিম্নোক্ত সুস্পষ্ট ভাষ্য বলে দিচ্ছে আহলে কিবলা সে সব লোক, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সে সমস্ত বিষয় সত্যায়ন করে, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ে আসার বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। ভাষ্যটি হচ্ছে-

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ.

> আল্লাহ তাআলার রাস্তা (দীন) থেকে লোকদেরকে বাধা দেওয়া এবং তা অস্বীকার করা, মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেওয়া এবং তার বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় কুফরী। [৮৮]

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কুফরের এই চার প্রকার যা হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহ বয়ান করলেন, এগুলো মাআলিমুত তানযীলসহ তাফসীরের অনেক কিতাবে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

তাছাড়া নেহায়া ও ইবনে আসীরেও এর আলোচনা রয়েছে।

---

[৮৮]. সূরা বাকারা: ২১৭

হযরত শাহ সাহেব কে ফতোয়া জিজ্ঞেস ও তার জবাব

ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়ার ১/১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন—

প্রশ্ন: জায়িদ হাদীস শরীফের অর্থের মধ্যে এমন স্পর্শকাতর ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা করে, যার ফলে হাদীস অস্বীকার করাই হয়ে যায়। ফিকহী বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়িদের কোন গুনাহ হবে? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর: কুরআন-হাদীসের তাফসীর ও অর্থ বয়ান করার জন্য সর্বপ্রথম ইলমে সরফ, নাহু, লুগাত, ইশতেকাক, ইলমে মাআনী, ইলমে বয়ান, ইলমে ফিকহ, উসূলে ফিকহ, আকায়েদ ও কালাম শাস্ত্র, এমনিভাবে হাদীস, সাহাবাদের কথা এবং সীরাত ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এ সব শাস্ত্রের ইলম অর্জন করা ছাড়া কুরআন-হাদীসের অর্থ ও ভাব বয়ান করার দুঃসাহস করা কক্ষণোই জায়েয নেই। তাছাড়া প্রত্যেক মাযহাব প্রণেতা কুরআন ও হাদীস দিয়ে (নিজের মতের সত্যতার উপর) প্রমাণ পেশ করে থাকেন। সেই সাথে বিপরীত মত পোষণকারীদের সংশয় ও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তাবীল বা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন। আর কুরআন-হাদীসে নিজের মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যাখ্যাকে হক ও সঠিক মনে করেন। (অর্থাৎ কুরআন হাদীসের যেই অর্থ ও উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি সেটিই সঠিক।) আর নিজের মাযহাবের বিপরীত অর্থ ও মতকে ভুল মনে করেন। এমন পরিস্থিতিতে হক ও বাতিল, সঠিক ও বেঠিক চিনার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেয়ীন রহমাতুল্লাহি আলাইহিম এর বুঝ ও বিবেচনা। কেননা, হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি ও মোখামুখিভাবে ইলম অর্জনের সময় প্রেক্ষাপট ও কথার ভাব-ভঙ্গিমার নিদর্শনের মাধ্যমে যা বুঝেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পরিষ্কার ভাষায় তা ভুল বলেননি, সেটিই হক এবং গ্রহণ করা আবশ্যক।

বিধায় স্পর্শকাতর ও ভিত্তিহীন এই ব্যাখ্যাকারী যদি প্রথম গ্রুপের তথা তাফসীরের অত্যাবশ্যকীয় শাস্ত্রসমূহের জ্ঞানশূন্য হয়, তাহলে তো তার ব্যাপারে কঠিন হুমকি ও ধমকি এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি নিজের বিবেক ও খেয়াল মত কুরআনের তাফসীর করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

অর্থ ও[৮৯] উদ্দেশ্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের হুকুম একই। তার কারণ হচ্ছে, এই উভয়টির উপরই দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া আরবী ভাষার মধ্যে হাকীকতও (মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দও) রয়েছে, মাজাযও (রূপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দও) রয়েছে। সুস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দও রয়েছে, ব্যাখ্যাযোগ্য শব্দও রয়েছে। রহিতকারী আলোচনাও রয়েছে, রহিতকৃত আলোচনাও রয়েছে। (বিধায় একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে নির্ণয় করবে, কিভাবে এগুলোর সঠিক অর্থ ও মতলব উদঘাটন করবে? তাই তার সিদ্ধান্ত ও বুঝ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?)

আর যদি এই ব্যাখ্যাকারী দ্বিতীয় গ্রুপের হয়, অর্থাৎ যদি সে উল্লিখিত শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবেয়ীনদের বর্ণনাকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে) তাহলে সে বেদআতী। বিধায় তার এই বেদআতপূর্ণ ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি তা অকাট্য দলীল তথা মুতাওয়াতির ভাষা ও অকাট্য এজমা পরিপন্থী ব্যাখ্যা হয়, তাহলে লোকটিকে কাফের মনে করা উচিত। আর যন্নী দলীল তথা নিশ্চিত ও অকাট্যতার কাছাকাছি এমন দলীল পরিপন্থী হয়, যেমন মাশহুর হাদীস এবং পারিভাষিক এজমা পরিপন্থী হল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে ফাসেক ও গোমরা বলা হবে। কাফের বলা হবে না। আর যদি ভিন্নমত পোষণকারী এই দুই দলের লোক না হয়ে থাকে, তাহলে তার এই ভিন্ন মত কে إِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ (আমার উম্মতের মতভেদ রহমত স্বরূপ।) এ প্রকারের মধ্যে মনে করা উচিত।

কিন্তু এই তিন স্তর ও তিন দলের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান বের করার জন্য অনেক বেশী ও গভীর ইলমের প্রয়োজন। এ কথা স্পষ্ট যে, এমন ভিত্তিহীন ও স্পর্শকাতর ব্যাখ্যাকারী জাহেল ও নাদানদের দলের লোক। তাই "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর অংশ হিসেবে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যে সব হুমকিধমকি ও জাহান্নামী

---

[৮৯]. তিরমিযী শরীফ: ২/১১৯

হওয়ার দুঃসংবাদ এসেছে, সে সম্পর্কে তাকে অবগত করে এই কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত। আর সাধারণ মানুষদেরকে কঠিনভাবে বলে দিতে হবে, যেন তারা এই লোকের সাথে কথাবার্তা না বলে এবং তার কথা না শুনে।

আর যদি এই ব্যাখ্যাকার দ্বিতীয় দল তথা বেদআতী গ্রুপের হয় এবং তার মতাদর্শ ও দলের নাম জানা যায়, যেমন রাফেযী (শীয়া) খারেজী, মুতাজেলী, কাদিয়ানী ইত্যাদি, তাহলে সাধারণ মুসলমানদের কাছে এই লোকের মতাদর্শ ও দলের কথা প্রকাশ করে দিতে হবে। (যাতে করে লোকেরা তার কাছে না যায়। তার কথা না শুনে।) আর যদি সে নিজের ভ্রান্ত আকীদা আহলে হকের মতাদর্শের পোষাকে পেশ করে, তাহলে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা তা দেখে তার হুকুম লেখে পাঠাতে পারি।

মসজিদে পথভ্রষ্ট ও নাস্তিকদের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা

হাদীস থেকে প্রমাণ

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, রূহুল মাআনীসহ বেশ কয়েকটি তাফসীরের কিতাবে এই আয়াতের তাফসীরের অধীনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিন মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে তিনি (এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করে) বললেন, এই যে তুমি দাঁড়াও। তুমি মুনাফিক। এখনই মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও। তারপর (অপরজনের দিকে ইশারা করে) বললেন, তুমি দাঁড়াও। তুমিও মুনাফিক। এখনই মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও।

মোটকথা এক এক করে মসজিদে থাকা সবক'টি মুনাফেককে মসজিদ থেকে বের করে দেন এবং প্রকাশ্যে অপমান করেন।

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ৩৬ জন মুনাফিককে নাম ধরে ধরে দাড় করিয়ে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যেও এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ আছে। ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহ সীরাত কিতাবে সে সব মুনাফিকের নাম

এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সকল অপরাধী অন্যদের থেকে পৃথক ও আলাদা হয়ে গেছে। একে একে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করার পর হযরত ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এসব মুনাফিক সব সময় মসজিদে নববীতে আসা যাওয়া করত এবং মুসলমানদের কথা শুনত। (তারপর সেগুলো গিয়ে প্রচার করত।) এমনকি মুসলমান ও তাঁদের ধর্ম নিয়ে উপহাস করত। যেমন এক দিন এই দলের কিছু মুনাফিক মসজিদে নববীতে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন তারা পরস্পরে মাথার সাথে মাথা মিলিয়ে চুপে চুপে কথা বলছে। এ কারণে সে সময়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে তাদেরকে খুব কঠোরতার সাথে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুধু কি তাই! বরং ঐ যুলখুওয়াইসিরাকে নামাযরত অবস্থায় হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দেওয়ারও প্রমাণ আছে। তার ব্যাপারে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে এবং তার সাথীরা তো কুরআন শরীফ পাঠ করে, কিন্তু কুরআর তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যে, তারা কোন টেরও পাবে না। (সেই লোকটি ঘটনাক্রমে উধাও হয়ে যায়, ফলে সে হত্যা থেকে বেঁচে যায়।)

হযরত ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসনাদে আহমাদের ৩/১৫ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি এনেছেন।

হযরত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীর ১২/২৬৫ বলেন, এই রেওয়ায়াতের সনদটি খুবই মজবুত এবং হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়াতটি তার সমর্থক, যেটি আবু ইয়ালা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার মুসনাদের মধ্যে এনেছেন। রেওয়ায়াতটির বর্ণনাকারী সকলেই সেকাহ ও নির্ভরযোগ্য।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কানযুল উম্মালের ৫/২৯৮ এবং মুসতাদরাকে হাকেমের ৩/৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, ইবনে আবু সারাহ সহ অনেককে মসজিদে হারামের মধ্যেই হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মরদুদ ইবনে আবু সারাহ বলত, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ওহী আসে তাহলে আমার কাছেও নিশ্চিত ওহী আসে।

কুরআন থেকে প্রমাণ

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ....

يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

> মুশরেকরা নিজেদের ব্যাপারে কুফরীর সাক্ষ্য দেওয়া অবস্থায় তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার মসজিদ নির্মাণ করার অধিকার নেই।........
>
> আল্লাহ তাআলার মসজিদ তো কেবল তারাই আবাদ করবে, যারা আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।.....[৯০]

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, আর যদি তারা কোন মসজিদ নির্মাণ করেই ফেলত, তাহলে সেটি শরীয়তে মসজিদ বলে গণ্য হতে না। (যেমন "মসজিদে যিরার"। এটি ইসলামে মসজিদ বলে গ্রহণযোগ্য হয়নি বিধায় আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

কাফের আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির হুকুম মুরতাদের ন্যায়

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, তানবীরুল আবসার কিতাবে "যিম্মীদের ওসিয়্যত" শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, বাতিল ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের কোন মানুষ যদি নিজের ভ্রষ্টতার কারণে কাফের আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত না হয়, তাহলে ওসিয়্যাতের ক্ষেত্রে তার হুকুম মুসলমানের ন্যায়। আর যদি কাফের আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত হয়, তাহলে তার হুকুম মুরতাদের ন্যায়।

---

[৯০]. সূরা তাওবাঃ ১৭, ১৮

কিতাবের সারাংশ

এই কিতাব সংকলনের উদ্দেশ্য

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই কিতাবটি নিম্নোক্ত শরয়ী হুকুম সাব্যস্ত ও প্রমাণ করার জন্য লেখা হয়েছে।

১. জরুরিয়াতে দীন তথা দীনের অকাট্য ও নিশ্চিত আকীদা ও বিধানসমূহের মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ বা তাবীল করা, আজ পর্যন্ত উম্মত তার যে অর্থ বুঝেছে তা বাদ দিয়ে ভিন্ন কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য বলা এবং তার যেই আমলী সুরত মুতাওয়াতিররূপে প্রমাণিত আছে, তা থেকে বের করে দেওয়া, এগুলো সবই কুফরী সাব্যস্ত করে এবং কাফের বানিয়ে দেয়। কেননা, যে সব নস শব্দগত অথবা অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির এবং তার অর্থ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট, সেগুলোর মতলব ও উদ্দেশ্যও মুতাওয়াতির। বিধায় এই মতলব ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন তাবীল করা ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা, শরীয়তের একটি নিশ্চিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর ও সামর্থক এবং প্রকাশ্য কুফরী। যদিও তাবীলকারী সরাসরি শরীয়তপ্রবর্তককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বা করার ইচ্ছাটুকুও নেই তার।

২. এ ধরনের লোকের হুকুম হচ্ছে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে তাওবা করানো হবে। যদি তাওবা না করে তাহলে কাফের হয়ে যাওয়ার হুকুম লাগানো হবে এবং ইসলামী হুকুমত থাকলে হত্যা করে দেওয়া হবে।

একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন

কতক আলেমের ধারণা, শুধু তাওবা করতে বলাই যথেষ্ট নয়। বরং তাকে এই পরিমাণ বোঝানো জরুরি যে, তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং পুরোপুরি এতমিনান হাসিল হয়। এরপরও যদি সে অস্বীকারের পথ অবলম্বন করে তাহলে কুফরীর হুকুম লাগানো হবে, অন্যথায় নয়।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই ধারণা অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত। কেননা, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দীনের কোন মজবুত ও অপরিবর্তনশীল মৌলিক বস্তুই বাকি থাকে না। বরং তখন দীন শুধু মানুষের

মত ও .ধ্যান-ধারণা অনুগামী হয়ে যায়। আর চিন্তা-গবেষণাই দীনের মূল ভিত্তি হয়ে যায়। (যেন যে যুগের লোকেরা নিজেদের রায় ও কিয়াস অনুসারে যেটাকে দীন মনে করবে, সেটাই দীন হবে।) এটি অকাট্যরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত। বরং জরুরিয়াতে দীন স্বঅবস্থায়েই হক ও সঠিক হওয়া একটি সর্বসম্মত ও সর্বস্বীকৃত হাকীকত বা মূলবিষয়। এমনিভাবে এটি স্বঅবস্থাতেই বুঝা ও বোঝানের উর্ধ্বে। (কারো বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর তা মওকুফ বা স্থগিত নয়।) যে কোনরূপ আপত্তি ছাড়া সেটিকে হক মেনে নিবে সে আলাহ তাআলার দীনের অনুসারী এবং মুমিন। আর যে তা অস্বীকার করবে এবং মানবে না (চাই তা যে কারণেই হোক না কেন) সে কাফের। চাই কুফরের ইচ্ছা করুক আর না করুক। শুধু ইজতেহাদী ও ইখতেলাফী মাসআলা রায় ও কিয়াসের উপর নির্ভর করে থাকে। (ফলে ইজতেহাদের উপযুক্ত আলেমে দীন নিজের বুঝ ও রায় অনুসারে শরয়ী ভাষ্যসমূহের যে উদ্দেশ্য ও অর্থ নির্ধারণ করেন সেটাই মানেন এবং অবলম্বন করেন।)

আর জরুরিয়াতে দীনের অধ্যায়ে যেমন বিভিন্ন বস্তুর হাকীকত বা মৌলিকতা অস্বীকারকারীদেরকে "ইনাদিয়া" এবং "ইনদিয়া" বলা হয় এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে "লা-আদরিয়া" ও "শাক্কাহ" বলা হয়, তেমনিভাবে জরুরিয়াতে দীন অস্বীকারকারীদেরকে "মুআনিদ" এবং "মুলহিদ" বলা হয়। আর তাতে সন্দেহ পোষণকারীদেরকে "মুতারাদ্দিদ" এবং "মুনাফিক" বলা হয়। আর এরা সকলেই কাফের।

অজ্ঞতা কি উযর?

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আর যে সকল আলেম কুফরী কথা সম্পর্কে না জানা কে (অর্থাৎ এ কথা বললে মানুষ কাফের হয়ে যায়- এটা নাজানাকে) উযর আখ্যায়িত করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হল জরুরিয়াতে দীন ব্যতীত অন্য কোন শরয়ী বিষয় সম্পর্কে না জানলে তা উযর বলে ধরা হবে। (উদাহরণ স্বরূপ, এখতেলাফী মাসআলা অথবা দর্শনজাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে না জানার সুরতে অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না।) যেমন আমরা "আমরে সালেস" বা তৃতীয় বিষয় শিরোনামের অধীনে ফাতহুল বারীর এবারতের ফায়দার আলোচনায় এ বিসয়ে সতর্ক করে এসেছি। এমনিভাবে

আল-আশবাহ্ ওয়াননাযায়ের কিতাবের এবং এর টিকার উদ্ধৃতির অধীনেও এর স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

এ সব সুস্পষ্ট বিবরণ ছাড়াও খুলাসাতুল ফাতাওয়া কিতাবে বলা হয়েছে, কুফরীর বিভিন্ন সুরতের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে কুফরী কথা বলছে, অথচ তার কোন খবরই নেই যে, এই কথা বললে মানুষ কাফের হয়ে যায়। তবে লোকটি স্বেচ্ছায় তা বলছে; কারো প্ররোচনা বা জোরযবস্তির কারণে নয়। তাহলে এমন ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে কাফের। তার এই অজ্ঞতার কারণে তাকে মাযুর ও নিরূপায় মনে করা যাবে না। শুধু গুটি কয়েক আলেম এ মতের বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা এমন ব্যক্তিকে মাযুর ধরে নেন এবং কাফের বলেন না।

মাজমাউল আনহুর কিতাবে আলবাহরুর রায়িক কিতাবের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে, "তবে দুরার কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যবান দিয়ে কুফরী কথা বলনেওয়ালা যদি স্বেচ্ছায় ও নিজ আগ্রহে কুফরী কথা বলে থাকে, তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সে কাফের। যদিও তার এই আকীদা না থাকে যে, এই কথা বললে মানুষ কাফের হয়ে যায় অথবা তার জানা নেই যে এটি কুফরী কথা। না জানাকে তার জন্য উযর হিসেবে ধরা হবে না।

দুরার কিতাবের লেখক এই কথাটি মুহীত কিতাবের আলকারাহাত অধ্যায় ও আল-ইসতিহসান অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আর এই মতভেদ যে, না জানা উযর বলে গণ্য হবে কি না? এটি জরুরিয়াতে দীন ছাড়া অন্যান্য ইজতেহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। জরুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে কুফরী কথা বলনেওয়ালার হুকুম শুধু এটাই যে, সে কাফের, তাকে তাওবা করানো হবে। সুতরাং যদি তাওবা করে তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় কাফের আখ্যায়িত করা হবে। তবে যে কুফরী কথা বলেছে সে যদি মহিলা হয় তাহলে তাকে শুধু তাওবা করানো হবে।

মুরতাদ নারী-পুরুষের হুকুম

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারীতে বলেন, মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু কে

ইয়ামানের বিচারক বানিয়ে পাঠান, তখন তাঁকে বলে দিয়ে ছিলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, তাকে প্রথমে ইসলামে ফিরে আসার দাওয়াত দিবে। যদি সে ফিরে আসে এবং নতুন করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। এমনিভাবে যে মহিলা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, তাকেও ইসলামে ফিরে আসার দাওয়াত দিবে। যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় তাকেও হত্যা করে ফেলবে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই হাদীসটির সনদ "হাসান"এর স্তরের।

হাফেয জামালুদ্দীন যাইলাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহও এই হাদীসটি হেদায়া কিতাবের তাখরীয "নাসবুর রিওয়ায়া"তে মাসআলায়ে সানিয়ার অধীনে মু'জামে তবরানীর উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে মুরতাদ মহিলাকে শুধু তাওবা করানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তাকে হত্যা করে দেওয়ার কোন কথা উল্লেখ নেই।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মুরতাদ মহিলাদের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মত এটাই যে, মহিলাদেরকে হত্যা করা হবে না। তবে বক্ষমাণ হাদীস যেখানে মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করার হুকুমের কথা বলা হয়েছে, তাতে উদ্দেশ্য নেওয়া হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী মহিলা। কেননা, দুররে মুখতারের জিযয়া (ট্যাক্স) অধ্যায়ের শেষে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী মহিলাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। (বিধায় হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসের উদ্দেশ্য সেটাই নেওয়া হবে।)

দুররে মুখতারের লেখক যখীরা কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালমন্দকারী মহিলাকে হত্যার করার ব্যাপারে হযরত উমাইর ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। সেই হাদীসটিতে এসেছে, হযরত উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসমা বিনতে মারওয়ানের ব্যাপারে শুনতে পেলেন যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে

গালি দেয় এবং অনেক কষ্ট দেয়। তাই একবার সুযোগ বোঝে রাতের বেলা তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ কাজ করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর (ঈমানী মর্যাদাবোধের) প্রশংসা করেন।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই রেওয়ায়াত ও প্রমাণটি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত, বহু কাজে লাগতে পারে।

ইমাম যাইলাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মত কানযের ৩/৯১ পৃষ্ঠাতেও উল্লেখ আছে। তাই কানযের মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কানযের ৩/৯১ পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত কাবুস ইবনে মাখারিক এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে দুই মুসলমানের ব্যাপারে লেখেন যে, এরা যিন্দীক হয়ে গেছে.....।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জবাবে লেখেন, যে দুই ব্যক্তি যিন্দীক হয়ে গেছে যদি তারা তাওবা করে নেয়, তাহলে তো ভাল কথা। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।

হাফেয যাইলাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহিও হেদায়ার তাখরীজের মধ্যে মাউতুল মাকাতিব ও ইজযুহু অধ্যায়ের অধীনে উপরোল্লিখিত বর্ণনাটি এনেছেন। তবে সেখানেও শুধু তাওবা করানোর কথা উল্লেখ আছে; (হত্যা করার কথা উল্লেখ নেই।)

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লিখিত সবগুলো বর্ণনা সামনে রেখে বলেন, মানুষের ক্ষমতার মধ্যে তো শুধু এতটুকুই আছে যে, তাকে তাওবা করাবে। অন্তরে ঈমান ঢেলে দেওয়া এবং এতমিনান সৃষ্টি করে দেওয়া তো আল্লাহ তাআলার কাজ। বিধায় কোন কোন আলেমের যে দৃষ্টিভঙ্গি তথা বুঝানোর মাধ্যমে মুরতাদের অন্তর ঠাণ্ডা করে দেওয়া- এটি ঠিক নয়। কারণ এটি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

আমরা শুধু তাওবা করাতে আদিষ্ট

অন্তরে ঈমান ঢেলে দেওয়া আল্লাহ তাআলার কাজ। আমাদেরকে তো শুধু তাওবা করানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সহীহ বোখারীর ১/১৮ পৃষ্ঠায় "ইলম" এর অধ্যায়ে হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি মরফু হাদীসে এসেছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হেদায়াত (দীন) এবং ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেটি মুষলধার বৃষ্টির ন্যায়, যা কোন ভূখণ্ডে পড়েছে। সে ভূখণ্ডের এক অংশ ছিল উৎকৃষ্ট, যা ভাল করে বৃষ্টি গ্রহণ করেছে ফলে তাতে প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি জন্মিয়েছে। আর অপর অংশ ছিল কঠিন ও গভীর। তা পানি (চোষণ করেনি তবে) আটক করে রেখেছে। (পুকুর, হাউজ ইত্যাদি পানিতে ভরে গেছে।) ফলে আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মানুষদেরকে উপকৃত করেছেন। মানুষেরা নিজেরাও পান করেছে, তাদের গবাদী পশুকেও পান করিয়েছে এবং তা ক্ষেতি ও ফসলে সিঞ্চন করেছে। আর ভূমির কিছু অংশ আছে যা সমতল ও কঠিন; না পানি আটক করে রাখে যে, মানুষ সেখান থেকে পান করবে। আর না পানি চোষণ করে যে, তাতে ঘাসপাতা জন্মাবে। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটি হচ্ছে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমার আনিত ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সে নিজে তা শিক্ষা করেছে এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনি এবং সেই হেদায়াতও গ্রহণ করেনি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, দেখুন! এই হাদীসে দীন ও ঈমান এবং কুফর ও লাঞ্ছনার ভিত্তি রাখা হয়েছে গ্রহণ করা না করার উপর, যা নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী মানুষের অবলম্বনকৃত আমল। অন্তরের এমন ঈমান ও একীন সৃষ্টি করার উপর ভিত্তি রাখা হয়নি, যারপর অস্বীকার ও অমান্যের স্তর থেকে যাবে। তাই কতিপর আলেম এ কথা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, এই দাওয়াত ও তাবলীগের পরও বিমুখ হওয়া ও অস্বীকৃতি জানানোই একগোয়েমী ও জিদ। চাই এই অস্বীকৃতি দ্বারা তার মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হোক বা না হোক। (অর্থাৎ হকের দাওয়াত দেওয়া ও হকের কথা পৌছানোর পর বিমুখ হওয়া ও কবুল করতে না চাওয়াই অস্বীকার করা ও মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত সা'দী শিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই হাদীসের উপমার উপর তার এই কবিতার ভিত্তি রেখেছেন-

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست * در باغ لالہ روید ودر شورہ بوم وخس

সেই বৃষ্টি যার স্বভাবগত সৌন্দর্য কেউ অস্বীকার করার নেই, সেই বৃষ্টির কারণে বাগানে লালা (লাল রঙ্গের ফুল বিশেষ) ও বিভিন্নরকম ফুল ফোটে এবং লবণাক্ত ও অনাবাদী ভূমিতে আগাছা ও জঙ্গল হয়।

(যেমনিভাবে এ সব জমীনের স্বভাবগত পার্থক্য রয়েছে, তদ্রুপ মুমিন ও কাফেরের মাঝেও স্বভাবগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে সেই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন-

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

শাইখ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাহরীরুল উসূল কিতাবে রেসালাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে বলেছেন, মুতাওয়াতির প্রমাণাদির মাধ্যমে রেসালাত প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা তা অস্বীকার করে, তাদের সাথে মুনাযারা ও বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই। বরং যদি তাওবা না করে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দেবো।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, সারকথা হচ্ছে হক পৌছে দেওয়া থেকে বেশী কিছু করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। যেমন কাফেরদের সাথে জিহাদ করার সময় শুধু ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই যথেষ্ট।

কাকে তাওবা করানো হবে, কাকে করানো হবে না?
হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফায়সালা

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, এই মাসআলাটি তো সকল আয়িম্মায়ে দীন থেকে সর্বসম্মতভাবে বর্ণনাকৃত। যেমন হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহ আস-সারিমুল মাসলুল কিতাবে বলেন, (মুরতাদকে তাওবা করতে বলারও প্রয়োজন নেই।) এই মাসআলা সাব্যস্ত করার জন্য আবু ইদরীস রহমাতুল্লাহি আলাইহ এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটিই যথেষ্ট।

আবু ইদরীস খাউলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে এমন কয়েকজন যিন্দীককে হাযির করা হল, যারা ইসলাম থেকে ফিরে গেছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবেই কি তোমরা দীনে ইসলাম থেকে ফিরে গেছো? তারা

পরিষ্কার ভাষায় এই অপরাধ অস্বীকার করল। তখন তাদের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী পেশ করা হল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এই সাক্ষীদের সাক্ষের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। তাদেরকে তাওবা করাননি। (কেননা, তারা প্রথমেই ইসলাম ত্যাগের বিষয়ে মিথ্যা বলেছে। এখন তাওবা করালেও মিথ্যা তাওবা করবে।)

আবু ইদরীস খাউলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন, এক খ্রিস্টানকেও পেশ করা হল, যে মুসলমান হয়েছিল, তারপর পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করেছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাকেও জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ইসলাম ত্যাগ করেছ? লোকটি তার এই অপরাধের কথা স্বীকার করে। তাই তিনি তাকে তাওবা করতে বলেন। লোকটি তাওবা করে। ফলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

এ প্রেক্ষিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু কে জিজ্ঞেস করা হল, এটি কেমন বিষয় যে এই খ্রিস্টান কে তাওবা করানো হল। অথচ ঐ যিন্দীকদেরকে তাওবা করানো হল না? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু জবাব দিলেন, এই খ্রিস্টান তো নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে (এ জন্য আমি তার তাওবাও গ্রহণ করে নিয়েছি যে, এটি সত্য হবে।) আর ঐ লোকগুলি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেনি বরং পরিষ্কার অস্বীকার করেছে। এমনকি তাদের কথার বিপরীত নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীও পেশ করা হয়েছে। (তাদের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা অপরাধ করেছে অথচ মিথ্যা বলেছে।) এ জন্য আমি তাদেরকে তাওবা করায়নি। (কারণ তারা শরয়ী দলীলের মাধ্যমে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়েছে, তাই তাদের তাওবারও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।)

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ও আবু ইদরীস খাওলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু ইদরীস খাওলানি রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ থেকে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এর সামনে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। লোকটি খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু ঐ লোকটি কে তাওবা করাতে বললেন। লোকটি তাওবা করতে অস্বীকার করল। তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর আরেকটি দল উপস্থিত করা হল। যারা কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে কিন্তু তারা

ছিল যিন্দীক ও বেদীন। তাদের যিন্দীক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষীও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের এই অপরাধ অস্বীকার করে। তারা বলে, আমাদের ধর্ম শুধু ইসলাম। (কিন্তু তাদের এই কথা মিথ্যা ছিল।) হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ। (তাওবা করতে বলেননি।) তারপর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, আপনারা কি জানেন আমি ঐ খ্রিস্টানকে কেন তাওবা করতে বলেছিলাম? (আর এই যিন্দীকদেরকে কেন বলিনি?) আমি ঐ খ্রিস্টানকে এজন্য তাওবা করতে বলেছিলাম যে, সে পরিষ্কার ভাষায় তার ধর্মের কথা স্বীকার করেছিল। কোন মিথ্যা বলেনি। কিন্তু এসব যিন্দীক তার বিপরীত। এদের বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপিও তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে এবং অপরাধ অস্বীকার করেছে। তাই আমি শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছি।

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর এই ফায়সালা এ বিষয়ের অকাট্য দলীল যে, যে যিন্দীক নিজের যিন্দিকতা গোপন করবে এবং অপরাধ অস্বীকার করবে অথচ তার বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণ লোকের সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠত হবে, তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। তার থেকে কোন তাওবা চাওয়া হবে না। (কারণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার কথা প্রত্যাখ্যাযোগ্য হয়ে গেছে। বিধায় তার তাওবাও গ্রাহ্য করা হবে না।)

একটি মুর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও তার জবাব

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, যদি কোন জাহেল এই প্রশ্ন করে যে, অস্বীকারকারী কাউকে নিরুত্তর করার মত প্রমাণ দিয়ে অক্ষম করে দেওয়া ছাড়া হত্যা করে দেওয়া মহান প্রভুর ইনসাফ পরিপন্থী।

তাহলে এর জবাব হবে, যদি বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে তো নিরুত্তরকারী প্রমাণাদির মাধ্যমে অক্ষম করে দেওয়ার পরও তাকে হত্যা করা ইনসাফ পরিপন্থী হওয়া দরকার। কেননা, তাকে হেদায়াত ও হক কবুল করার তাওফীক প্রদান করা ছাড়াই হত্যা করে দেওয়াও পরওয়ারদেগারের জন্য ইনসাফ পরিপন্থী।

আসল কথা হচ্ছে, এটি শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও ধোঁকা। এমন উক্তি থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পাঠ করা দরকার।

এই পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য তো সেটাই ছিল যা পূর্বে বলা হয়েছে। তবে মাসআলায়ে তাবীল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরো কিছু উপকারী বর্ণনা ও উদ্ধৃতি বয়ান করা হলো। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা থেকে খালি না। প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য রয়েছে, কথায় কথা আসে। তাই আনুষাঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বিষয়ও আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ চাহে তো পাঠকদের অনেক কাজে আসবে।

সর্বশেষ সর্তকবাণী

মুসান্নিফ রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেন, মোটকথা, ভাল করে শুনে নিন যে, যেমনিভাবে কোন মুসলমানকে কাফের বলা ইসলাম পরিপন্থী, তেমনিভাবে কোন কাফেরকে মুসলমান বলা এবং তার কুফরীর ব্যাপারে চশমপুশী করাও ইসলাম পরিপন্থী। এটিই ইনসাফপূর্ণ রাস্তা (যে, মুসলমানকে মুসলমান বলা হবে, আর কাফেরকে বলা হবে কাফের)। কিন্তু এ যুগে মানুষেরা ব্যাপকভাবে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা এদুটির মধ্যে লিপ্ত। (এক দিকে ভাল ও সঠিকপন্থী মুসলমানকে কাফের বলা হচ্ছে। অপর দিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কাফেরকে মুসলমান বলা হচ্ছে এবং তাদেরকেও নিজেদের সাথে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।) নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সঠিক বলেছেন, যে বলেছেন, জাহেল ও অজ্ঞ লোকেরা হয় তো বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়, অথবা ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতায় পড়ে যায়।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল ইত্থাফ : জুবাইদী রহ. (১২০৫হি.)
২. আল ইতকান : সুয়ুতী রহ. (৯১১হি.)
৩. আল আহকাম : আমুদী রহ. (৬১৩হি.)
৪. আহকামুল কুরআন : কাজী আবু বকর আরাবী রহ. (৫৪৩ বা ৫৪৬ হি.)
৫. আহকামুল কুরআন : কাজী আবু বকর জাসসাস রহ. (৩৭০হি.)
৬. ইজালাতুল খফা : শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেওহলভী রহ. (১১৭৬হি.)
৭. আল আসমা ওয়াস সিফাত : আবু বকর বায়হাকী রহ. (৭৫৮হি.)
৮. আল আশবা ওয়ান নাজায়ির : ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.)
৯. আল আসল : ইমাম মুহাম্মদ রহ. (১৮৯হি.)
১০. উসুলে বজদুভি : ফখরুল ইসলাম বজদুভী রহ. (৪৮২হি.)
১১. আল আলাম : ইবনে হাজার হাইছামী রহ. (৯৭৪হি.)
১২. ইকামাতুদ দলিল : হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.)
১৩. আল ইকতিসাদ : ইমাম গাজালী রহ. (৫০৫হি.)
১৪. আল উম : ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪হি.)
১৫. ইসারুল হক : মুহাক্কিক মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম আলইয়ামানী রহ. (৮৪০হি.)
১৬. আল বাহরুর রায়েক : ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.)
১৭. বাদায়েউস সানায়ে : আবু বকর আল কাসানী রহ. (৫৮৭হি.)
১৮. বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ইবনে কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.)
১৯. বাযযাযিয়া : হাফিযুদ্দীন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ রহ. (৭২৭হি.)
২০. বাগইয়াতুল মুরতাদ : হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.)
২১. আল বিনায়া : আল্লামা আইনী রহ. (৮৫৫হি.)
২২. তারিখে ইবনে আসাকির : ইবনে আসাকির রহ. (৫৭১হি.)
২৩. আত তাহরীর : শায়েখ ইবনে হুমাম রহ. (৮৬১হি.)
২৪. তুহফাতুল বারী : জাকারিয়া আনসারী রহ. (৯২৫হি.)
২৫. তুহফাতুল মুহতাজ লি শরহিল মিনহাজ : ইবনে হাজার হাইছামী রহ. (৯৭৪হি.)
২৬. আত তারগীব ওয়াত তারহীব : হাফেজ মানযারী রহ. (৬৫৬হি.)
২৭. আত তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মাসিহ : গ্রন্থকার রহ. (১৩৫২হি.)
২৮. আল মুফাররিকাতু বাইনাল ঈমান ওয়ায যানাদাকাহ : ইমাম গাজালী রহ. (৫০৫হি.)
২৯. তাফসীরে ইবনে কাসির : হাফেয ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪হি.)
৩০. তাফসীরে নিশাপুরী : ইসমাইল ইবনে আহমাদ নিশাপুরী রহ. (৪৩০হি.)
৩১. আত তাকরীর : ইবনে আমীর রহ. (৮৭৯হি.)

৩২. আত তালখীস : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২হি.)
৩৩. তালখীসুল মুস্তাদরাক : যাহবী রহ. (৭৪৮হি.)
৩৪. আত তালবীহ : তাফতাযানী রহ. (৭৯১হি.)
৩৫. আত তামহীদ (ফি বয়ানিত তাওহীদ) আবু শাকুল মুহাম্মাদ হানাফী রহ.
৩৬. তানভীরুল আবসার : সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইবনে খলীল রহ. (১৩৮৫হি.)
৩৭. তাহযীবুল আছার : আল্লামা তবারী রহ. (৩১০হি.)
৩৮. তাহযীবুত তাহযীব : ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২হি.)
৩৯. আত তাওযীহ : উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রহ. (৭৪৭হি.)
৪০. আল জামিউস সহীহ : ইমাম আবু ইসা তিরমিযী রহ. (২৭৯ বা ২৭৫হি.)
৪১. জামিউল ফুচুলাইন : শায়েখ বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে ইসমাইল (৮২৩হি.)
৪২. আল জামউ ওয়াল ফারকু : আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ (১০৯৮হি.)
৪৩. জাওয়াহীরুত তাওহীদ : ইবরাহীম রহ. (১০৪১হি.)
৪৪. হাশিয়া আবদিল হাকীম : আবদুল হাকীম শিয়ালকোঠী রহ. (আনুমানিক ১০২০হি.)
৪৫. আল খানিয়া : কাজী খান রহ. (১১২১হি.)
৪৬. খাজাইনুল মুফতীয়্যিন : হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ সামআনী রহ. (৪৭০হি.)
৪৭. আল খাসায়েস : ইমাম নাসাই রহ. (৩০৩হি.)
৪৮. খোলাসাতুল ফাতাওয়া : শায়েখ তাহের ইবনে আহমাদ রহ. (৫৪২হি.)
৪৯. খালকু আফআলিল ইবাদ : ইমাম বুখারী রহ. (৩৫৬হি.)
৫০. আল খাইরিয়্যাহ : আল্লামা খাইরুদ্দীন রহ. (১০৮১হি.)
৫১. দা-ইরাতুল মাআরিফ : ফরীদ ওজদী
৫২. আদ দুরার : মুহাম্মদ (৮৮৫হি.)
৫৩. আদ দুররুল মুখতার : আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী (১০৮৮হি.)
৫৪. আদ দুররুল মুন্তকা : মুহাম্মদ ইবনে আলী (১০৮৮হি.)
৫৫. রদ্দুল মুহতার : মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন শামী রহ. (১২০২হি.)
৫৬. আর রিসালাতুত তাইনিয়্যাহ : হাফেয ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হি.)
৫৭. আর রাসায়েল : মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন শামী রহ. (১২০২হি.)
৫৮. রুহুল মাআনি : আল্লামা মুহাম্মাদ আলুসী রহ. (১২৭০হি.)
৫৯. রিয়াজুল মুরতাজ : শাওকানী রহ. (১২৫০হি.)
৬০. আর রিয়াজ : মুজাদ্দেদুদ্দীন আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (৬৯৪হি.)
৬১. যাদুল মাআদ : হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. (৭৫১হি.)

৬২. সুনানে আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আশআছ আস সিজিস্তানি রহ. (২৭৫হি.)
৬৩. সুনানে নাসাই : আবু আব্দুর রহমান নাসাই রহ. (৩০৩হি.)
৬৪. আস সিয়ারুল কাবীর : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.)
৬৫. সিরাতে ইবনে ইসহাক : (১৫১হি.)
৬৬. শরহুল আশবাহ : আল্লামা হামাভী রহ. (১০৯৮হি.)
৬৭. শরহুত তাহরীর : মুহাক্কিক ইবনে আমীর রহ. (৮৭৯হি.)
৬৮. শরহুত তিরমিযী : কাজী আবু বকর আরাবী রহ. (৫৪৩ বা ৫৪৬হি.)
৬৯. শরহু জাওয়াহিরাতুত তাওহীদ : শায়েখ আবদুস সালাম (১০৭৮হি.)
৭০. শরহু জামইল জাওয়ামিই : তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. (৭৫৬হি.)
৭১. শরহুস সিয়ারুল কাবির : আল্লামা সারাখসী রহ. (৪৮৩ বা ৪৯০হি.)
৭২. শরহুশ শিফা : মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪হি.)
৭৩. শরহুস সহীহ লিমুসলিম : আল্লামা উবাই রহ. (৮২৭ বা ৮২৮হি.)
৭৪. শরহুস সহীহ লিমুসলিম : আল্লামা নববী রহ. (৬৭৬ বা ৬৭৭হি.)
৭৫. শরহুল আকাইদিন নাসাফি : আল্লামা তাফতাযানী রহ. (৭৯১হি.)
৭৬. শরহুল আকিদাতিত তাহাবী : মাহমুদ ইবনে আহমাদ মাসউদ রহ. (৭৭০হি.)
৭৭. শিফাউল আলীল : হাফেয ইবনে কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.)
৭৮. শরহুল ফারাইজ : আল্লামা আব্দুল গণী রহ. (১১৪৩হি.)
৭৯. শরহুল ফিকহিল আকবার : মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪হি.)
৮০. শরহুল কানয : যাইলাই রহ. (৭৪৩হি.)
৮১. শরহু মাআনিল আসার : আবু জাফর তাহতাবী রহ. (৩২১হি.)
৮২. শরহু মুনিয়্যাতুল মুসল্লি : শায়েখ ইবরাহীম রহ. (৯৫৬হি.)
৮৩. শরহুল মাওয়াকিফ : আল্লামা জুরজানি রহ. (৮১৬হি.)
৮৪. আশ শিফা : কাজী আয়াজ রহ. (৫৪৪হি.)
৮৫. আস সারিমুল মাসলুম : হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (৭২৮হি.)
৮৬. সবহুল আ'শা : আবুল আব্বাস রহ. (৮২১)
৮৭. আস সহীহ লিল বুখারী : ইমাম বুখারী রহ. (২৫৬হি.)
৮৮. আস সহীহ লি মুসলিম : ইমাম মুসলিম রহ. (২৬১হি.)
৮৯. আস সালাত ওয়াল বাশার : মাজদুদ্দীন রহ. (৮১৭হি.)
৯০. আস সাওয়াইকুল মুহাররাকা : আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. (৯৭৩হি.)
৯১. তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ : আল্লামা কাফাভী রহ. (৯৯০হি.)
৯২. আত তাহতাবী : (১২৩৩হি.)
৯৩. উমদাতুল আহকাম : তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ইদ রহ. (৭০২হি.)

৯৪. উমতাদুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী : আল্লামা আইনী রহ. (৮৫৫হি.)
৯৫. গাইয়াতুত তাহকীক শরহু উসুলিল হুসামি : শায়েখ আবদুল আযীয রহ. (৭৩০হি.)
৯৬. গুনিয়াতুত তালিবীন : শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. (৫৬১হি.)
৯৭. আল ফাতাওয়া : হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (৭২৮হি.)
৯৮. ফাতাওয়া : শায়েখ তাকী উদ্দীন সুবকী রহ. (৭৫৬হি.)
৯৯. আল ফাতাওয়া আল আযিযীয়্যা : শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. (১২৩৯হি.)
১০০. ফাতাওয়া কাযী খান : ইমাম ফখরুদ্দীন হাসান ইবনে মানসুর রহ. (১১২১হি.)
১০১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ওলামাদের একটি দল ও আওরঙ্গজেব আলমগীর
১০২. ফাতহুল বয়ান : নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রহ. (১৩০৭হি.)
১০৩. ফাতহুল কাদীর : আল্লামা কাজী শাওকানী রহ. (১২৫০হি.)
১০৪. ফাতহুল কাদীর : শায়েখ ইবনে হুমাম রহ (৮৬১হি.)
১০৫. ফাতহুল মুগীস : আল্লামা সাখাভী রহ. (৯০২হি.)
১০৬. আল ফুতুহাত : শায়খুল আকবার ইবনুল আরাবী মাহমুদ ইবনে আলী রহ. (৬৩৮হি.)
১০৭. আল ফারকু বাইনাল ফিরাক : উস্তাদ আবু মানসুর আব্দুল কাহির রহ. (৩২৯হি.)
১০৮. ফিকহুল আকবার : ইমাম আবু হানিফা রহ. (১৫০হি.)
১০৯. ফাওয়াতিহুর রুহুমত : আব্দুল আলিয়্যী মুহাম্মাদ ইবনে নিজামুদ্দীন রহ. (১২২৫হি.)
১১০. আল কাওয়াসেম ওয়াল আওয়াসেম : মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম রহ. (৮৪০হি.)
১১১. কিতাবুল ঈমান : হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.)
১১২. কিতাবুল খিরাজ : কাজী ইউসুফ রহ. (১৮২হি.)
১১৩. কিতাবুল উলুয়্যি : আল্লামা যাহাবী রহ. (৭৪৮হি.)
১১৪. কিতাবুল ফছল : আল্লামা ইবনে হাযম রহ.
১১৫. কাশফুল আসরার শরহুল বাযদুভী : শায়েখ আবদুল আযীয রহ. (৭৩০হি.)
১১৬. আল কুল্লিয়্যাত : কাজী আবুল বাকা আইয়্যুব ইবনে মুসা আল হুসাইনি রহ. (১০৯৩হি.)
১১৭. কানযুল উম্মাল : আলী আল মুত্তাকী রহ. (৯৭৫হি.)
১১৮. মাজমাউল আনহার : শায়েখ আবদুর রহমান (শায়েখ জাদা) রহ. (১০৭৮হি.)
১১৯. আল মুহিত : বুরহানুদ্দীন মাহমুদ রহ. (৫৩৬হি.)
১২০. আল মুখতাসার : আল্লামা জামালুদ্দীন উসমান রহ. (৬৪৬হি.)

১২১. মুখতাসার মুশকিল আসার : আল্লামা তাহতাভী রহ. (৩২১হি.)
১২২. আল মাদখাল : আল্লামা বাইহাকী রহ. (৪৫৮হি.)
১২৩. আল মুসায়ারা : শায়েখ ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.)
১২৪. আল মুস্তাদরাক : হাফেয আবু আব্দুল্লাহ আল হাকিম রহ. (৪০৫হি.)
১২৫. আল মুস্তাসফা : ইমাম গাজালী রহ. (৫০৫হি.)
১২৬. মুসনাদে ইমাম আহমাদ : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (২৪১হি.)
১২৭. মাআলিমুত তানযিল : আল্লামা বগবী রহ. (৫১৬হি.)
১২৮. আল মুতাসার মুখতার মুশকিল আসার : জামালুদ্দীন ইউসুফ রহ. (৮০৩হি.)
১২৯. আল মুফহাম : ইমাম আহমাদ ইবনে ওমর ইবনে ইবরাহীম কুরতুবী রহ.
১৩০. আল মাকাসিদ ও শরহুহু : আল্লামা তাফতাযানী রহ. (৭৯১হি.)
১৩১. মাকতুবাত ইমাম রাব্বানী : মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ সেরহিন্দ রহ. (১০৩৪হি.)
১৩২. মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল : শায়েখ আলী আল মুত্তাকী রহ. (৯৭৫হি.)
১৩৩. আল মুন্তকা ফিল আহকাম : হাফেয আব্দুস সালাম রহ. (ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দাদা)
১৩৪. মিনহাতুল খালিক আলা বাহরির রায়েক : আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.)
১৩৫. মিনহাজুস সুন্নাহ : হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.)
১৩৬. আল মিনহাজ : আল্লামা নববী রহ. (৬৭৬ বা ৬৭৭হি.)
১৩৭. আল মুওয়াফিকাত : আল্লামা শাতিবী রহ. (৭৯০হি.)
১৩৮. আল মাওয়াফিক : আল্লামা আজদুদ্দীন রহ. (৭৫৬হি.)
১৩৯. মাওজিহুল কুরআন : শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. (১২৩০হি.)
১৪০. আল মুয়াত্তা : ইমাম মালেক রহ. (১৭৯হি.)
১৪১. আল মিযান : আল্লামা শিরানী রহ. (৯৭৩হি.)
১৪২. মিযানুল ইতিদাল : আল্লামা যাহাবী রহ. (৭৪৮হি.)
১৪৩. নিবরাস : শায়েখ আব্দুল আযীয রহ. (আনুমানিক : ১২৩৯হি.)
১৪৪. আন নুবালা : আল্লামা যাহাবী রহ. (৭৪৮হি.)
১৪৫. নাসিমুর রিয়াজ শরহুস শিফা : আল্লামা খাফাজী রহ. (১০২৯হি.)
১৪৬. নিহায়া : মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ রহ. (৬০৬হি.)
১৪৭. আল ইয়াওয়াকিত : আবুল মাওয়াহিব আব্দুল ওহহাব ইবনে আহমদ শিরানী রহ. (৯৭৩হি.)

إِكْفَارُ الْمُلْحِدِيْنَ
بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّة

সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, কোন আহলে কেবলাকে কাফের সাব্যস্ত করা নিঃশর্তভাবে নিষিদ্ধ। চাই সে দীনের কোন জরুরী বিষয় অস্বীকার করুক, অথবা কোন জরুরী বিষয়ের অপব্যাখ্যা করুক, কিংবা তার কথাবার্তা থেকে কুফর স্পষ্ট হোক।...

কিছু কিছু লোক তো নাম ধরেই মির্যায়ীদের কাফের না হওয়ার ফলাফল বের করে। বিশেষত এরা সেইসব মির্যায়ীদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে না, যারা বাহ্যিকভাবে মির্যা কাদিয়ানীর নবী হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে এবং মির্যার নবুয়াত দাবির ব্যাপারটিকে তাবীল করে। যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, যেমনটা এরা বুঝে নিয়েছেন, তা হলে সেইসব লোককে কাফের সাব্যস্ত করার কী অর্থ থাকতে পারে, যারা মুসায়লামা কায্যাব ইয়ামামীর উপর ঈমান এনেছিল। অথচ তারাও তো নামায পড়ত, রোযা রাখত, যাকাতও দিত এবং মুসায়লামার নবুয়তের বিষয়টি তাবীল করত। তা ছাড়া মুসায়লামা কায্যাবও আমাদের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল। আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে দেখেনি, যে মুসায়লামা বা তার অনুসারীদেরকে কাফের বলার পক্ষপাতী নয়। আর যখন 'মুসায়লামা ও তার অনুসারীরা কাফের নয়' এমন বক্তব্য সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল, তখন 'মির্যা ও তার তাবীলকারীরা কাফের নয়' এমন দাবি বাতিল হবে না কেন?

আল্লাহ তাআলা 'ইকফারুল মুলহিদীন' গ্রন্থের রচয়িতাকে পরিপূর্ণ জাযা দান করুন। তিনি এই বিষয়টি এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যার উপর আর কোন বিশ্লেষণ হতে পারে না। কেননা, তাঁর এই রচনা কামেল ও মুকাম্মাল। লেখক দলিল-প্রমাণও ইনসাফের আঁচল না ছেড়ে সমান তালে উল্লেখ করেছেন।...

মুহতাজে রহমত
মুহাম্মাদ আশরাফ আলী (থানভী)
শনিবার, ৪ মহররম, ১৩৪৩ হি.

design print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389